সূচীপত্র

ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে নতুন গ্রন্থের প্রয়োজন কোনো সময়েই ফুরিয়ে যাবার নয়। তার একটি বড় কারণ আমাদের সকলেরই জানা। (উত্তররৈবিক কবিকুলের মধ্যে তিনিই সেই মৃত্যুহীন পুরোধা যাঁর কবিতার ব্যঞ্জনার হীরক "শতবার ঘুরি। ফেলিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।") কবির মৃত্যুর পর পঁচিশটি বছর অতিক্রান্ত; অঙ্গুলিমেয় হলেও তাঁকে নিয়ে উভয় বঙ্গেই বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত। এছাড়া নানা প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনাও বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িকীতে ছড়িয়ে আছে। তবু তাঁর কাব্যের নিবিষ্ট পাঠক অনুভব করেন কোথায় যেন একটি অভাব রয়ে গেছে। জীবনানন্দের কাব্যের প্রতি নেহাৎই প্রাণের টানে যে সব কবি মনীষীরা আলোচনায় এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিরুচি সমালোচনার নির্মোহ ভেঙে তাঁকে খণ্ডিত করেছে নানা অভিপ্রায়ী এষণায়। অন্যত্র সংজ্ঞা ও লক্ষণবিচারের গবেষকী অত্যুৎসাহে কবির সৃষ্টি তার আপন সামগ্রিকতায় মূল্যায়িত হতে পারেনি। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত প্রগল্‌ভ মনে হতে পারে মনে করেই কবির নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার দিকে চোখ ফেরানো সমীচীন হবে। তাঁর কবিতার আদি ও অকৃত্রিম অনুরাগী কবিসমালোচক বুদ্ধদেবের মনোভাব ও মূল্যায়ন সম্পর্কে জীবনানন্দকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু লিখতে হয়: "ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো।...তারপরে 'বনলতা সেন'-এর পরবর্ত্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।" (ময়ূখ: জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা: পৌষ-জ্যৈষ্ঠ' ১৩৬১—৬২,

চিঠিপত্র নং ৪) এই উক্তি এমন একজন সম্পর্কে জীবনানন্দের কবিতার প্রচারে যাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম এবং সমালোচক হিসাবে যাঁর দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি জীবনানন্দের কাব্যের মৌল চারিত্র্য সম্পর্কে বাঙালী পাঠককে প্রথম অবহিত করে। তবু উদ্ধৃত অংশে বুদ্ধদেবের মূল্যায়ন সম্পর্কে যে মৃদু অনুযোগ আভাসিত তার যাথার্থ্য আমাদের তর্কাতীত মনে হয়েছে। নিজের কবিতার সমকালীন পর্যালোচনাগুলির খণ্ডচরিত্র সম্পর্কে কবির প্রতিক্রিয়ার স্পষ্টতর অভিব্যক্তি 'শ্রেষ্ঠকবিতা'র ভূমিকায় (নাভানা প্রকাশিত: বৈশাখ ১৩৬১, মে ১৯৫৪) বিধৃত হয়ে আছে: ("আমার কবিতাকে, বা এ কাব্যের কবিকে, নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানতঃ প্রকৃতির বা প্রধানতঃ ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্যমতে নিশ্চেতনার, কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিষ্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা, বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে, সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিশেবে নয়।")

স্পষ্টতই কবির অভিপ্রায় ছিলো তাঁর কাব্যসৃষ্টি একটি অটুট সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য হোক, যদিও সে অভিজ্ঞতার নানা অধ্যায় বা পর্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়মূল্য অনেকসময়ই যে পাঠকের অনন্য মনোযোগ দাবী করতে পারে সে বিষয়েও কবি কিছু অনবহিত ছিলেন না। এ ভাবেই জীবনানন্দের গোটা কাব্য-সৃষ্টির পরিধিতে প্রকৃতি, প্রেম, সমাজ ও ইতিহাস এক ব্যাপ্ত ও জটিল কাব্য-অভিজ্ঞতার মধ্য হতেই তাদের আপন মৌল স্বরের প্রবলতায় অন্য সব কিছুকেই যেন, সাময়িকভাবে হলেও, আচ্ছন্ন করেছে।

বর্তমান পর্যালোচনার ক্ষেত্র আমরা সীমিত রেখেছি কবির চেতনালোকে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে কবিতার ভাব ও বাণীরূপের,

জীবনানন্দীয় পরিভাষায়, 'কাব্যের আত্মা ও শরীরে'র অবিচ্ছেদ্যতায় আমি বিশ্বাসী। কাব্যের শিল্পরূপের পর্যালোচনা প্রকরণগত ও প্রভাবসন্ধী বলেই তার বিস্তার বহুতল ও উদাহরণনিষ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। সেই বিস্তৃততর ক্ষেত্র ও সুযোগ সুলভ হলে সে পর্যালোচনায় পরাঙমুখ হবো না। কিন্তু, বর্তমান আলোচনার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র সম্পর্কেও দু-একটি কথা জানানো প্রয়োজন। ইদানীংকালে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ সম্পর্কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উৎসাহের নজির সুলভ। আমরা কিন্তু তাঁর কাব্য পর্যালোচনাতেই উৎসাহবোধ করেছি এবং অন্যতর শিল্পরূপমাধ্যমে কবির কৌতূহলের সম্পর্কে নীরব থেকেছি দুটি কারণে। এক, সাহিত্যের যে বিশেষ ক্ষেত্রে জীবনানন্দের অধিকার ও প্রতিষ্ঠা তর্কাতীত সেই কাব্যের জগতেই কবি-চেতনার মূল্যায়ন খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। দুই, কবিতা ব্যতীত অন্যবিধ রচনায় জীবনানন্দের উৎসাহ ও কৌতূহল কোনসময়েই তাঁর কাব্যসৃষ্টির সম্পূরক হয়ে ওঠার মত গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কবির যে চেতনাজগৎ আমাদের আলোচ্য তার চারিত্র্য ও বিশিষ্টতার ক্ষেত্রগুলি আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করেছি একদিকে বিবর্তন অন্যদিকে সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে রেখে।

'ঝরাপালক' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' এবং তারও পরবর্তী কাব্যের দ্বারা অধিকৃত সময়-পরিসরে কবিমানসের যে উদ্‌বর্তন ও পরিণতি লক্ষণীয় তাই আমাদের পর্যালোচনার বিশেষ ক্ষেত্র। প্রকৃতি, প্রেম, ইতিহাস ও সময়—যে প্রধান চারটি বিষয় নিয়ে এই পর্যালোচনা বা জীবনানন্দের চেতনাজগতের বিবর্তন-বিশ্লেষের প্রয়াস আমরা নিয়েছি, সেই বিষয় নির্বাচন তথা অনুসন্ধিৎসা কবি-নির্দেশিত পথ বা ইঙ্গিতের সূত্র ধরেই নির্ধারিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, শ্রেষ্ঠ কবি সকল সময়ই শ্রেষ্ঠআলোচক না হতে পারেন, তবু আলোচক-কবির কাব্যবিষয়ক উক্তি-প্রত্যুক্তি থেকে প্রায়শই পাওয়া গেছে সেই আলোকিত দীপাধার যার সাহায্যে

তাঁর নিজের সৃষ্টির রহস্যময় গভীরে বিচিত্র অর্থের সম্ভার খুঁজে পাওয়া যায়। 'কবিতা সম্বন্ধে বড়, সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত—সৎ কবিদেরই নিজেদের অনুভূতি ও চিন্তার কবিতাত্মক প্রয়োগ থেকে তাদের খুলে নিয়ে অন্য প্রয়োগে—কবিতা সম্পর্কে আলোচনায়—মাঝে মাঝে নিয়োজিত করা দরকার।' এ উক্তি স্বয়ং জীবনানন্দেরই। 'শ্রেষ্ঠকবিতা'র ভূমিকায় যেমন "কবিতার কথা" গ্রন্থের 'কবিতা-প্রসঙ্গে' নিবন্ধটিতেও তেমনই মনোযোগী পাঠক দেখতে পান জীবনানন্দ কিভাবে আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকার এক অনাদি তৃতীয় বিশেষত্ব হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। তিনি নিজেকে নাট্যকবির পর্যায়ভুক্ত করে 'উৎসনিরুক্তিই' একমাত্র প্রার্থিত বলে মনে করেন নি। (নিজেকে লিরিক কবি বলে স্বীকার করে নিয়ে তিনি লিরিককবির বিচরণভূমিকে চিহ্নিত করেছেন প্রকৃতি, সমাজ ও সময়-অনুধ্যান বলে। আবার, সময়চেতনাকে তিনি 'সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য' বলে গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে এবং এই সময়চেতনার মূল্য বা তাৎপর্য বারবার নতুন করে আবিষ্কৃত হতে পারে, তাও মেনে নিয়েছেন।) এই জাতীয় উচ্চারণের সংকেত-সূত্র ধরেই আমরা তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টি চারটি প্রধান বিষয়ভূমিতে আবদ্ধ করে নিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেছি, অবশ্যই, 'প্রস্মৃতিজ্ঞান', বা বিবর্তনমুখিনতার সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান অভিমত স্মরণে রেখে। পর্যালোচনার প্রয়োজনে চিহ্নিত, এবং সেই অর্থে খণ্ডিত, অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রগুলি হল: প্রকৃতি, প্রেম, ইতিহাস ও সময়। অন্যদিকে 'অস্তিত্ববাদ' ও 'আস্তিক্যবোধ' নামাঙ্কিত অধ্যায়দুটিতে কবিচেতনার সম্ভাব্য পরিণতিকে যাচাই করে নিতে কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছি। (একদিকে মানব-অস্তিত্বের নিরর্থকতার উপলব্ধি, অন্যদিকে সময় ও ইতিহাসের প্রজ্ঞায় শীলিত চেতনায় মানবের মৃত্যুহীন ক্রমাগ্রগতির বোধি—এই দ্বৈত ও বিপ্রতীপ আকর্ষে জীবনানন্দের কাব্য-পরিণতি আলোড়িত হতে হতে শেষপর্যন্ত একটি আস্থাকরোজ্জ্বল

'আলোপৃথিবীর' সংকল্পনায় প্রাণিত হয়েছে) যা আমাদের আলোচনার অন্তিম প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু।

এই পর্যালোচনার শীর্ষনামায় 'চেতনাজগৎ' কথাটিকে ব্যবহার করা হয়েছে বিশিষ্ট অর্থে। 'চেতনা' বলতে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়নির্ভর সংবেদন নয়, মানবমনের স্বভাবী 'প্রতর্ক' বা যুক্তিবিচারবৃত্তি ও তার মধ্যে অন্তর্গ্রথিত হয়ে আছে এ সত্যটি ভুললে চলবে না। জীবনানন্দ স্বয়ং কাব্যসৃষ্টির উৎস খুঁজেছেন, আমরা জানি, 'কবির হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা'য়; অন্যত্র যে বিশেষ মানস-প্রক্রিয়ায় এই সমাহার কবিতার শিল্পে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাকে বলেছেন কবির নিজের 'চিন্তা ও অনুভূতির কবিতাত্মক প্রয়োগ'। এর থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল অনুভূতি উপলব্ধির অতিরিক্ত যে চিন্তন বা মনন তাকে জীবনানন্দ কাব্যের পরিধির বাইরে রাখেননি। অথচ, তাঁর কাব্যের ঢের সহৃদয় অনুশীলনেও কবির চিন্তার বিস্তার বা মননের উদবর্তনের প্রসঙ্গটি অচিহ্নিত থেকে গেছে অনেক ক্ষেত্রেই। তাই, ("ধূসর পাণ্ডুলিপি"—"রূপসী বাংলার" ইন্দ্রিয়-গোচর সংবেদনশীলতার রম্য ও মোহময় জগতের অধিবাসীমাত্র বলে আমরা জীবনানন্দকে কখনও গ্রহণ করিনি, সর্বদাই তাঁকে উত্তরিত হতে দেখেছি প্রতিবেশ ও কালজ্ঞানের যথার্থ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্বাস ও প্রেরণায় দীপ্ত এক চেতনা-লোকে। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতি নয়, মনন বা বিচারশীল মানবস্বভাবের অন্তর্জাত আলোকে প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধিগুলিকে জীবনানন্দ যে বারবার 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরে' ফলিয়ে নিয়ে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে নির্মাণ করে দিয়েছেন কবির সংকল্পনার এক অনন্য সেতুলোক,) এ কথাটি আমরা এ পর্যালোচনায় পাঠককে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি।

ফলে কিছুটা পুনরুক্তি বা অতিকথনদুষ্ট হয়ে পড়েছে হয়তো বা আমাদের প্রতিবেদন। সে সবের একটি কারণ ব্যাখ্যার অত্যুৎসাহ,

আরেকটি হল কাব্যসৃষ্টির বিষয়বিভাজন যা স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর নিবদ্ধ বা অন্তর্গ্রথিত। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আলোচনার অগ্রগতি অনেকসময় সূত্র বা প্রেক্ষিতসন্ধানে পুনরুক্তির শিকার হয়ে পড়েছে। বাংলা টাইপের দীনদশা ও অদক্ষতা অনেকক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, মধ্য-পদলোপ, বর্ণাশুদ্ধি বা বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। এসব ক্ষমতাবহির্ভূত ত্রুটির জন্যও প্রতিবেদক ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রথম অধ্যায়

প্রকৃতি

"জীবনানন্দ প্রকৃত কবি এবং প্রকৃতির কবি।" একথা সকলের আগে উচ্চারণ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু।[১] বলেছিলেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রসঙ্গে এবং তারও আট বছর পরে প্রকাশিত 'বনলতা-সেন' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জীবনানন্দকে অভিহিত করেন 'নির্জনতম' বিশেষণে। জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির যে অধ্যায় সম্বন্ধে বুদ্ধদেব গভীর উৎসাহিত ছিলেন, সে প্রসঙ্গে জীবনানন্দের এই উক্তি অবশ্যই স্মরণীয়ঃ ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়। ··তারপরে 'বনলতাসেন' এবং পরবর্ত্তীকাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।"[২] এই স্মরণীয় কথাগুলির ওপর আপাতত কোনও মন্তব্য না করেই বলা যায় যে বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখে এবং আদি-পর্যায়ের কাব্যরচনার ওপর তাঁর ধারণার পরোক্ষ এবং প্রতিবাদহীন স্বীকৃতির মাধ্যমে জীবনানন্দ তাঁর নিজের প্রথমদিকের কবিতাবলীর প্রকৃতি-মগ্নতা স্বীকার করেই নিয়েছেন।

বস্তুত বাসভূমির সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের যে সম্পর্ক মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতিরও তাই। সে অর্থে সকল কবিরই কাব্যে প্রকৃতি উপস্থিত, প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে, কোথাও তা বিচরণভূমি, অন্যত্র লীলাক্ষেত্র, কদাচিৎ কয়েকজনের তা একান্ত আবাস। শুধুমাত্র, 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি'

১। কালের পুতুল। ধূসর পাণ্ডুলিপি।

২। কবিতাপ্রসঙ্গে জীবনানন্দ। কবিতার কথা

ও 'বনলতাসেন' পাঠে জীবনানন্দ সম্পর্কে ওই শেষতম বিশেষণটিই প্রয়োগ করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অগ্রসর হয়ে যে পাঠক 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত পৌঁছবেন, তাঁর পক্ষে সে ইচ্ছা আর অকুণ্ঠিত হবে না। 'মহাপৃথিবী'তে নিসর্গাশ্রিত কিছু কবিতা স্থান করে নিলেও 'সাতটি তারার তিমিরে' বিশুদ্ধ প্রকৃতিনিবিষ্ট কবিতা অনুপস্থিত বলবো। জীবনানন্দ নিজেই জানিয়েছেন, আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের পটভূমিকায় দেখে তারই মধ্যে হতে তিনি 'উৎসনিরুক্তি' খুঁজে পান্‌নি। তবু, (কবি যে কখনও কখনও কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে নেন, সে এক বিশুদ্ধ কবিজগৎ সৃষ্টিরই প্রয়াসে—যেখানে আত্মচেতনার 'শুদ্ধ মুকুরে' বাস্তবকে ফলিয়ে দেখা যায়। প্রকৃতি, সমাজ ও সময়-অনুধ্যান, এই ত্রিভুবনচারী লিরিক কবির কাব্যসৃষ্টির কোনো কোনো অধ্যায়ে কোনও একটি 'ভুবন' প্রধান হয়ে ওঠে।[৩] কাব্যরচনার প্রথম পর্যায়ে জীবনানন্দের কাছে যে 'ভুবন' 'চরম' হয়ে উঠেছিলো তা প্রকৃতিভুবন—নিসর্গের এক প্রশান্ত আশ্রয়। তবু, আমার বিশ্বাস, এই প্রকৃতিভুবন কোনো-দিনই কবির কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়নি। তাঁর কাব্যে প্রকৃতি প্রথমাবধিই এই উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব—কখনো তা মূলাধার কখনও বা প্রেক্ষাপট, কিন্তু কোন সময়েই 'মানবসমাজের ঘনঘটায় দুর্নিরীক্ষ্য' হয়ে হারিয়ে যায়নি।)

এই প্রাথমিক ভূমিকায় দেখাতে চেয়েছি যে স্বীয় কাব্যের প্রকৃতিমগ্নতা সম্বন্ধে জীবনানন্দের নিজস্ব সচেতনতা যথেষ্টই ছিল, এবং এই প্রকৃতিচেতনা তাঁর কাব্যসৃষ্টির সকল পর্যায়ে কমবেশি সক্রিয় ছিল। আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। জীবনানন্দ স্বয়ং বলেছেন, 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরে' কবি যে চেতনার জগৎ সৃষ্টি ও আবিষ্কার করেন তা কোনো সময়েই কেবলমাত্র প্রাতিভাসিক

৩। কবিতা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ। কবিতার কথা।

নয়, কেননা সেখানে 'বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না।'[৪] জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা প্রসঙ্গে এ কথা সর্বাংশে সত্য। তাঁর সার্থক রচনাগুলির সর্ব-অবয়বে ছড়িয়ে থাকে প্রায়শই এমন এক প্রতীকী দ্যুতি যা পরা-বাস্তবতার আভাস বহন করে ফেরে। কাব্যরচনার নানা পর্যায়ের অনেকগুলি প্রকৃতি-নিবিষ্ট কবিতা এই প্রতীকী সংকেতে সমৃদ্ধ থেকে জীবনানন্দের প্রকৃতি-চেতনাকে দিয়েছে এমন এক অনন্যতা যা সমকালীন দেশীবিদেশী অনেক কবির রচনাতেই বিরল। জীবনানন্দের প্রকৃতিজগৎ তাই প্রচলিত চিন্তাময় প্রভাবিত বর্ণনা-অনুষঙ্গের কোনও জগৎ নয়—স্বতঃস্ফূর্তিতে উজ্জ্বল, স্বকীয় নির্মাণে বিশিষ্ট, বাংলা কবিতার পূর্বাপর ইতিহাসে বড়ো অনন্যপূর্ব, বোধ ও ইন্দ্রিয়বেদ্য এক কবিজগৎ। তবে, আরও একটি কথা থেকে যায়। এই যে বিশিষ্ট অর্থে জীবনানন্দীয় প্রকৃতিভুবন তা প্রথমাবধিই তাঁর কাব্যে এক অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বের মত উপস্থিত নয়। কাব্যরচনার বিভিন্ন পর্যায়ে কবিচেতনার ভিন্ন ভিন্ন মগ্নতার রঙে ও সুরে এই প্রকৃতিজগতের নব নব মূল্যায়ন ঘটেছে তাঁর কাব্যের প্রবহমান বিকাশে। 'ঝরাপালকে'র অনুকারী ঝংকার থেকে 'আলো পৃথিবী'র ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়ের মন্দ্র উচ্চারণ এমন এক সুদূরতম সিদ্ধি যা বাংলা কবিতার ইতিহাসে তুলনাহীনভাবে বিরল। অথচ, প্রথম কবি-জীবনের সেই প্রভাবিত রচনাগুলি থেকে একেবারে শেষপর্যায়ের অনন্য কবিতাগুলি পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজিত থেকেছে প্রকৃতিচেতনার ধারাটি, কখনও একক একান্তভাবে, কখনও বা অন্যতমরূপে। তাই কাব্যরচনার বিভিন্ন পর্যায়-বিন্যস্ত বিশ্লেষণে এই বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় প্রকৃতিচেতনার স্বরূপটি সম্পর্কে অভিনিবিষ্ট পাঠকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

রচনাকালপঞ্জী অনুসারে 'ঝরাপালক'ই জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থটি কবির কাছে

৪। "কবিতা প্রসঙ্গে"—জীবনানন্দ।

'অকিঞ্চিৎকর'[৫] মনে হলেও আমরা তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারি না। পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সনে, ন'বছর পরে। 'রূপসী বাংলা' নামে প্রকাশিত আর একটি মরণোত্তর সংকলনে এমন কিছু সনেটজাতীয় কবিতা গ্রথিত হয়েছে যেগুলি বিষয় ও শৈলীর আন্তরসাযুজ্যে 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি'র নিকটবর্তী। কালানুক্রমী যে কোনও নিরিখেই এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ দিয়ে চিহ্নিত হবে জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির প্রথম পর্যায়। কবিতাভবন থেকে বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করেন জীবনানন্দের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ, আধুনিক বাংলা কবিতার সবচেয়ে উজ্জ্বল মোড়-ফেরা, "বনলতাসেন" ১৩৪৯ বা ১৯৪২ সনে। 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের আদি সংস্করণ 'বনলতাসেন'-এ ছিলো মাত্র বারোটি কবিতা যেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বছর দুই পরে, ১৩৫১র শ্রাবণে প্রকাশিত হয় 'মহাপৃথিবী'। এই দুটি গ্রন্থ একত্রে চিহ্নিত করতে পারতো তাঁর কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায় যদিনা, অন্ততঃ প্রকৃতি-ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে, এই দুই গ্রন্থে আমরা লক্ষ্য করতাম বিষম প্রবণতা। কি আদি সংস্করণ 'বনলতা সেন' কি পরবর্ত্তীকালের পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণের কবিতাবলীতে লক্ষ্য করা যায় মানুষিক বাস্তবতার জগৎ থেকে নৈসর্গিক প্রশান্তির মধ্যে কবির চেতনার ক্রমাপসরণের এমন এক প্রবল আকাঙক্ষা যা প্রকৃতির সত্তার মধ্যে খুঁজেছে অস্তিত্বের এক জৈব নিমজ্জন। 'মহাপৃথিবী'তে ~~এরই সমান্তরাল আগ্রহে~~ উদ্দীপিত হয়েছে এক মর্ত্যমুখী আবর্তন ; সমাজ ও সময়সীমায় বদ্ধ এক মানবিক পৃথিবী তার সমস্ত লোভ ও রিরংসার, রণ ও রক্তের প্রবলতর আকর্ষে কবিকে টেনে এনেছে দেশকালের চিহ্নিত ভূগোলে ; এখানে রয়েছে প্রকৃতি-চেতনার পাশাপাশি প্রতিবেশচেতনার আঘাত।) এই প্রতিবেশ, দেশ, কাল ও সমাজ, তার মূল্যবোধের বিপর্যয়ে জীবনানন্দকে এই পর্যায় থেকেই এমন প্রবল আচ্ছন্ন ও সংক্ষুব্ধ করে রেখেছিলো যে তাঁর

৫। আদি সংস্করণ : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কাব্যসৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে, 'সাতটি তারার তিমির'-এর মতন গ্রন্থে এবং তার সমকালীন কবিতাবলীতে, প্রকৃতি একরকম অনুপস্থিতই বলা যায়। 'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর আটচল্লিশে। মহাযুদ্ধ তার মূল্যবিনাশী অন্ধকারে তখনকার মত এমনই সমাচ্ছন্ন করেছিলো কবিচেতনা যে প্রকৃতির প্রশান্তির আশ্বাস ও আশ্রয়বিচ্যুত দিশাহীনতায় এসময়কার বহু কবিতাই প্রতিকূল প্রতিবেশের বিষম আঘাত বহন করছে। কিন্তু উনিশশো পঞ্চাশের পর থেকে লেখা বহু কবিতায় আবার প্রকৃতির প্রত্যাবর্তন লক্ষণীয়। মরণোত্তর কিছু প্রকাশনায় প্রকৃতির অনিঃশেষ প্রশান্তির উজ্জ্বল উল্লেখ এমনই অপ্রতিরোধ্য শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত যে মনে হয় শেষ পর্যায়ের এইসব কবিতাবলীতে কবির চেতনা বলয়িত হয়ে স্থিত হয়েছে বিশ্বাসের নতুন ভূমিতে। জীবনানন্দের রচনার এই কালানুক্রমিক অনুসরণে ও পর্যায়বিন্যস্ত বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর চেতনার বিকাশের ধারায় প্রকৃতিভাবনার প্রবলতা ও আনুকূল্য। জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি 'হেমন্তময়' বলে দায়মুক্ত হওয়া যায়না; তাঁর প্রকৃতিচেতনায় পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, কীট্সীয় ইন্দ্রিয়বেদ্য রূপাবিষ্টতা থেকে প্রকৃতিদৃষ্টিতে প্রায় ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় দার্শনিকতার সঞ্চার; নশ্বর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি-ভুবনে প্রশান্তির সন্ধান পাওয়া এবং প্রকৃতিলীন জীবনযাপনের ধারণা থেকে প্রকৃতি ও হৃদয়ের সমাহারে মর্মরিত হরিৎ আলোপৃথিবীর চেতনায় উত্তরণ।

প্রকৃতিচেতনার এই ক্রমপরিণতশীল উদবর্তনে 'ঝরাপালক' আক্ষরিক অর্থেই প্রায়-স্খলিত সেই বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় উদ্ভাসন থেকে যা বার বার এই প্রাচীন পৃথিবী এবং তার অনুসঙ্গী 'কান্তার নক্ষত্র, নদী···আম-বট-হিজলের শিরীষের অথবা নিমের' পরিচিত নিসর্গকে তাঁর কবিতায় এক অনন্য মহিমায় উপস্থিত করছে। কাব্য-রচনার তাবৎ ইতিহাসে দেখা যায়, প্রথম আবির্ভাবে সপ্রতিভতা

কখনও কখনও থাকলেও কোনও বড় শিল্পীর মহৎ স্বকীয়তা অনর্জিতই থাকে। 'ঝরাপালক' জীবনানন্দের প্রথম গ্রন্থ; তাই স্বাভাবিক-ভাবেই এখানে অনুপস্থিত থাকবে তার স্বকীয় উচ্চারণ, বিষয়ের নিজস্ব উদ্ভাসন। এসব স্বীকার করে নিয়েও 'ঝরাপালক'-এর কথা বলতে গিয়ে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি জীবনানন্দের নিজের পৃথিবী থেকে এর (সমূহ কবিতার) অনতিক্রমনীয় দূরত্বের কথা ভেবে। এ গ্রন্থের সমূহ কবিতায় অনুকৃতি এমন সোচ্চার ও উলঙ্গ যে কিছু নজরুলী ঘোষণা, কিছু সত্যেনদত্তীয় ছন্দচপল লঘুমুহূর্ত আর দেহবাদিতা যা মোহিতলালকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এসব ছাড়া, বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় না হোক, ঘনিষ্ঠ আন্তরিক উচ্চারণও বিরল। তবু, সত্যেনদত্তীয় ঝংকার থেকে বহুদূর এমন এমন কিছু পঙক্তির কথা বুদ্ধদেববাবু বলেছেন[৬] যা অনুকারী উচ্ছ্বাসের মধ্যেও অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় জায়মান জীবনানন্দকেই। "ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল" উচ্চারণে ও আবহে প্রকৃত জীবনানন্দীয় আমেজ বহন করছে। 'ঝরাপালকের' আরও কিছু কবিতায় বিকীর্ণ রয়েছে এমন কিছু শব্দ, চিত্র ও বাক্‌ভঙ্গি যা নজরুল বা সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাববৃত্তের বাইরে। 'পিরামিড', 'নীলিমা', 'সেদিন এ ধরণীর' এবং 'নাবিক' চারটি কবিতাই এক ধরণের মনোযোগ দাবী করে; কিন্তু আমাদের আলোচনার ভিত্তির উপর তেমন কোনও আলোকপাত করে না। আসলে আত্মপ্রকাশের এই পর্যায়ে প্রকৃতি সম্পর্কে কবির মনে কোনও নির্দিষ্ট ধারণা তখনও জন্ম নেয়নি। প্রচলিত চিন্তাময় প্রভাবিত সব কবিতার আবেগউদ্বেল রচয়িতার কাছে প্রকৃতি তখন নিসর্গদৃশ্যমাত্র। কবিতায় তার উপস্থিতি এক অঙ্কিত পশ্চাৎপটে—'বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি আঁধারে'। আর, এই গোধূলির আকাশের নিচে দেখা যায় 'মটরখেতের শেষে' 'ভাটিয়ালী সুরে' ভেসে যাওয়া নৌকা এসে থামে 'বালুর ফরাশে'।

৬। "কালের পুতুল"। "ধূসর-পাণ্ডুলিপি" নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

সেই পরিচিত গ্রাম্যনিসর্গ—বর্ণাঢ্য কিন্তু সংবেদনাহীনভাবে নিরুত্তাপ—যার প্রতিটি বিবরণই ছিল প্রত্যাশিত তাই নিশ্চমক। গ্রন্থের নাম কবিতাটি থেকেই এই আবহচিত্রটি উদ্ধৃত হল, অনুরূপ আরও উল্লেখে বিরত থেকে। তবু অনুশীলিত পাঠে, 'ঝরাপালক'-এর মত গ্রন্থেও উদ্ঘাটিত হয় এমন কিছু বিকীর্ণ মনোবীজ যা আভাসিত করে দেয় উত্তরকালের সেই নিবিড় অরণ্যখণ্ড যাকে আমরা বিশেষ করে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিজগৎ বলে জানি। ডাহুক-শালিক-গাঙচিল-হরিয়াল-ঘুঘু-কপোত-মরাল-চিহ্নিত 'ঝরাপালকে'র জগতে এসে পড়ে 'সাগর-বলাকা'। 'সাগর-বলাকা'র মত কবিতা শব্দচয়ন ও ছন্দনর্তনে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েও স্বপ্নের নির্মাণ ও প্রয়াণের এমন একটি কেন্দ্রিক ছবি অস্পষ্টভাবেও তুলে ধরে যা যে কোনও অনুরাগী পাঠককে অভ্রান্তভাবে মনে করিয়ে দেয় কাব্যের সেই তুঙ্গশিখর যা অনায়াসেই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিলো 'সিন্ধু সারস'-এর ডানায়। 'মহাপৃথিবী'র সেই অত্যাশ্চর্য কবিতায় 'সিন্ধু সারস' হয়ে উঠছে এক শাশ্বত উজ্জ্বলপ্রাণেষণার প্রতীক, শীতার্ত-এ' পৃথিবীর-ক্লান্ত বুকে' তার গান নির্মাণ করে দেয় 'নতুন সমুদ্র এক' 'শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ'। 'ঝরাপালকের' 'সাগর-বলাকা' থেকে বহুদূর এই সাহসিক প্রয়াণ ও উদ্ধারের অকল্পনীয় কাব্যরূপ। তবু 'সাগর বলাকা'য় আছে এক স্বপ্নপ্রয়াণের আবেগ, যত কৈশোরক উচ্ছ্বাসেই তার প্রকাশনা বিহ্বল হোক না কেন ;'প্রয়াণ তোমার প্রবাল দ্বীপে' যেখানে .'মৌন মীনকুমারীর' শঙ্খের আহ্বান, এবং পুরোনো আবাস ভেঙে ফেলেই এই যাত্রা ("ভেঙে হেথার বালিয়াড়ীর বাড়ী")। আসলে ভাষায় ও ভাবনায় অনুকৃতি ও প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ থেকেও 'ঝরাপালকে'র কবি বিরুদ্ধ বাস্তব থেকে প্রসন্ন স্বপ্নের সন্ধানেই ব্যাপৃত ছিলেন। 'সিন্ধু সারস'-এর মতো তাই 'সাগর-বলাকা'তেও দুই বিপরীত জগৎ অস্ফুট আভাসিত। 'ঝরাপালকে'র অনুষঙ্গেই এসেছে 'ব্যাধবিদ্ধ ধরণীর রুধির লিপিকা'র মত রূপক। একটি কবিতায়

নামে (নীলিমা) এবং অনেকগুলি উল্লেখে 'নীলিমা' শব্দটিও একধরণের প্রতীকী আবহ নির্মাণ করে। 'বাস্তবের রক্ততট' থেকে বহুদূর এই 'নিষ্পলক নীলিমা' তার 'মায়াদণ্ডে ভেঙে ফেলে, জনতার কোলাহল', 'লক্ষ বিধি-বিধানের কারাতল' এই 'বসুধার কারাগার' এই কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক'। নীলিমা হয়ে ওঠে কবির কাছে এক দূর অতন্দ্র কল্পলোক। এই ভাববিশ্লেষণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব কটি শব্দই অবিকৃতভাবে আহৃত হয়েছে 'নীলিমা' কবিতাটি থেকেই। বোঝা যায়, প্রায় সকল সৎ কবির মতনই জীবনানন্দ প্রথমাবধি সংক্ষুব্ধ ছিলেন বাস্তব ও কল্পনার বিপরীতমুখী টানে। রক্তাক্ত বাস্তব থেকে দূরস্থ তাঁর কল্পনার জগৎ গঠিত হয়েছিল কিন্তু কোনও অনৈসর্গিক উপাদানে নয়—প্রকৃতি জগতেরই বস্তুনিচয়ে, আকাশ বা পাখি বা রোমান্টিক দূরমনস্কতায় স্বপ্নোচ্ছ্বসিত 'দূর হিঙুল মেঘ', 'রাঙাচাঁদের নিচে রূপসী ধরণী', 'ঘাসের বুকে ঝিলমিল শিশিরের জলে খুঁজে পাওয়া' 'মানসী' যার 'ননীর আঙুল' ছুঁয়ে যায় 'কচি নোনা শাখা'। 'নীলিমা' কি 'সাগর-বলাকা', যা আশ্রয় করে রচিত হয়েছে 'ঝরাপালকে'র স্বপ্নজগৎ, প্রকৃতি ভুবনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। আবার, এই নৈসর্গিক আবহ-রচনায় কবি ব্যবহার করেছেন এমন শব্দ ও চিত্র যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ম্লান হৈমন্তিক, মৃত্যুআহত প্রকৃতি জগতের পদধ্বনি বহন করে।

> ডেকেছিল ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিমমাস, জোনাকীর ঝাড়।
> আমারে ডাকিয়াছিল আলেয়ার লাল মাঠ, শ্মশানের খেয়াঘাট আসি।
> (সেদিন এ ধরণীর)

এ জাতীয় চরণ যে নৈসর্গিক পরিমণ্ডল রচনা করছে তা বাংলা কাব্যে প্রকৃতির নূতন স্বাদ নিয়ে-আসা 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' কথা মনে করিয়ে দেয়। 'হেমন্তের হিমমাঠ', 'হলুদ-পাতার ভিড়ে'র মত শব্দযোজনা জীবনানন্দ 'ঝরাপালকেই' প্রথম করেছেন। কিন্তু, বিষয় ও শৈলীর সামগ্রিক দুর্বলতায় সে সবই হারিয়ে যায়।

জীবনানন্দের কাব্যশিল্পের বিবর্তনের ভাষ্যে আমরা 'ঝরাপালক' থেকেই এমন বহু উল্লেখ আহরণ করে নিতে পারি যা অভ্রান্তভাবে পরবর্তী জীবনানন্দীয় বিশিষ্ট বাগভঙ্গির ইঙ্গিতবহ। এখানে, প্রকৃতিভাবনার প্রসঙ্গে আমরা এটুকুই বলতে পারি যে এই প্রাথমিক কাব্যপ্রয়াসে জীবনানন্দের প্রকৃতিদৃষ্টি কোনও নির্দিষ্ট পরিণতি পায়নি। প্রকৃতি সম্পর্কে একালে তাঁর রচনায় কোনও স্বকীয় সচেতনতা অনুপস্থিত থাকলেও নিসর্গের যে বস্তুনিচয় বা দৃশ্যরাজি তাঁর কল্পনাকে এক স্বকীয় উচ্চারণের দিকে আকৃষ্ট করেছিলো সেগুলি নিঃসন্দেহে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ম্লানালোকিত হৈমন্তিক নিসর্গভুবনের অনুষঙ্গ নিয়ে আসে।)

জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতির উপস্থিতি, চেতনা ও চারিত্র্য নিয়ে যে কোনও আলোচনায় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এক বড় ভূমিকায় উদ্ধৃত হয়ে থাকে। ১৩৪৩-এ প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রধান কাব্যবিষয় যে প্রকৃতি সেকথা অনস্বীকার্য। নিসর্গই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মৌল রসকেন্দ্র। প্রেমকে উপজীব্য করে যে কটি কবিতা এখানে আছে তাও পাত্রপাত্রীর উল্লেখমাত্রকে অতিক্রম করে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজেছে কাব্যাবেগের মুক্তি। কবিতার পর কবিতায় স্ফুট হয়ে উঠেছে এক পরিব্যাপ্ত নিসর্গভুবনের ছবি— ধূসর, কোমল, ম্লান ও শীতার্ত সে চিত্র; বড় অপরূপ অথচ বড় নশ্বর। কোনও উৎসব বা দুর্দশার পৌরাণিক সঙ্গীত নয়,[৭] এ কাব্যের আহ্বান এক স্বপ্নের জগতে। 'চিত্ররূপময়' এ জগৎ, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেখানে 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' আছে। আমরা আরও বলি, এক অনন্যপূর্ব স্বকীয়তা আছে সেই তাকিয়ে দেখার মধ্যে! পূর্বসূরী কি সমসাময়িক আরও কোনও কবির রচনায় আমরা পাইনি ধূসর পাণ্ডুলিপির পরিব্যাপ্ত হৈমন্তিক বিষাদ। কবিমানসের এক মুগ্ধ অভিভূত অভিনিবেশে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ও নির্জনতার এক তাৎক্ষণিক উদ্ভাসন ঘটেছে কবি-চেতনায়; প্রায় পরমুহূর্তেই তা

৭। 'কয়েকটি লাইন': ধূসর পাণ্ডুলিপি।

আক্রান্ত হয়েছে এই 'অধরা 'মাধুরী'-র নশ্বরতার বিষণ্ণ উপলব্ধিতে। প্রকৃতি-চেতনার এই প্রথম ও স্বকীয় স্ফূটনের সঙ্গেসঙ্গেই একালের কাব্যে নির্মিত হয়ে উঠেছে কল্পনায় বলীয়ান এক কবিজগৎ যা স্পষ্ট-ভাবেই নিসর্গআশ্রিত, বাস্তবের বিপরীতভূমিতে অবস্থিত, ব্যাহত ও পীড়িত জীবনের মুক্তির আশ্রয়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিজগতের বিশিষ্ট পরিমণ্ডলটি ব্যাখ্যা করার আগে আমরা স্মরণ করে নিতে চাই কবির কিছু মূল্যবান উক্তি যা আমাদের দৃষ্টিকোণটি যথার্থতায় প্রতিষ্ঠা করবে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি জীবনানন্দ তাঁর কাব্যের প্রকৃতি-মগ্নতা সম্পর্কে আগাগোড়াই সচেতন ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন, 'আজ পর্যন্ত যে সব কবিতা আমি লিখেছি সে সবে আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভা-ভূমিকায় এক অনাদি তৃতীয় বিশেষত্ব হিসেবে স্বীকার করে, কেবলমাত্র তারি ভিতর থেকে উৎস-নিরুক্তি খুঁজে পাইনি।'[৮] পরে বলেছেন, "কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই, রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখাতে চায়।" এবং পরিশেষে জানাচ্ছেন, "আমিও সাময়িকভাবে কোনো কোনো জিনিষকে 'চরম' মনে করে নিয়েছি জীবন ও সাহিত্যের তাগিদে।"[৯] জীবনানন্দের কাব্য-ব্যাখ্যায় এই কথাগুলি অশেষ মূল্যবান, প্রায় সূত্রের মত, গুরুত্বময় এবং তাৎপর্য-গভীর। এইসব স্মরণীয় সদুক্তির আলোকে আমরা স্বচ্ছন্দেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রকৃতি, সমাজ ও সময়-অনুধ্যান এই ত্রিভুবনচারী লিরিক কবির চেতনায় সৃষ্টির কোনো কোনো পর্যায়ে কোনও একটি 'ভুবন' 'চরম' বা প্রধান হয়ে ওঠে। সেইরকম ঘটেছিলো

৮। কবিতা প্রসঙ্গে: কবিতার কথা; সিগনেট বুকশপ প্রকাশিত

৯। 'কবিতা প্রসঙ্গে' নিবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের কবিতাবলীতে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কবির চেতনায়, যার প্রায় অগোচর স্ফুটনোন্মুখতা আমরা লক্ষ্য করেছি 'ঝরাপালকে' যুগের প্রভাবিত সব রচনায়।

তবু, আশ্চর্য মনে হতে পারে পাঠকের কাছে, যে প্রকৃতিজগৎকে 'চরম' মনে করে কবির চেতনা আশ্রয় খুঁজেছে "জীবন ও সাহিত্যের তাগিদে" (অর্থাৎ কি ব্যাহৃত বাস্তবের তাড়নায়? কল্পনার অনু-প্রেরণায়?), সেই নিসর্গভুবনে নেই আলোকের উদার সমারোহ, নেই নবীন বসন্তের উদ্দাম প্রাণময়তা, নেই আশ্বিনের হিরণ্যমুক্তি।[১০] 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' আদিসংস্করণের সকল কবিতায় প্রকৃতির এক ধূসর, ক্ষয়িষ্ণু, শীতার্ত, ম্লান, অন্ধকার প্রকাশ বড়ো হয়ে উঠেছে। বড়ো অনন্যপূর্ব সে নিসর্গছবি, শুধু এক নির্জন ধূসরতায় অবলীন। কেমন-ভাবে জীবনানন্দের বহুকবিতায়, নামকরণে ও শব্দযোজনায়, অর্থের অব্যবহিত প্রয়োজন অতিক্রম করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাৎপর্যের এক প্রতীকী বিস্তার, সেকথা তাঁর কাব্যের শিল্প-প্রকরণের আলোচনায় বলার অবকাশ পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম স্বকীয় উচ্চারণেই দেখি, এক ব্যাপ্ত হৈমন্তিক আবহে নিসর্গঅভিজ্ঞতার যে পাঠ নিলেন কবি, প্রকৃতির শোভাভূমিকায় জীবনের যে মূল্যেরই পরিমাপ করলেন, সর্বত্রই তার বিভিন্ন পাঠ নিয়ে অভিজ্ঞতার যে পাণ্ডুলিপি রচিত হল, তা যেন ধূসর। নামকরণের প্রতীকী ইঙ্গিতের এ অনুধাবন নিরর্থক নয়, কেননা এই তাৎপর্যসন্ধান কবির প্রকৃতি-চেতনার বিশিষ্ট চারিত্র্যের সঙ্গেই যুক্ত করছে তাঁর এ পর্যায়ের কবিতা-বলী। কবি স্বয়ংই লিখেছেন, 'আমার কাব্যের উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতিচেতনার ভিতর রয়েছে বলেইতো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সবসময়ই যে ধূসর তা হয়তো নয়'[১১] নয় যে সে কথা সর্বাংশে সত্য; কারণ তাঁর কাব্যের শেষতম পর্যায়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের

১০। 'ময়ূখ' পত্রিকার জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত পত্র—২

১১। ময়ূখ, পৌষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১—২; জীবনানন্দ দাশের পত্র—২

সমাহারে মর্মরিত নবীন এক আলোপৃথিবীর অনুপ্রাণিত বোধনে মুখর হয়ে উঠেছিলো তাঁর কবিকল্পনা।[১২] আর, তার আগেই 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কাব্যেও ধূসর হৈমন্তিক আচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে উঠে প্রকৃতির জগতে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন শুধু মরণশীল এক অপরূপ সৌন্দর্য নয়, প্রশান্তির ও সান্ত্বনার এক স্থির আশ্রয়। তবু, 'ধূসর প্রকৃতিচেতনা'র কথা তিনি স্বীকার করেই নিয়েছেন শর্তাধীন-ভাবে। সেই ধূসর প্রকৃতিজগতের অজস্র চিত্র বিকীর্ণ হয়ে আছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পাতার পর পাতায়। তাই, নিতান্ত আক্ষরিক অর্থ ও বাস্তবিক কারণ অতিক্রম করে আর একরকম প্রতীকী ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হচ্ছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নামকরণের মধ্যে দিয়ে এ কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়। আর এই প্রতীকী দ্যুতি ও অর্থবিস্তার জীবনানন্দের বিভিন্ন পর্যায়ের কাব্যসৃষ্টিতেই প্রাণোজ্জ্বলতা নিয়ে এসেছে।

প্রকৃতিচেতনার প্রাথমিক স্ফুটনে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি রূপাবিষ্ট; প্রকৃতির অপরূপ অথচ ক্ষয়িষ্ণু সৌন্দর্যের তীব্র আস্বাদে তাঁর চেতনা অভিভূত। তাঁর অনুভবের আলোকে অসামান্য হয়ে উঠেছে কত অজস্র পরিচিত নিসর্গবস্তু ও দৃশ্য। কিন্তু, সেই প্রবল রূপাবিষ্টতা, সেই তীব্র তুলনাহীন অনুভব সবসময়েই ইন্দ্রিয়জ বা ইন্দ্রিয়নির্ভর তাঁর এ সময়কার কবিতায়। দৃষ্টি ও শ্রুতির প্রায় স্পৃশ্য এক জগৎ শরীরী হয়ে উঠেছে তাঁর চেতনায়; শুধু চিত্ররূপময় নয়, ধ্বনিগন্ধময় সে জগৎ। নিসর্গ তার অজস্রবিকীর্ণ রূপে বাঙ্ময় করেছে কবিকল্পনা। তবু এসব-কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে 'এক ধূসর কোমল পরিমণ্ডল'[১৩] যা কল্পনা ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণে রচিত এই প্রকৃতিজগতকে ঘিরে রেখেছে।

১২। আলোপৃথিবী শীর্ষক উত্তরমৃত্যুকালে প্রকাশিত কবিতাবলী—'কৃত্তিবাস' নবপর্যায় ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯৭৮।

১৩। কালের পুতুল; বুদ্ধদেব বসু, 'ধূসব পাণ্ডুলিপি' প্রসঙ্গে আলোচনা।

এই ধূসর কোমল পরিমণ্ডলটি চিনে নিতে গিয়ে আমরা দেখি, যে হেমন্ত রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীতে সসংকোচে একটু জায়গা করে নিয়েছে জীবনানন্দের কবিতার জগতে তারই প্রবল আধিপত্য।| হয়তো হেমন্ত বলেই চিহ্নিত করা যায় না সবসময় তাঁর কাব্যজগতের ঋতুকে। তবু, এ কথা অবশ্যমান্য যে হেমন্ত-শীত এই দুই ঋতু আর কার্তিক অঘ্রাণ এই দুই মাসই তাঁর কাব্যের আলোচ্য অধ্যায়ের প্রকৃতির কালপ্রেক্ষিত। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে বসন্তকালসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ অপেক্ষা শীতনির্দেশী উল্লেখ অজস্র ও অধিক, এবং ঋতু হিসাবে সাধারণত শীত বোঝাতে হেমন্তর চেয়ে 'শীত' শব্দটিই অধিক প্রযুক্ত হয়েছে।| একটি হিসাব নিলে দেখা যাবে, ১। হেমন্তের ঝড় ২। হেমন্তের মাঠে মাঠে ৩। অঘ্রাণের রাতে ৪। শীতরাতে ৫। সবচেয়ে শীত তৃপ্ত তাই ৬। শূন্য সেই শীত নদী ৭। শীতের নদীর বুকে ৮। মাঘরাতে ৯। শীত হেমন্তের শেষে ১০। শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে ১১। কার্তিকের ক্ষেতে ১২। হেমন্তের নাম উৎসব ১৩। কার্তিকের মিঠা রোদে ১৪। হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে ১৫। হেমন্তের ধান ওঠে ফলে ১৬। শীতের হাড়ের হাত ১৭। হেমন্ত আসেনি মাঠে ১৮। শীতরাতে ঢের ১৯। বরফের মত শীত ২০। শীতরাত ২১। শীতমেঘে ২২। হেমন্তের সন্ধ্যায় বাতাস ২৩। শীতে পৃথিবীর শীতে ২৪। শীতের নদীর বুকে ২৫। যেমন শীতের রাতে ২৬। হেমন্ত আসার আগে ২৭। অঘ্রাণের রাতে ২৮। কার্তিকের শীতে ২৯। অঘ্রাণের মাঝরাতে ৩০। হেমন্তের রৌদ্রের মতন ৩১। শীত পিছে ৩২। দীর্ঘ শীত রাত্রি ৩৩। শীতের মত অপরূপ ৩৪। ইঁদুর শীতের রাতে

এই ৩৪ বার ব্যবহারের বিপরীতে বৈশাখ চৈত্র ফাল্গুন প্রভৃতি বসন্ত-আবহবহ শব্দের ব্যবহার বড়জোর মাত্র ১০ বার। উভয়পক্ষের হিসাবেই আমরা একই কবিতার মধ্যে একই শব্দ বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি গণনার বাইরে রেখেছি। স্পষ্টতই কবির

চোখে প্রকৃতির যে রূপ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে প্রধান হয়ে উঠেছে তা শীতার্ত—সে শীত কখনও আসন্ন, মৃদু হৈমন্তিক, কখনও সম্পূর্ণ, কঠিন, মাঘী।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গজগতের ঋতুকে শীত বলে চিহ্নিত করার পর পাঠক দেখেন এ জগতে কুয়াশা, হিম আর ঝরে পড়া পাতার পাশাপাশি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সূর্যালোকের অনুপস্থিতি। এখানে কবি রাতে রাতে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে খুঁজে বেড়ান 'হৃদয়ের সেই গভীর জিনিস'। এজগতে 'মেঠো চাঁদ কাস্তের মত বাঁকা চোখা' চেয়ে আছে, এখানে 'হলুদ পাতার ভিড়ে বসে শিশিরে পালক ঘষে ঘষে', 'মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে', 'অঘ্রাণের রাতে' জেগে আছে পেঁচা ; এখানে 'আদিম রাত্রির ঘ্রাণ' বুকে নিয়ে অন্ধকারে অরণ্য গায় গান, 'শিশিরের শব্দে' গান গায় সেই অন্ধকার, 'আবেগ জানায় রাতের বাতাস'। এখানে কবিমানস প্রেমেরও মুক্তি খুঁজেছে এক ম্লানালোকিত হিমনিশীথ আবহে, 'যেখানে সমস্তরাত ভরে নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝরে' 'ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মত' 'সেইখানে রব পড়ে'। বস্তুত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিজগৎ শুধু শীতার্ত নয়, বড় অন্ধকারময়। যে কবিতার বিষয় 'জীবন' সে কবিতারও উদ্বোধন রৌদ্রময় পৃথিবীর প্রাণচাঞ্চল্যে নয়, বরং সেখানেই যেখানে 'বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর'। সেই জীবনেরও সবচেয়ে প্রাণময় যে অনুভব প্রেম, তারও আবির্ভাবের যে আবহ কবি রচনা করেছেন সেখানে পৃথিবীর 'গহ্বরে মানুষের ঘুম,' 'হৃদয় আহত একা হরিণের মতো' 'পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে' 'হিমের হাওয়ার রাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে' 'জীবনের বিহ্বলতা সয়ে' দিন কাটে। এই যে হিম ধূসর অন্ধকার-আক্রান্ত নিসর্গ তাকে আশ্রয় করে, 'চরম' মনে করে, 'সুস্থিরতা লাভ করার চেষ্টায়', জীবনানন্দের ভাষায়, 'আত্মতৃপ্তি' নেই, রয়েছে কবি-জগৎ সৃষ্টির প্রয়াস। সেখানে যেটুকু আলোর আভাস পাই, তার উৎস আকাশের নক্ষত্র, 'সন্ধ্যার মেঘের রঙ' 'গোধূলির অস্পষ্ট আকাশ',

'ক্ষণবিদ্যুৎ, 'আলেয়ার বাষ্প', আর 'বিকেলবেলার ধূসরতা'। এ জগৎ থেকে 'আহতচিতার মত বেগে পালায়ে গিয়েছে রোদ,' 'সরে গেছে আলোর বিকাল।' বস্তুতপক্ষে, 'জীবন' কবিতাটির সিদ্ধান্ত-গুলি নিবিষ্টপঠনে বারেবারেই আশ্চর্যভাবে চিনিয়ে দেয় জীবনানন্দের প্রকৃতির শোভাভূমিকায় স্বসৃষ্ট চেতনাজগতের যথার্থ স্বরূপ। দেখা যাক্, কোন জীবনের মধ্যে কবি আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁর ইপ্সিতকে:

চলে গেছে জীবনের 'আজ' এক,—আর এক 'কাল'
আসিত না যদি আর আলো লয়ে—রৌদ্র সঙ্গে লয়ে,
এই রাত্রি—নক্ষত্র সমুদ্র লয়ে এমন বিশাল
আকাশের বুক থেকে পড়িত না যদি আর ক্ষয়ে।

জীবনের যে শক্তি মানুষের সমস্ত ইচ্ছা, সাধ, কর্ম আর উদ্যমের পিছনে ক্রিয়াশীল তার মধ্যে কবি খুঁজে পাননি 'কোনও নিশ্চয়তা':

তুমি আছ,—রবে তুমি, এর বেশি কোনো নিশ্চয়তা
তুমি এসে দিয়েছ কি? (জীবন/১১।)

কবি উপলব্ধি করেছেন:

যেই গতি—যেই শক্তি পৃথিবীর অন্তরে পঞ্জরে
সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর,—
তেমনি স্ফুলিঙ্গ এক আমাদের বুকে কাজ করে।

তবু,

শস্যের কীটের আগে আমাদের হৃদয়ের শস্য তবু মরে।

অথবা,

হেমন্ত আসেনি মাঠে, হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন।

তাই,

শেষপর্যন্ত কবির সিদ্ধান্ত:

সব ভালোবাসা যার বোঝা হল,—দেখুক সে
মৃত্যু ভালোবেসে।

বিপরীতে,

এই 'জীবন'কে 'একবারে ভালোবেসে দেখি' বলে কবি জেনেছেন:

> পৃথিবীর পথে নয়, এইখানে—এইখানে বসে,
> মানুষ চেয়েছে কিবা? পেয়েছে কি? কিছু পেয়েছে কি?
> হয়তো পায়নি কিছু,—যা পেয়েছে, তা-ও গেছে খ'সে
> অবহেলা করে করে কিম্বা তার নক্ষত্রের দোষে,—
> ধ্যানের সময় আসে তারপর,—স্বপ্নের সময়।
> শরীর ছিঁড়িয়া গেছে,—হৃদয় পড়িয়া গেছে ধ্বসে।
> অন্ধকার কথা কয়,—আকাশের তারা কথা কয়
> তারপর,—সব গতি থেমে যায়,—মুছে যায় শক্তির বিস্ময়।
>
> 'জীবন'/১৮

'জীবন' কবিতাটি থেকে উদ্ধৃতির এই পরিসর ও অবকাশ নিয়েছি শুধুমাত্র জীবনানন্দের একালের রচনায় প্রকৃতিচেতনার মধ্যে এক-ধরনের ধূসর হিম অন্ধকারের সমাচ্ছন্নতাটি স্পষ্ট করার কারণে। স্পষ্টতই, কবি এখানে 'বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁচড়ায় করে প্রাণপণ' তাদের আহ্বান করে আনছেন এমন এক ম্লান বিষণ্ণ নিসর্গভূমিতে, অন্য এক রূপ ও শান্তির সন্ধানে, যেখানে 'অন্ধকার কথা কয়ে ওঠে', প্রথাবদ্ধ জীবনের সমস্ত বিস্ময় থেমে যাওয়ার পরে। বস্তুত, আদিসংস্করণ 'ধূসর—পাণ্ডুলিপি'-তে কবিতা ছিলো সতেরটি; তার মধ্যে মাত্র দুটি কবিতা পাই যার কাল-পটভূমি রাত্রি নয়, দিন: 'অবসরের গান' ও 'শকুন'। সে দিবালোকও আবার রৌদ্রের নিরঙ্কুশ প্রসাদে উজ্জ্বল নয়, অন্ধকার-আক্রান্ত। 'অবসরের গান' কবিতাটির তিনটি অংশ; প্রথমাংশ 'ভোরের রোদ' থেকে 'রোদ গেছে পড়ে' এমন বিকালের উল্লেখ, দ্বিতীয়াংশে আবার অন্ধকারের আবির্ভাব—'পুরোনো পেঁচারা' বেরিয়ে এসেছে তাদের 'কোটরের' থেকে, 'সূর্যের আলোর দিন' ছেড়ে দিয়ে শিশিরের ভিজা পথ ধরে; মাঠের আহ্বানে সকলে এসেছে 'শস্যের ক্ষেতের পাশে' তাদের পিপাসা মেটাতে অগাধ ধানের রসে, আর শুধু এই সাধটুকু

সম্পূর্ণ হলেই তারা দিনের আলোর 'লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন' মরতে প্রস্তুত আছে। তৃতীয়াংশে, কবির সিদ্ধান্ত: 'পেঁচার পাখার মত অন্ধকারে ডুবে যাক রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ'। চৌদ্দ-চরণের 'শকুন' কবিতাটি সম্পূর্ণ দুপুরের পটভূমিতে রচিত। যদিও সমগ্র 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিচেতনার মূলসুরটির সঙ্গে এ কবিতার সম্পর্ক সামান্যই, তবু লক্ষণীয়, চতুর্দশপদীর স্বল্প-পরিসরেই কবি দুবার 'অন্ধকার'কে স্মরণ করেছেন: কয়েক মুহূর্ত শুধু এই সব শকুনেরা দূর আলো ছেড়ে 'ধূম্রক্লান্ত' দিকহস্তির মত নেমে পড়ে এশিয়ার ক্ষেতে মাঠে; তারপর আঁধার 'বিশাল ডানা'য় পাহাড়ের শিঙে শিঙে আবার আরোহন করে 'বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন বন্দরের অন্ধকারে' ভিড় করে তাই ছাখে। এ কবিতার কাল পটভূমি দ্বিপ্রহর: তবু সারা কবিতাটিতে একটিও উজ্জ্বল রৌদ্রময় দৃশ্য নেই, বরং পরিবেশটি প্রকটভাবে ধূসর। শকুনের নিস্তব্ধ প্রান্তর, ধূমক্লান্ত দিক হস্তিদের উপমা, 'অন্ধকার' শব্দটির উপস্থিতি এবং সর্বোপরি 'বিমর্ষ কিনার'-এর উল্লেখ যেখানে গিয়ে শকুনেরা পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় 'যেন কোন মৃত্যুর ওপার'—সব মিলিয়ে কবিতাটির ওপর এক বিমর্ষ ধূসরতার ছায়া যা শুধুমাত্র নিসর্গমাধুরীহীনই নয়, প্রাকৃতিক শকুন থেকে মৃত্যুর শকুনের অভ্রান্ত অনুষঙ্গে পৌঁছে দেয় কবিতাটিকে। দুপুরের স্পষ্ট রৌদ্রের পটভূমি অতিক্রম করে কিভাবে কবিমানসে 'সাময়িকভাবে' 'চরম' ধূসরতার চেতনা বড় হয়ে উঠেছে তা বিশদ করার প্রয়োজনেই এ আলোচনা।

যে 'ধূসর কোমল পরিমণ্ডল'টির বিশ্লেষণ আমাদের প্রসঙ্গ, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কোনও একটি কবিতার উল্লেখ যদি সেক্ষেত্রে অনিবার্য হয়, যা সবচেয়ে সার্থক শিল্পিত সুষমায় সেটিকে বেঁধেছে, তবে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি সর্বাগ্রে মনে আসে। জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রকৃতিচেতনার প্রথম স্ফুরণে যে মুগ্ধ রূপাবিষ্টতা এবং ইন্দ্রিয়মগ্ন অনুভবের অজস্র বর্ণাঢ্য উৎসার তাঁর একালের

কবিতাবলীকে করেছে নয়নাভিরাম, স্বাদু, সুবাসিত এবং সঙ্গীতময়, তার এমন অনায়াসস্বচ্ছন্দ প্রকাশ আর কোথাও পাইনা। এই একটি কবিতার নিবিষ্ট অনুশীলনই জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার প্রথম পর্যায়ের বিশিষ্ট চরিত্রটি চিনিয়ে দেয়। এক ম্লানালোকিত নির্জন নিসর্গভুবনের অপরূপ মাধুর্য কবি তাঁর সকল ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তায় পূর্ণ উপভোগ করেছেন।' বড় অপরূপ অথচ বড় নশ্বর সেই সৌন্দর্য—হিমার্ত, বিপন্ন তবু স্নিগ্ধ। চিত্ররূপময়তার যে কুললক্ষণে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছিলেন জীবনানন্দীয় বীক্ষাকে, তারই অজস্র উদাহরণে এ কবিতাটি সমৃদ্ধ। অন্যদিকে, জীবনানন্দের নিসর্গানুভূতির সকল প্রাথমিক বিশিষ্টতাই এ রচনাটিতে তাৎপর্য সঞ্চার করেছে। শীত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিজগতের প্রধান ঋতু, আর সে জগতে পাই আলোকের ক্ষীণ ম্লানাভামাত্র। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতেও 'পৌষ-সন্ধ্যা' আর 'অঘ্রাণের অন্ধকারে' কবি 'দীর্ঘশীতরাত্রিটিরে' ভালো-বেসেছেন। জোনাকি, নক্ষত্র আর মরণশীল জ্যোৎস্নার আলোকে আভাসিত এ জগতের নিসর্গদৃশ্য যা কবির চেতনাজগৎকে আবিষ্ট করেছে নির্জনতার আসঙ্গে: 'নির্জন খড়ের মাঠ', 'নির্জন মাছের চোখ', 'নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে', 'নিভৃত কুহকে ভরা' এই অপরূপ নিসর্গের মায়া এমনই প্রবলভাবে অভিভূত করেছে সে চেতনা যে স্পর্শ, গন্ধ, দৃষ্টি ও শ্রুতির সমস্ত ঐকান্তিকতা দিয়ে জীবনানন্দ অনুভব করেছেন সেই সৌন্দর্য এবং তার মরণশীলতার বিষন্ন উপলব্ধিতে জেগে উঠে বলে উঠেছেন:

> আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ?
>
> জানিনা কি আহা,
>
> সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে
>
> ধূসর মৃত্যুর মুখ।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আয়োজন এই সৌন্দর্যের কাব্যরূপায়ণে এক পেলব সম্পূর্ণতা এসেছে। কবি অনুভব করেন পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ, শিশুর

মুখের গন্ধ, চালের ধূসর গন্ধ—এমন কি নরমজলের গন্ধ। ('নরম' শব্দটির প্রয়োগ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করেছে স্পর্শ দিয়ে।) এক একটি চিত্রের আয়োজনে এসেছে নানা ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুভবের অনবদ্য সমন্বয়। (যেমন, 'পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে / পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে'—দৃষ্টি, স্পর্শ ও ঘ্রাণ এ সব কিছুরই উপাদান সম্পূর্ণ করেছে এই চিত্রকল্পের বিস্তার।) অনেকগুলি উদাহরণেই দেখি, জীবনানন্দের নিসর্গ-অনুভূতিতে কীট্‌সীয় ইন্দ্রিয়মগ্নতা, যেখানে প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করার প্রয়াসে অনুভূতির সমস্ত তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা নিয়ে জেগে উঠেছে কবির সকল ইন্দ্রিয়; ফলশ্রুতি, একটি বর্ণনার মধ্যেই সঞ্চারিত একাধিক ইন্দ্রিয়ের রসাস্বাদ—যা দৃশ্য তা হয়ে উঠেছে স্পৃশ্য, যা শ্রাব্য তা হয়েছে ঘ্রাণময়। যেমন, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে—

> "বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
> নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে",

অথবা 'বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ' বা 'পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গজগৎ বাংলা কবিতার ইতিহাসে অনন্যপূর্ব একথা আগেই বলেছি; ইন্দ্রিয়মগ্ন রূপানুভূতির নিবিড় অভিনিবেশই এনেছে সেই অনন্যতা, যা বাংলাসাহিত্যে অন্য কোনও কবির রচনায় আমরা পাইনা, যার একমাত্র প্রতিতুলনা পাওয়া যাবে কীট্‌সের কবিতায়; হয়তো কিছুটা কীট্‌স্ ও প্রি-র‍্যাফেলাইট প্রভাবিত অপরিণত ইয়েট্‌সীয় কল্পনায়। এই প্রাথমিক স্ফুটনে জীবনানন্দের প্রকৃতি-দৃষ্টিতে আসেনি এমন কোনও ব্যঞ্জনা যা অলৌকিক। নিসর্গের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপই তাঁকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আকৃষ্ট করেছে; পৃথিবীর নদী মাঠ বন ('জীবন'/২), 'ঘাস রোদ মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ' ('মৃত্যুর আগে') এইসব ধ্বনিগন্ধবর্ণময় প্রকৃতির জগৎ সংক্ষুব্ধ করেছে তার কল্পনা এবং ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির প্রবলতা সৃষ্টি করেছে প্রায়স্পৃশ্য নিটোলতায় অজস্র দৃশ্যরূপ। হয়তো তার সবকটির ওপর পড়েছে

এক ধূসর ছায়া—যে ছায়া মৃত্যুর, রূপের আসন্ন মরণশীলতার। এ সবকিছুই তাঁর কাব্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে বিষণ্ণ আবেগঃ 'সব রাঙা কামনার শিয়রে উঁকি দিয়ে গেছে বারবার ধূসর মৃত্যুর মুখ।' তবে কোনও লোকোত্তর দ্যোতনায় অভিষিক্ত হয়নি কবির প্রকৃতিচেতনা এ কালের কাব্যে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এক পিপাসার গান—সে পিপাসা সৌন্দর্যের, যে সৌন্দর্য অপরূপ অথচ মরণাহত, অনির্বচনীয় তবু নশ্বর। এই সৌন্দর্যের জগতে কবি পাঠককে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন, পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিয়েছেন নিসর্গের মরণশীল রূপের নশ্বরতার বেদনা। প্রকৃতির জগৎকে আশ্রয় করেই এই রূপাবিষ্টতা ও বেদনার উৎসার। কিন্তু, কবিচেতনায় প্রকৃতি এই প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতাবলীতে তার ঐহিক পরিধিকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় কোনও দ্যোতনা নিয়ে আসেনি, হয়ে ওঠেনি কোনও প্রশান্তি ও স্থিরতার আশ্রয়, যেমনটি হয়েছে পরবর্তীকালে 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে। প্রথম পর্যায় পর্যন্ত বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যনির্দিষ্ট প্রকৃতিবীক্ষার ভূমিতেই জীবনানন্দ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কিছুটা দীর্ঘায়িত এই আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে 'ধূসর-পাণ্ডুলিপির' প্রায় সব কবিতাতেই গোধূলি, বৈকাল, ধূসরতা, রাত্রির অন্ধকারের অজস্র উল্লেখে জীবনানন্দের প্রকৃতি বর্ণনায় নৈশতার আধিপত্য দেখি। তাঁর প্রকৃতিভুবনে 'শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন / অঘ্রাণ খুলেছে তারে, ; সেখানে সব কিছুর ওপর লেগেছে 'বিকালবেলার ধূসরতা'। আর এই শীতাবহ বিষণ্ণ নিসর্গের জগতে এসে পড়ে যেটুকু আলো তার উৎস খররৌদ্র কি তীব্রসূর্য নয়, কখনো 'কার্তিকের নরম রোদ', 'গোধূলির রক্তিম আকাশ, 'আলেয়ার বাষ্প' আর জ্যোৎস্নার বিস্ময়।' জীবনানন্দ নিজেই জানিয়েছেন, কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করার চেষ্টায় রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করার প্রয়াস, যাকে হয়তো কবি-জগৎ বলা যেতে পারে। আর, তাই একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক

কেন এই প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতাবলীতে কবিকল্পনার আশ্রয় হয়ে উঠলো এক নিরালোক বসন্তহীন, ম্লান ধূসর প্রকৃতিজগৎ। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে চোখ ফেরাতে হয় এ সব কবিতার জন্মকালের দিকে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সকল কবিতাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের বিপর্যয়ের ঘনিষ্ঠ, অন্ততঃ রচনাকালের দিক থেকে।[১৪] আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এসব কবিতার জগৎ রূঢ় বাস্তব নয়, কাব্যের বিষয় প্রাত্যহিক পৃথিবীর সমস্যা সঙ্ঘর্ষ নয় ঃ

উৎসবের কথা আমি কহি নাক'

পড়িনাক' দুর্দশার গান—

'কয়েকটি লাইন' কবিতায় এ উক্তি কবি নিজেই করেছেন। কিন্তু স্বসৃষ্ট কবিজগতের ভিতর বাস্তব বাস্তবই থাকে না, বাস্তবকে ফলিয়ে দেখা হয়। এবং তাই যদি হয়, বিশ্বযুদ্ধের সদ্যসমাপ্ত অধ্যায়ের কোনও উত্তরসূরী অনুভব এ কাব্যে পরোক্ষ প্রতিফলনে আশ্বস্ত হয়েছে কিনা বুঝে নেওয়া দরকার। অগ্রজ গ্রন্থ 'ঝরাপালক' যতই তুচ্ছ এবং বিস্মরণীয় মনে হোকনা কবির কাছে, এ প্রসঙ্গে তারও কিছু গুরুত্ব থেকে যায়। কারণ, ১৯২৮-এ প্রকাশিত 'ঝরাপালকে'র কবিতাগুলির রচনাকাল যুদ্ধ বা তার অব্যবহিত পরে হওয়াই সম্ভব। আরো দেখি, কাব্যে জাগ্রত-জগৎকে কবি অপরূপ মধুর সানন্দ দেখেন নি ; বরং প্রচলিত চিন্তা আর শৈলীর আড়াল থেকে তিনি দেখেছেন 'ব্যাধবিদ্ধ ধরণীর রুধির লিপিকা', 'ছিন্নবাস নগ্নশির ভিক্ষুদল' 'নিষ্করুণ এই রাজপথ', এবং সেখানে যখন তিনি বলে ওঠেন,

'মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা

হেমন্তের বিদায়কুহেলি'—

তখন নিঃসন্দেহ হওয়া যায় এক লাঞ্ছিত, ব্যাহত বাস্তবের জ্বালা থেকে কবি মুক্তি খুঁজছেন নিসর্গজগতে। সে সন্ধান আশ্বস্ত হয়েছে

১৪। 'এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সনেব মধ্যে রচিত হয়েছে।' জীবনানন্দ দাশ ঃ আদি সংস্করণ ধূসর পাণ্ডুলিপিব ভূমিকা।

প্রসঙ্গের উল্লেখে এ পর্যায়ের আলোচনা শেষ টানতে চাই। জীবনানন্দ লিখেছেন,

আমাদের হৃদয়ের ব্যথা
দূরের ধূলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে—ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয়।

এই উচ্চারণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের অন্তিমে আবৃত্ত; এখানে স্বপ্নকে ধ্যানের সমার্থক করে কবি তাকে গভীর মর্যাদা দিয়েছেন দেখি। ধ্যানেরই মত স্বপ্ন হৃদয়কে প্রশান্তির এক অসামান্য অর্জনে পৌঁছে দেয়, এ কথাই হয়তো তিনি বলতে চান। এই স্বপ্নাশ্বস্তিকে কবি এক মহিম মানসিক অর্জনের অনুরূপ মূল্যে গ্রহণ করেছেন। 'স্বপ্নের হাতে' কবিতাটিতে তিনি আরও বলেছেন, কবিমানসে বাস্তবের প্রত্যাঘাতে এই যে স্বপ্নজগত নির্মিত হয়, তা অমরতায় অভিষিক্ত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতার পর কবিতায় যে সৌন্দর্যের মরণশীলতার উপলব্ধিজাত বেদনার বিস্তার, তাকে অতিক্রম করে গ্রন্থের এই শেষতম কবিতায় কবি স্বপ্নকে দেখেছেন মৃত্যু-আহত পৃথিবীর বিপরীতে অনশ্বরতার আলোকে ঃ

পৃথিবীর পুরোনো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার,—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়।

আবার, এই শেষতম কবিতাটিতেই স্বপ্নকে ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত করে জীবনানন্দ তাকে দিয়েছেন এমন এক প্রশান্তির তাৎপর্য যা পরবর্তী পর্যায়ে 'বনলতাসেন' গ্রন্থে অভিব্যক্ত প্রকৃতিচেতনার নবীনতম তাৎপর্যের দিক, প্রকৃতির প্রশান্তি-মূল্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এই কাব্যভাষণটিকে।

'রূপসীবাংলা'র কবিতাগুলিকে জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির প্রাথমিক

পর্যায়ের অঙ্গীভূত বলে মনে করা হয়, প্রধানত আন্তর-প্রমাণের নিরীখেই ; তদুপরি রয়েছে কবি ভ্রাতা শ্রীঅশোকানন্দ দাশের সাক্ষ্য : 'এ সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল'। এ সব কবিতায় জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার নতুন কোনও উদ্ভাসন তাই তেমন প্রত্যাশিত নয়। উপলব্ধি এখানেও আগেরই মতো প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়াসক্ত ; সেই একই ম্লানাভামণ্ডিত ধূসর ও কোমল নৈসর্গিক পরিমণ্ডলে কবিচেতনা নির্জন মন্থর পাদচারণায় আগেরই মতো ব্যাপৃত। অশোকানন্দের ভূমিকাতে আমরা আরও পাই এ সব কবিতা 'গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ-প্রসূতি-নির্ভর'। 'রূপসী-বাংলা'র কবিতাবলী জীবনানন্দের নিসর্গবীক্ষায় ও তার কাব্যায়ণে যা কিছু নবীনতার স্বাদ এনেছে তা উদ্ভূত হয়েছে বাংলার একান্ত নিজস্ব পল্লীআবহের বিষাদমধুর অপরূপতা থেকেই। গ্রাম-বাংলার নিসর্গচিত্রই 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলীতে সঞ্চারিত করেছে এমন এক ঘনিষ্ঠ দেশজ আবেগ যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে অনুচ্চারিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহাবিষ্ট এবং অনুপুঙ্খ অবলোকন তাঁর কাব্যে আমরা আগেও পেয়েছি, পেয়েছি সে সৌন্দর্যের আসক্ত আস্বাদনের সব উত্তাপ। 'রূপসী বাংলা'র সার্বিক-বোধে এক শরীরী'[১৭] এই সনেটগুচ্ছে জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার যে নতুন বিশিষ্টতাটুকু দেখি তার অনেকটাই এসেছে এর প্রকৃতি-লোকের দেশজ স্থানগত মাহাত্ম্য থেকে ; তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলার অতীত গরিমার এক চারণিক সঙ্গীত যার অনেকটাই অনতিদূর ইতিহাসের কোনও লুপ্ত অধ্যায়ের শৌর্য ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত আবার অনেকটাই লোকায়ত, উপকথাভিত্তিক কাহিনীবৃত্ত থেকে আহরণ করেছে তার বিষণ্ণতা ও সৌন্দর্য। নিসর্গের যে অপরূপত মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত জেনেই কবির চেতনা বিষণ্ণতার বোধে ভারাক্রান্ত হতে দেখেছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জগতে তারই সঙ্গে ইতিহাসের চে

১৭। অশোকানন্দ দাশ : 'রূপসী বাংলা'র ভূমিকা।

লুপ্ত অধ্যায়ের গরিমা ও কীর্তির নশ্বরতার বিষণ্ণ-উপলব্ধির সংযুক্তি জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টিতে একটি নূতনতর চরিত্রলক্ষণ নিয়ে এসেছে, যা তাঁর আগামী রচনায় আরও বড়ো আয়তনে ও তাৎপর্যে অর্থময় হয়ে উঠেছে। নিসর্গের রূপাবিষ্ট ইন্দ্রিয়াসক্ত অনুপুঙ্খ অবলোকনের ভিত্তিভূমি থেকে স্বপ্নপ্রয়াণের যে আকাঙ্ক্ষাতীব্রতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'কে দিয়েছে অনন্য স্বকীয়তা, 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলীতেও সে বিশিষ্টতা প্রবলভাবে উপস্থিত। কিন্তু, তার সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছে নবোৎসারিত ইতিহাসবোধ যা একালে স্পষ্টভাবেই রোমান্টিক দূরমনস্কতা এবং অতীতচারিতার লক্ষণাক্রান্ত। তবু, নিসর্গচেতনায় ইতিহাসবোধের এই অনুপ্রবেশ ও সঞ্চার জীবনানন্দের পরিণত কাব্যসৃষ্টির একটি বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণের পূর্বসূচনা করছে 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছে।

স্বপ্ন ও জীবনের অনতিক্রম্য ব্যবধান যা মৃত্যুও বিনাশ করতে অপারক, তার এক বিষাদ-সুন্দর অনুভূতির মধ্য হতেই উত্থিত হয়েছে 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দ্দশপদী সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা :—

> সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।
> আমি চলে যাব বলে
> চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
> নরম গন্ধের ঢেউয়ে ?

এই মুখবন্ধী চরণগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখি, কবির চেতনায় 'সোনার-স্বপ্নের সাধ'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে নিসর্গলোক যা 'চালতাফুলের' দেশজ উল্লেখে চিহ্নিত করেছেন গ্রামবাংলার প্রতিবেশ ; আর কবির নিসর্গানুভূতির প্রবল ইন্দ্রিয়মগ্নতার প্রকাশ ঘটেছে 'নরম গন্ধের ঢেউয়ে' গন্ধকে একইসঙ্গে আঘ্রাণের অতিরিক্ত এক স্পৃশ্য (নরম) ও দৃশ্য (ঢেউ) ব্যঞ্জনা দিয়ে। এই 'রূপসী বাংলা'র সনেট-পরম্পরা আমাদের পৌঁছে দেয় এক মায়ালোকে—রূপকথার জগতে, 'যেন কোন কাহিনীর দেশে', যেমন জীবনানন্দ নিজেই বলেছেন। তখন বুদ্ধদেবের সেই মন্তব্য : 'প্রকৃতির নির্জন ও ধূসর রূপের মধ্যে

জীবনানন্দে তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন।'। যথার্থ মনে হয় ভিন্ন একটি গ্রন্থ-প্রসঙ্গে। এই রূপকথালোক তবু রচিত হয়েছে নিসর্গের প্রচ্ছায়ে, যে নিসর্গ গ্রাম বাংলার আঘ্রাণ নিয়ে কথা কয়ে উঠেছে কবিতার পর কবিতায়: 'এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপকে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে/ বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে: /ছড়ানো রয়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন অঘ্রাণে।' । গ্রামবাংলার প্রকৃতির এই নির্জন প্রচ্ছন্নরূপের মধ্যে জীবনানন্দ আবিষ্কার করেছেন তাঁর নিসর্গনিবিড় রূপকথাভূমির রাজকন্যাকে:

> কোনো এক রাজকন্যা—পরনে ঘাসের শাড়ি—কালোচুল ধান
> বাংলার শালিধান—আঙিনায় ইহাদের করেছে বরণ,
> হৃদয়ে জলের গন্ধ কন্যার—ঘুম নাই, নাইকো মরণ—
> তার কোনোদিন—পালংকে সে শোয় নাকো, হয় নাকো ম্লান,
> লক্ষ্মীপেঁচা শ্যামা আর শালিখের গানে তার জাগিতেছে প্রাণ—
> সারাদিন—সারারাত বুকে করে আছে তারে শুপুরির বন,

এখানে বাংলার নিসর্গলোকের প্রাণসত্তাটিই যে কবির স্বপ্নজগতের শ্রেয়সী তাতে আর সন্দেহ থাকে না। প্রকৃতির সৌন্দর্যের যে তাৎক্ষণিক উদ্ভাসন প্রায় একই সঙ্গেই আমাদের কবির মনে নিয়ে এসেছে তার মরণশীলতার বিষণ্ন উপলব্ধি, একালের সকল কবিতায় তারই পাশাপাশি আর একটি সুর বেজে উঠেছে 'রূপসী-বাংলা'য়, তা হল নিসর্গের এই ইতিবৃত্তধারাচারী অমরতার দিকটি।। যে সৌন্দর্য আজ কবিচিত্তকে মথিত করেছে আনন্দ বেদনাঘন আস্বাদনে, সেই রূপই একদা উদ্বেলিত করেছিল চাঁদ শ্রীমন্তর মতো ইতিবৃত্তের নায়কদের কি রায়গুণাকর রামপ্রসাদের মত অনতিদূর, ইতিহাসের কবি-পুরুষদের :—

> মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ কল্পনার কাছে
> এমনই হিজল-বট-তমালের নীলছায়া বাংলার অপরূপ
> রূপ দেখেছিল।

অথবা

শ্রীমন্তও দেখেছে এমন :

যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক,
সুদূর প্রবাস থেকে ফিরে এসে বাংলার গুপুরির বন
দেখিয়াছে—অকস্মাৎ গাঢ় নীল, করুণ কাকের ক্লান্ত ডাক
শুনিয়াছে—সে কত শতাব্দী আগে ডেকেছিল তাহারা যখন।

এভাবেই দেখা যাবে, প্রকৃতিচেতনার বিকাশের ধারায় 'রূপসী বাংলা' অনতিস্ফুট করেছে কতকগুলি নূতন কুললক্ষণ—নিসর্গসৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়মগ্ন উপলব্ধি ও তার নশ্বরতার বিষণ্ণ বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির রূপের মৃত্যুহীন আবেদনের সত্যটি; নিসর্গলোকের প্রচ্ছায়ার সঙ্গে ইতিবৃত্তের আবহ জড়িত হয়ে শৌর্য ও সৌন্দর্যের এক অপ্রাপনীয় মায়ালোক রচনা করেছে যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে কবির চেতনার উদবর্তন এবং স্ফূর্তি :

রূপ যেই স্বপ্ন আনে—স্বপ্নে যেই—রক্তাক্ততা আছে,
শিখেছিল সেইসব একদিন বাংলার চন্দ্রমালা রূপসীর কাছে
তারপর যেত বনে, জোনাকি ঝিঁঝির পথে হিজল আমের অন্ধকারে
ঘুরেছে সে সৌন্দর্যের নীলস্বপ্ন বুকে করে,—

('একদিন এই দেহ ঘাস থেকে')

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মত এ কাব্যেও বাস্তবের বিরুদ্ধতার বিপরীতে রাখা হয়েছে স্বপ্নজগৎকে; তবে সে জগৎ আশ্রিত হয়েছে দেশ-কালের চিহ্নিত ভূগোলে, ইতিবৃত্তময় এক নিসর্গলোকে :

ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল,
—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনাতে
ঢেকে আছে, দেখিয়াছি বাসমতী, কাশবন,
আকাঙ্খার রক্তঅপরাধ
মুছায়ে দিতেছে যেন বারবার

জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার বিকাশের ধারায় 'ঝরাপালক,' 'ধূসর

পাণ্ডুলিপি'ও 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলী চিহ্নিত করেছে আদিপর্বায়। পরবর্তী গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'বনলতাসেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'। 'বনলতাসেন' নানা বিচারেই বাঙলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র দিকচিহ্ন হয়ে আছে। তাঁর প্রকৃতিভাবনার উদবর্তনেও এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত। পাঠক এই গ্রন্থেই পায় তার কাব্যসৃষ্টির এক পরিণত মননঋদ্ধ অথচ আবেগস্পন্দিত প্রকাশ যা একটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে আলোচিত হওয়ার দাবী রাখে। উত্তরপর্বায়ে 'মহাপৃথিবী' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত কবিচেতনা সমাজ ও সময়ের আলোড়নে এমনই অভিভূত যে প্রকৃতির প্রশান্তিলোক থেকে বহুদূরে বিচ্যুত এক অন্বেষা-অস্থির নাবিকের মতো দিশাহীনতার অন্ধকারে নিজেকে আবিষ্কার করেন কবি। আবার, একেবারে শেষের দিকের কিছু রচনায়, প্রকৃতির অপরাজেয় প্রশান্তির জগতে প্রত্যাবর্তিত হয়ে তিনি এক হরিৎ 'আলোপৃথিবী'র সঙ্কল্পনায় বাঙ্ময় হতে চান।

'বনলতাসেন'-এর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে যে বিষয়টি সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে তা হল তাঁর এ সময়কার কাব্যে প্রকৃতিলীনতার প্রবল আসক্তি। তাঁর আদিপর্বায়ের কবিতাবলীতেও নিসর্গসৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়াসক্ত অনুভব কবির চেতনায় এনেছিলো স্বপ্নাচ্ছন্ন মদিরতা; প্রকৃতির আকর্ষণ তখনও ছিল তাঁর কাছে অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত অনুভূতির প্রাবল্যে রচিত হয়ে উঠেছে 'স্বপ্নের এক কবিজগৎ' যাকে জীবনানন্দ রেখেছেন বাস্তবের বিপরীতে, 'ব্যাধবিদ্ধ ধরণীর রুধির লিপিকা থেকে দূরস্থ এক ধূসর-স্বপ্নের দেশে' 'হৃদয়ের আকাঙ্খার নদী' যেখানে ঢেউ তুলে 'তৃপ্ত' হয়। আদিপর্বায়ে স্বপ্ন আর বাস্তব দুই বিপরীত বিন্দু, দুই ভিন্ন ভুবন; কবির স্বপ্নপ্রয়াণের ব্যাকুল আগ্রহ তাই বারেবারেই ব্যাহত বাস্তবের প্রত্যাঘাতে: 'দেহের ছায়ার মত আমার মনের সাথে মেশে কোন স্বপ্ন—এ আকাশ ছেড়ে দিয়ে কোন্ আকাশেরে খুঁজে ফিরি।' এ জাতীয় পঙক্তির মধ্য দিয়ে আভাসিত

যে স্বপ্নাশ্রিত নিসর্গভুবন তার ধ্যান বা কল্পনা বারবার ভেঙে যায়, কেননা 'পিছে ছুটে আসিতেছে বৈকালসকাল পৃথিবীর,' 'যেন কোন মায়াবীর নষ্ট ইন্দ্রজাল কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে।' তাই একথা বললে ভুল হয়না, নিসর্গের অপরূপ বিষণ্ণ মাধুরী দিয়ে ঘেরা যে জগতে কবিচেতনা 'সুস্থিরতা লাভ করার চেষ্টায়' আশ্রয় খুঁজেছিলো সে জগতে প্রয়াণের ব্যথা ও বাধা অনুচ্চারিত ছিলো না 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে। 'বনলতাসেন'-এ প্রকৃতি কিন্তু আর কোন দূরস্থ আশ্রয়ী-জগৎ নয়, কোনও কাম্য অগম্য স্বপ্নের ভুবন নয়—কবির চেতনায় আরও নিকটবর্তী, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপানুভূতির অধিগত নয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার এমন এক জগৎ যেখানে কবিচিত্ত আশ্রয় পায়, দীর্ঘ অন্বেষার পর, এক সচেতন আত্ম-অবলোপী নিমজ্জনে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে প্রকৃতি তাঁর কাব্যে পটভূমি কি পরিপ্রেক্ষিত; কখনও বা তা হয়ে উঠেছে স্বপ্নরূপময় এক নৈসর্গিক কল্পজগৎ। সে পর্যায়ে কবির ভূমিকা ছিলো প্রধানত এক ঘনিষ্ঠ দর্শকের মুগ্ধ অবলোকনের, কখনও বাস্তবতাড়িত এক প্রয়াণপ্রয়াসীর। 'বনলতাসেন' যুগে জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতি আরও বড়, আরও গভীর চেতনার আয়তনে নব-মূল্যায়িত। নিসর্গ এ কালের কাব্যে মানব অস্তিত্বের মূলাধার, প্রকৃতিলীন এক সত্তার নবায়মানতায় উদ্ভাসিত। এই প্রসঙ্গে দুটি কবিতা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে :—'আমি যদি হতাম' ও 'ঘাস'। নিসর্গআশ্রিত যে কবিজগৎ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর 'রূপসী-বাংলা'য় স্মৃতি দিয়ে ঘেরা তার সঙ্গে বাস্তব-পৃথিবীর ব্যবধানের অনতিক্রম্যতা বারেবারেই কবির স্বপ্নপ্রয়াণকে বিঘ্নিত করেছে[১৮]। সেই নিসর্গজগৎই যেন এ পর্যায়ের জীবনানন্দকে উত্তীর্ণ করেছে এক নূতন জায়মান চেতনায় : নিসর্গের জীবনের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিতে পারলেই মানুষ পেতে পারে ব্যাহত

১৮। 'স্বপ্নের হাতে' কবিতাটি উল্লেখ্য।

বাস্তবের জ্বালা ও হতাশা থেকে মুক্তি, প্রকৃতির সেই অবোধবিদ্ধ নির্লিপ্তির শান্তি। 'রূপসী বাংলায়' তিনি অনুভব করেছিলেন :

আমাদের রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু, নিয়ে পৃথিবীর পথে আমরা ঢের আঁচড়, ঢের প্রশ্ন রেখে যেতে পারি শুধু, আর 'ঐ মরালীরা, কাশ ধান রোদ ঘাস' মানুষের 'সেই ক্লান্ত বেদনাকে' ঢেকে দেয় তাদের সহজ স্বচ্ছল প্রাণপ্রবাহের অবিনাশী উচ্ছ্বাসে'। ('মানুষের ব্যথা আমি'।)

'বনলতাসেনে'র আদি সংস্করণের বারোটি কবিতার মধ্যে দুটিতেই তিনি চাইছেন প্রকৃতিলীন এক অস্তিত্ব—তার জৈব প্রাণময়তার মধ্যে আত্ম-অবলোপী আত্তীকরণ। যে ঘাসের অবিরল প্রকাশের কথা তিনি 'রূপসী-বাংলা'য় শুনিয়েছেন, যে মরালীদের স্বচ্ছন্দ বিচরণে তিনি দেখেছিলেন প্রশ্ন-চিহ্নলীন এক প্রাণোচ্ছলতা, তারাই আবার প্রত্যাবর্তিত হয়েছে 'বনলতাসেনে' প্রতীকী দ্যোতনায়, তার চেতনার জগতে প্রকৃতিভাবনার এই নবপ্রসৃতিকে অভিব্যক্ত করে। 'আমি যদি হতাম' কবিতাটিতে দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে ঝাউয়ের শাখা, নিম্নভূমির জলের গন্ধ, শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড় রচনা করেছে এক নৈসর্গিক অস্তিত্বের প্রায় রূপকথাগন্ধী আবহ, যেখানে 'রক্তের স্পন্দন' অনুভব করে হংসমিথুন। সে জীবনেও আছে মৃত্যু—গুলির শব্দ এসে ভেঙে দেয় রতিবিহারের রম্যতা। পাখায় পিস্‌টনের উল্লাসে নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে বুনোহাঁস পাড়ি দিতে চায় উত্তরে, শিকারীর গুলির আঘাতে এসে পড়ে প্রাণোচ্ছল জীবনে একটি ছেদ —'আমাদের স্তব্ধতা, আমাদের শান্তি'। তবু, কবি চান এই জৈব নৈসর্গিক জীবনের পূর্ণ স্বচ্ছলতা ও শান্তি, ব্যর্থ পরাহত মানবিক অস্তিত্বের অবলোপ : কেননা 'আমি যদি বনহংস হতাম বনহংসী হতে যদি তুমি', 'তাহ'লে থাকত না' আজকের জীবনের টুকরো টুকরো মৃত্যু, 'টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার।' 'ঘাস' কবিতাটিতেও এই আত্মবিলোপী নৈসর্গিক নিমজ্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত। যখন

লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভরে গিয়েছে ভোরের বেলা, তখন সমস্ত কবিচেতনা অনুরণিত হয়ে উঠেছে এই প্রাকৃতিক প্রাণপ্রবাহের অবিনাশী প্লাবনে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে : 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাসমাতরে শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে'। প্রাকৃতিক জীবনের সপ্রাণতা, জৈব নির্লিপ্তি ও নিশ্চিন্ত শান্তির মধ্যে আত্ম-অবলোপের এই সচেতন আগ্রহ 'বনলতাসেন' গ্রন্থে জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনায় শুধু নবীন স্বাদ আনেনি, তার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে সচেতন মননবদ্ধ এক নিসর্গ অনুধ্যান। নিসর্গরূপের ইন্দ্রিয়-সংরাগী আস্বাদন বা তাকে ঘিরে অপ্রাপনীয় কোনো স্বপ্নজগৎ রচনা বা সে জগতে প্রয়াণের তীব্র ব্যাহত আকাঙ্ক্ষাই শুধু নয় ; কবি অনুভব করেছেন প্রকৃতির জীবনের সঙ্গে সাঙ্গীকরণের এক প্রয়োজন। কোন দূরবিহারী নিসর্গরূপধ্যান নয়, প্রকৃতির প্রবল প্রাণস্বচ্ছলতার সঙ্গে অস্তিত্বের চূড়ান্ত সংযোগই যেন মানবকে দিতে পারে তার প্রার্থনীয় প্রশান্তির আশ্রয়। 'পূর্বপর্যায়ের কবিতাবলীতে ছিলো প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়াসক্ত কল্পনার অবিরল অজস্রতা ; দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ ও ঘ্রাণের এক অপরূপ নিসর্গভুবন বাঙময় হয়ে উঠেছে তার মায়াবী সংশ্লেষে। ইন্দ্রিয়মগ্ন অনুভবের অনবদ্যতা 'বনলতাসেন' গ্রন্থটিতেও অনুপস্থিত নয় ; তবে তার উচ্ছ্বাস যথেষ্ট সংবরিত হয়েছে কবির মননশীল উপলব্ধির গুণে। 'নরম সবুজ আলো' বা 'সুস্বাদ অন্ধকার'-এর মত প্রয়োগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় পূর্বসূরী ইন্দ্রিয়াবিষ্টতার উত্তরাধিকার। তবে এখানে দৃষ্টির বিষয়ীভূত 'আলোক'ও কবির চেতনায় স্পর্শসংবেদনাময় হয়ে উঠেছে ; 'অন্ধকার'-এর মত বিমূর্ত ভাবনাও আস্বাদ্য হয়েছে সেই মানসিকতার ইন্দ্রিয়সংরাগী উচ্চারণে। একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংমিশ্রণী প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে বর্ণনা ও চিত্রকল্পের যে অনুপমতা জীবনানন্দের নিসর্গদৃষ্টিতে সঞ্চারিত করেছিলো অনন্যতা, তা 'বনলতাসেনে' উপস্থিত থেকেও উচ্ছল হয়ে উঠেনি অবারিত উৎসাহে, বরং যথার্থ শিল্পীর

মনোযোগ ও সংযমে কবি সে বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেছেন মননধর্মি নিসর্গ-চিন্তার অনুকূলে। এ কাব্যগ্রন্থের নামকবিতাটি নানাকারণেই বিশ্রুতখ্যাতি। কোনো সার্থক কবিতার অবয়বে প্রচ্ছন্ন থাকে অর্থের যে হীরকহ্যুতি তা 'শতবার ঘুরি, বিচ্ছুরিত' করে দেয় শত আলোকের ছুরি'। সে দিক থেকে দেখলে, 'বনলতাসেন' সংবেদনশীল পাঠকের কাছে বারেবারেই বহন করে আনবে নব নব অর্থের সম্ভারে ঢের নবীন উদ্ভাসন। আমাদের কাছেও, প্রকৃতিচেতনার বিবর্তনের ইতিহাসে, 'বনলতাসেন' কবিতাটি সার্থকনামা হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের সমকালীন কাব্যপ্রবাহে প্রকৃতিলীন এক সত্তার সম্পূর্ণ নবীন ও বিশিষ্ট ধারণাটির উদ্ভাসে সমৃদ্ধ হয়ে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত প্রতিটি গ্রন্থই কবির প্রখর অভিভাবকতায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির ভাষা ও ভাষণে এমন এক প্রতীকী তাৎপর্য প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত যা তাঁর কাব্যের অর্থ অনুধাবনে সহায়ক হয়ে ওঠে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি প্রকৃতির যে পাঠ নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর পাণ্ডুলিপি তা 'ধূসর': সে এক ম্লান হিম নিসর্গজগৎ আর তার ব্যাপ্ত হৈমন্তিক বিষাদের বাঙময় বিস্ময়। এখানে নামকরণ তার আক্ষরিক অর্থ (যা গ্রন্থ-ভূমিকায় উল্লেখিত) অতিক্রম করে এক প্রতীকী দ্যোতনা বহন করছে। সেই ইন্দ্রিয়নির্ভর নিসর্গানুভূতিই পরবর্তী পর্যায়ে জীবনানন্দকে উত্তীর্ণ করেছে প্রশান্তি ও করুণার আশ্বাসবহ এক প্রকৃতিলোকের চেতনায়। 'বনলতাসেন' এই দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থ, যখন প্রকৃতিলীন অস্তিত্বের স্বচ্ছল শান্তির মধ্যে, জৈব প্রাণোচ্ছ্বাসের মধ্যে কবির চেতনা বাস্তবে যা ব্যাহত ও বিপর্যস্ত সেই মানব-অস্তিত্বের মুক্তির আশ্রয় খুঁজে পায়। 'বনলতা'—এই নামটিই যথেষ্ট ইঙ্গিতময়: এ যেন এক প্রকৃতি (নিসর্গ) ভাবসাযুজ্য পায় আর এক প্রকৃতি (নারী)-র মধ্যে। জীবনানন্দের কাব্যে প্রতীকী-ব্যঞ্জনার নবপ্রসূতির তথ্যটি স্মরণে রেখেই 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি'-উত্তর কবিতাগুলি পড়া উচিত।

কবির একালের রচনায় প্রেম 'প্রকৃতির শোভা ভূমিকায়' উপস্থিত যেমন, তেমনই নারী এসেছেন বারবার নানা মূল্যবোধের আধারিকা-রূপে। 'বনলতা', 'শ্যামলী', 'সুরঞ্জনা', 'সুচেতনা'-এসব কবিতার বাহিরের আয়োজনে যেন কোনও নারী উপস্থিত বলে মনে হলেও নিবিষ্ট অনুধাবনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের কোনও না কোনও মূল্যবোধ অথবা শাশ্বত মানবঅভীপ্সারই ভাবরূপ যেন তাঁরা।

বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় প্রকৃতিভাবনার আলোকে 'বনলতাসেন' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। ষষ্ঠচারণিক তিনটি স্তবকে সম্পূর্ণ কবিতাটি ক্রমপর্যায়ে অন্বেষা, আবিষ্কার ও অনুধ্যানের একটি পরম্পরা রচনা করেছে এবং সার্থক শিল্পিত প্রতীকের অন্তরাল থেকে আভাসিত করছে শান্তি ও সৌন্দর্যের এক প্রকৃতিলোক। প্রথম স্তবকে একটি দীর্ঘ ক্লান্ত অন্বেষণের চিত্র—যে অন্বেষণের নায়ক ইতিহাসের বিস্তৃত সময়চিহ্নহীন প্রান্তরের পথিক ('হাজার বছর ধরে' 'বিম্বিসার অশোক' ও 'বিদর্ভনগরে'র উল্লেখ স্মরণীয়), যার অন্বিষ্ট সফেন জীবন সমুদ্রের মধ্যে এক 'শান্তির' আশ্রয়। কবির ব্যক্তিসত্তার অভীপ্সা এখানে বিশ্বজনীনতা লাভ করে প্রতীকের বিমূর্তায়ন ও সঙ্কেতের মধ্য দিয়েই। এ কবিতায় দীর্ঘ পাদচারণার উন্মোচনী চিত্রটি ইতিহাসে প্রোথিত থেকে মানবের সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় যাত্রা ও উত্তরণের জীবনসত্যটি ব্যক্ত করছেঃ কবি স্পষ্টতই নিজেকে 'ক্লান্ত প্রাণ' বলে অভিহিত করেছেন—সে ক্লান্তি তিনি যেন অনুভব করেন হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে কিম্বা সিংহলসমুদ্র থেকে মালয় সাগরে ব্যর্থ, পরাহত নাবিকীর পরিণামে। সেই ইতিহাসকাল থেকে মানবের এষণাতাড়িত এই ক্লান্তি শেষপর্যন্ত শান্তির আশ্বাস পেয়েছে 'বনলতাসেনে'র কাছে, প্রকৃতিপ্রতিম এক নারীর কাছে, যিনি বন-লতা।

ইতিহাসের পটভূমিতে এই দীর্ঘ ভৌগলিক বিচরণের পরে দ্বিতীয় স্তবকে আসে আবিষ্কারের বিস্ময় ও আনন্দ যা সঞ্চারিত হয়ে যায়

বনলতাসেনের মুখশ্রীর কারুকার্যময় স্থাপত্যরূপের বিস্ময়বোধে। 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলীতেই পাঠক লক্ষ্য করেছিলেন কিভাবে ইতিবৃত্ত তার শৌর্য ও সৌন্দর্যের গরিমাময় ঐতিহ্য নিয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে জীবনানন্দের নিসর্গচিত্রণে। নিসর্গ ও ইতিবৃত্তের সেই রূপকথাধর্মী সংশ্লেষ 'বনলতাসেন' কবিতাটিকে আরও বড়ো ও ব্যাপক ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য দিয়েছে; প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের অন্বেষাপ্রবণ চির-মানবপ্রাণের সংগ্রাম ও অভীপ্সার দ্বিস্তর ব্যঞ্জনা যথার্থ অভিব্যক্তি পেয়েছে একটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে আশ্রিত থেকে। যে মুহূর্তে কবি বলে ওঠেন, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি' সেই মুহূর্তেই ব্যক্তিঅস্তিত্বের পরিধি অতিক্রম করে তিনি একাত্মীকৃত হয়ে ওঠেন নবসভ্যতায় উত্তরণের যাত্রী মানবাত্মার সঙ্গে। তারপরেই পরাহত নাবিকের চিত্রকল্পটি 'সবুজ ঘাসের দেশ' ও 'দারুচিনি-দ্বীপে'র অনুষঙ্গে নিয়ে আসে প্রকৃতির অপরাজেয় ঐশ্বর্য ও প্রশান্তির অবিচল জগতের ইঙ্গিত; সেখানেই কবি আবিষ্কার করেন 'বনলতাসেন'-কে তাঁর নীড়ের আশ্বাসবহ চোখ তুলে প্রতীক্ষারত। কবিতার আবয়বিক পরিমণ্ডলে এই বনলতা নাটোরের। এখানে 'নাটোর' কোনও ভৌগলিক প্রামাণ্যের দায়িত্বে উপস্থিত নয়, যেমন 'সেন' পদবীটিও; একটি বিমূর্ত ভাবসত্তায় মানবিকতা আরোপের জন্য এইসব অনুপুঙ্খতা প্রয়োজনীয় ছিল। বনলতাসেন নাটোরের—হয়ত সে কবির প্রিয় পরিচিত নাটোরেরই, প্রিয় পরিচিত অথচ বিস্মৃত; কিন্তু নবীন আবিষ্কারে মহনীয় সত্তায় সে যেন উদ্ভাসিত। তেমনই প্রকৃতির সঙ্গে মানবের জীবনের গভীর যোগ থাকা সত্বেও মানুষ শান্তি ও সৌন্দর্যের ব্যর্থ সন্ধানে ঘুরেছে দীর্ঘ ইতিহাসবিকীর্ণ পথে পথে; শেষ পর্যন্ত দিশাহীনতার অন্ধকারে আকস্মিক সাক্ষাতে আবিষ্কার করেছে প্রকৃতির পরম প্রত্নআশ্রয়।

চূড়ান্ত স্তবকটিতে এই আকস্মিক আবিষ্কার একটি উজ্জ্বল অর্জনে রূপান্তরিত। নিসর্গের কিছু অপরূপ চিত্রের সন্নিবেশ রচনা করেছে

প্রার্থিত প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল। বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় ইন্দ্রিয়নির্ভর সৌন্দর্যানুভূতির স্বাক্ষর রয়েছে এই সব চিত্রকল্পের উপাদানে; 'শিশিরের শব্দ' কিম্বা 'রৌদ্রের গন্ধ' একাধিক ইন্দ্রিয়কে আমন্ত্রণ জানায় একই সঙ্গে সৌন্দর্যাস্বাদে। বিশেষ লক্ষণীয়, চিত্র-কল্পগুলি বহিরঙ্গের এই আয়োজন ছাড়াও তাদের ভাববস্তুর দিক থেকেও একটি প্রত্যাবর্তন ও প্রশান্তির আবহ রচনা করেছে: চিলের চংক্রমন শেষ হয়ে আসে, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের পটে জোনাকির অক্ষরে তখন লেখা হয় এক গল্প—যে কাহিনী চিরকালীন, তবু রূপকথারই মত চিরআবেদনময়ী। হাজার বছরের পরিক্রমার পর ইতিহাসের বিকীর্ণ ধূসর জগৎ থেকে কবি ফিরে আসেন অন্বেষায় ক্লান্ত নাবিকের মতন দ্বীপের আশ্রয়ে—সে দ্বীপ বনলতাসেন, নিসর্গের অপরাজেয় শান্তির আশ্রয়: 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতাসেন'। শেষচরণের এই 'অন্ধকার' শব্দটি আবার গূঢ়ার্থময়। প্রথম স্তবকে অন্বেষার দিশাহীনতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছিল 'নিশীথের অন্ধকারে'র চিত্রটি; দ্বিতীয় স্তবকে, 'তেমনই দেখেছি তারে অন্ধকারে'—ব্যর্থ সন্ধানের অন্ধকারময় নিশীথ-যাত্রার পটভূমিতে এক আকস্মিক সাক্ষাতের বিস্ময় বহন করে তাৎপর্যবহ করছে নবীন আবিষ্কারের সংকেত—এ 'অন্ধকার' সবুজ ঘাসের দেশ আর দারুচিনি দ্বীপের নিসর্গভূগোলের আবহে ঘনবনানীর নিবিড় শান্তির কথা বলে। তৃতীয় স্তবকে কিন্তু সকল চিত্রকল্পের আয়োজনে রয়েছে এক অনির্বচনীয় দিব্য প্রশান্তি, স্থিরতা ও কোমলতার আভাস, যখন'অন্ধকার' হয়ে ওঠে এক পরম প্রাপ্তি, অভীপ্সিত অমৃতলক্ষ্য। মনে পড়ে যায়, জীবনানন্দর 'অন্ধকার' কবিতার সেই অবিস্মরণীয় চরণ: 'গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর। 'নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দ' নিয়ে আসে ইন্দ্রিয়মগ্ন চেতনার ইঙ্গিত; সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত চৈতন্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কবি পেয়েছেন 'গভীর অন্ধকারের ঘুম' আর পরবর্তী চরণগুলি অনিবার্যভাবেই

জানিয়ে দেয় সেই ঘুম প্রকৃতিরই কোলে, নিসর্গপৃথিবীর আশ্রয়ে 'ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে'। তাই, 'বনলতাসেন' কবিতাটির শেষ স্তবকের এই 'অন্ধকার' শব্দটি অর্থের নতুনতর দিগন্ত উন্মোচিত করে। 'আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত এই অন্ধকার', যার নিবিড় অমাতিমির হতে উদ্ভাসিত হয় 'যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে' তার মুখশ্রী। প্রকৃতি-পৃথিবীর অপরাহত প্রশান্তির আশ্রয় চিরকালই মানবাত্মার অপেক্ষায় রয়েছে : হাল ভেঙে দিশা হারিয়েছে যে নাবিক শেষপর্যন্ত 'সৈকতের সত্যের'• মত প্রকৃতির সবুজ ঘাসের দেশেই পেয়েছে তার অভীপ্সার নীড়।

এ ভাবেই 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থটি জীবনানন্দের ক্রমপরিণতি-শীল প্রকৃতিচেতনার উদবর্তনে সংযুক্ত করেছে এক মননঋদ্ধ অনুধ্যান যা প্রতীকে প্রোথিত বলেই গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী। ইন্দ্রিয়াসক্ত চৈতন্যের নিসর্গানুভূতির মদিরাচ্ছন্নতাকে অতিক্রম করে জীবনানন্দের মানসভূমি এই পর্যায়ের কাব্যে বারবার এক মননঋদ্ধ আবেগময়তায় স্পন্দিত। শুধুমাত্র স্বপ্ন ও স্মৃতির অনুষঙ্গবাহী হয়ে নিসর্গ এখন আর তাঁর কাছে কোনও দূর ঐশ্বর্যময় কল্পলোক নয়, বরং তাঁর চেতনার সমীপবর্তী এমন এক জগৎ যার সঙ্গে একাত্মীকরণ সম্ভব বলেই মনে হয়েছে কবির কাছে।

সিগনেট সংস্করণের পরিবর্ধিত 'বনলতাসেন' আদিসংস্করণের বারোটি ছাড়াও আরও ষোলটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়। আন্তর-ধর্মের ঘনিষ্ঠতার দিকে লক্ষ্য না রেখে জীবনানন্দের মত মননশীল শিল্পী নিশ্চয়ই এ সংযোজন অনুমোদন করেননি। এইসব সংযোজিত কবিতার অনেকগুলিতেই প্রেম ও প্রকৃতির প্রেক্ষিত নিয়ে অর্থের গূঢ় গভীরতা পেয়েছে। যেহেতু জীবনানন্দের কবিতায় প্রেমচেতনার বিবর্তন এ পর্যালোচনায় একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত হওয়ার দাবী রাখে, বর্তমান প্রসঙ্গে সে সব কবিতায় বিস্তৃত আলোচনায় বিরত থাকছি। তবু, উল্লেখ না করে পারা যায় না, সুররিয়ালিস্ট

মণ্ডনকলায় সমৃদ্ধ তাঁর 'বুনোহাঁস' বা 'হরিণেরা' কবিতায় দু'টির কথা। মগ্নচৈতন্যের জলামাঠ ছেড়ে বাধাবন্ধহীন যে বুনোহাঁস উড়ে যায় রাত্রির কিনার দিয়ে ইঞ্জিনের মত শব্দে কোনো নক্ষত্রলোকের দিকে, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় কবির কল্পনার নির্বাধ উল্লাস: 'কল্পনার হাঁস সব' এই উল্লেখটিই পাঠকের হাতে তুলে দেয় অর্থরহস্যের চাবিকাঠি, পৃথিবীর সব ধ্বনি ও রঙ মুছে গেলে, অর্থাৎ বাস্তব বা ইন্দ্রিয়সংবেদী পৃথিবীর সব গোচর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে, অগ্রাহ্য করে এই সব 'কল্পনার হাঁস' তাদের অপার উল্লাসে উড়ে বেড়ায় 'হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার' ভিতর। এখানেও দেখি, কবির কল্পনা যা প্রেমাবেগস্পন্দিত (অরুণিমা সান্যালের মুখ) আশ্রয়ীভুবন হিসাবে গ্রহণ করেছে নিসর্গ-পৃথিবীর প্রত্নরূপ। 'হরিণেরা' কবিতাটিতেও ঠিক এমনইভাবে মুক্তির উল্লাসে ভরা এক অপরূপ নিসর্গলোক নির্মিত হয়েছে যেখানে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় পলাশের বনে রূপালি চাঁদের হাত থেকে মুক্তো ঝরে পড়ে শিশিরের পাতায় আর 'হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে'। তবে কবিতার প্রারম্ভেই কবি যখন পাঠকের হাতে তুলে দেন সংকেত, 'স্বপ্নের ভিতরে বুঝি' বলে, তখন সন্দেহ থাকে না তাঁর চেতনায় স্বপ্নের জগৎ আর ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার নিসর্গজগৎ অভেদাত্ম হয়ে গেছে কল্পনাপ্রতিভার সংশ্লেষী ধর্মে।

'বনলতাসেন' গ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতার ভাব-অবলম্বন যদি প্রেম হয়, তবে সে প্রেম তার সহস্রমুখী উপলব্ধির প্রতিরূপ খুঁজেছে এক নৈসর্গিক চেতনালোকে। পটভূমি কি পরিপ্রেক্ষিত নয়, প্রকৃতি জীবনানন্দের শিল্পিত সংবিত্তি 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে।

পরবর্তী গ্রন্থ 'মহাপৃথিবী'কে কবি নিজেই সংলগ্ন-গ্রন্থ হিসেবে দেখে থাকবেন, যেমন সিগনেট সংস্করণের সম্পাদক দাবী করেছেন।[১২]

প্রথম প্রকাশকালে এ গ্রন্থে 'বনলতাসেন'-এর সবকটি কবিতাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। হয়তো এ বিচার ঠিক, আবার ঠিক নাও হতে পারে ; কারণ, দ্বিতীয়বার 'বনলতাসেন' যখন প্রকাশিত হয়, কবির জীবৎকালেই, তখন কিন্তু সেই পরিবর্তিত সংস্করণে 'মহাপৃথিবী'র সবকটি কবিতাকে কবি স্থান দেননি, মাত্র দুটি কবিতাই তাঁর শেষতম নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত হয় এই নূতন সুপরিসর সংস্করণটিতে। যেহেতু, 'বনলতাসেন'-এর পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণ জীবনানন্দের 'অভিভাবকতায়' প্রকাশিত হয়, আমাদের আলোচনার অবলম্বন সেই গ্রন্থটিকে করেছি। সেভাবেই, কবির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'র আদি সংস্করণটিকেই আমরা আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি। সেদিকে থেকে 'মহাপৃথিবী'কে সংলগ্ন-গ্রন্থ হিসাবে মেনে নিতে খুব আপত্তি হবার কথা নয়।

শব্দের অভিধাকে প্রতীকী বিস্তার দিতে জীবনানন্দ ছিলেন অনায়াসদক্ষ। 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থের নামকরণই এর ভাববস্তুকে আভাসিত করছে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ; 'মহাপৃথিবী' অর্থে আরও বড়ো কোনও জগৎ যেখানে শুধু নিসর্গলোক নয়, 'বিশ্বচরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়'ও [২০] কাব্যের বিষয়ীভূত হয়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দের এই মহাপৃথিবী নিসর্গপৃথিবী আর মানবপৃথিবীর সমাহার ; ত্রিভুবনচারী লিরিককবির সেই দ্বিতীয় অনুধ্যান, সমাজ, জীবনানন্দের এ পর্যায়ের কাব্যে একটি বড়ো জায়গা নিয়েছে। পরিণামে, এক দ্বিমুখী আকর্ষে কবির চেতনা আলোড়িত। নিসর্গ তার নিজস্ব সৌন্দর্যের উৎসাহে সমান উজ্জ্বল থেকে ক্রমেই কবির চেতনায় দূরাপসারিত ; সে চেতনাকে তখন অধিকার করেছে, আচ্ছন্ন করেছে 'জীবনের বিষ'। দেশ ও কালের আপৎ অভিঘাতে, মানব-ভবিষ্যের চিন্তায়, যুদ্ধতাড়িত পৃথিবীর মূল্য বিনষ্টি ও নৈরাজ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে

২০। 'কবিতার কথা' নিবন্ধ, পৃষ্ঠা, ২ 'কবিতার কথা' সিগনেট সংস্করণ

কবির চেতনা অধিকৃত হয়েছে এমন এক আর্ত, বিমূঢ় অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানে যে শাণিত বিদ্রূপে ও তিক্ত ব্যঙ্গে অভিষিক্ত হয়েছে তাঁর কাবিতার ভাষা। নিসর্গকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়ানুভূতির যে সুস্বাদ রমণীয়তা পাঠক তাঁর কাব্যসৃষ্টির আদিপর্যায়ে পেয়েছিলেন, যে শিল্পিত সুষমায় 'বনলতাসেন' পর্যায়ের সব কবিতা চিহ্নিত, তার অনেকটাই এখানে অনুপস্থিত ; এবং উপস্থিত যখন, তখন তা' শুধু ক্ষণিক উদ্ভাসে। এই পরিবর্তনের একটিই কারণ। যে প্রকৃতি-পৃথিবীতে জীবনানন্দের কবিচেতনার সহজ ও স্বচ্ছন্দ বিহার, যেখানে প্রয়াণের অভীপ্সা এবং সাঙ্গীকরণের সংরাগ এতাবৎ তাঁর কবিতায় একটি সুষম সঙ্গতি সঞ্চারিত করেছে, প্রকৃতির সেই অপরাজেয় সৌন্দর্য ও প্রশান্তির জগৎ থেকে উৎপাটিত হয়ে কবির চৈতন্য বিমূঢ় দিশাহীনতায় ঘুরে বেড়িয়েছে এক আপৎকালীন পৃথিবীর পথে পথে। একদিকে সমাজ ও সময়ের আপৎকালীন অভিঘাত, অপরদিকে চেতনার আত্মসন্ধী উদ্‌ভ্রান্তি ও বিপন্নতার বোধ জীবনানন্দের একালের কাব্যে এনেছে অপূর্বব্যক্ত উপলব্ধির আততি ও তীক্ষ্ণতা। চিত্ররূপময় হৈমন্তিক নিসর্গ-পৃথিবী থেকে সমকাল ও প্রতিবেশ চিহ্নিত এক যুধ্যমান জগতে পৌঁছে চেতনা যেমন 'অভিজ্ঞতার সারবত্তায়' সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনই স্খলিত হয়ে পড়েছে সান্ত্বনা ও শান্তির আশ্বাসবহ এক পরিপূর্ণ কল্পনিসর্গের আশ্রয় হতে।

মনে হয়, 'মহাপৃথিবী'র নতুন কবিতাগুলি রচনার সময় থেকেই জীবনানন্দের কাব্যভাবনায় একটি আমূল বিপ্লব নিঃশব্দে ঘটে চলেছিলো। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেখি, চল্লিশের দশকের শেষে, পঞ্চাশের গোড়ায়, জীবনানন্দের প্রায় সব কটি কবিতাবিষয়ক নিবন্ধে বারেবারেই একটি নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্ত: 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার' বা 'ইতিহাসবেদের দরকার এবং সমাজবেদের'[২১] ; কিম্বা

২১। 'কবিতাপাঠ'—, পূর্বাশা, আষাঢ়, ১৩৫৬।

কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা এবং মর্মে থাকবে কালজ্ঞান।'[২২] এইসব সুন্দর সদুক্তিগুলি অচিরকালের মধ্যেই কবির লেখনী নিঃসৃত হয়েছিলো। তবে একথাও মনে রাখা দরকার প্রাসঙ্গিকভাবে, যে 'ভাবপ্রতিভাজাত অন্তঃপ্রেরণা'কেই তিনি কবিতা-জননের প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সে ভাবপ্রেরণা 'শুদ্ধ প্রতর্কের আশ্রয়ে' পরিশীলিত হোক এই তিনি চাইতেন, এবং তাই ইতিহাস বা সমাজচেতনার কোনটিরই কবিতাকে গ্রাস করা উচিত নয়, সেগুলি কখনই কবিতায় উত্তমর্ণ হিসেবে উপস্থিত হবে না, এ-সব কথা অত্যন্ত স্পষ্টতার সঙ্গে জীবনানন্দ লিখেছিলেন। সেসব স্মরণে রেখে 'মহাপৃথিবী' থেকে 'সাতটি তারার তিমিরে'র দিকে অগ্রসর হলে পাঠক জীবনানন্দের ক্রমপরিণতিশীল চেতনায় প্রকৃতির নিরঙ্কুশ আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হতে দেখে ততটা বিচলিত বোধ করবেন না। কবির চেতনার বিবর্তনে সেই সন্ধিলগ্নের স্বাক্ষর বহন করছে আদিসংস্করণ 'মহাপৃথিবী'র নতুন কবিতাগুলি, এবং সমকালীন অন্যান্য অনেক কবিতা, যার কিছুটা পরিচয় 'মহাপৃথিবী'র নতুন সিগনেট সংস্করণের সম্পাদক সংযোজিত 'আমিষাশী তরবার' অংশে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এই দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ কবিচেতনা প্রকৃতির শাশ্বত মৃত্তিকামুখী আকর্ষণ এবং দেশকালের আপতিক উৎকেন্দ্রিক চাপ, দুই বিপরীতমুখী টানে দীর্ণ হয়তো বা মহনীয় করেছে তাঁর একালের কবিতা। 'ধানের ক্ষেতের গন্ধে মুছে গেছে কবে জীবনের থেকে যেন,'—এই রকম একটি ঋজু ভাষণে গ্রন্থের প্রথমতম 'নিরালোক' কবিতাটির আরম্ভ। পর-স্তবকেই কবির গাঢ় নিসর্গলীনতার আকাঙ্খা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে: অনেক নক্ষত্রে ভরা রাতের আকাশের নিচে ফাল্গুনের ছায়ামাখা ঘাসে শুয়ে তাঁর মনে হয়, 'এখন মরণ ভালো'—'শরীরে লাগিয়া রবে

২২। 'উত্তরবৈবিক বাংলাকাব্য, ময়ূখ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬১।

এইসব ঘাস'। কিন্তু এই রমণীয় নিসর্গমগ্নতাকে ভেঙে দিয়ে 'হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া' হেঁচে ওঠে। এমনইভাবে, প্রতীকের অন্তরাল থেকে বাস্তবের প্রত্যাভিঘাত এসে পড়ে কবির চেতনাজগতে ; এবং কবিতাটির অবয়বে নিসর্গের মায়ালোকে। কবিতার শেষ অংশে তাই যেন সেই সান্ধ্যশ্রীময়ী নিসর্গজগতেরই কাছে কবির ব্যাকুল প্রশ্ন : 'সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন পথে ঘরে যাবো ! কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,—চিন্তাস্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পাবো ?'

দ্বিতীয় চরণটি হয়তো অসতর্কভাবে কোনও নিবিষ্ট পাঠককে মনে করিয়ে দিতে পারে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গ-রূপাবিষ্ট স্বপ্নজগৎ-এর কথা। উদ্যম চিন্তায় উজ্জীবিত, আবেগ স্বপ্নে আশ্রিত ; কিন্তু কবি এখানে চিন্তা এবং স্বপ্ন দুটিকেই অতিক্রম করে এক প্রশান্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। স্বপ্নপ্রয়াণের আবেগ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে লক্ষণীয় ; প্রশান্তি যা একমাত্র প্রকৃতিজগতের সঙ্গে একাত্মীকরণেই লভ্য তার স্বাদ আমরা 'বনলতাসেন'-এ পেয়েছি। নক্ষত্র তাঁকে উত্তর দিয়ে বলেছে : 'অথবা ঘাসের পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে' ; অর্থাৎ, স্পষ্টতই, কবির 'নিজের ঘর' অর্থাৎ দেশকাল-বদ্ধ যে সামাজিক মানবিক পৃথিবী এবং ঘাস নক্ষত্রের নিসর্গজগতের যে অবিচল রূপ, এ দুয়ের কোন সমীকরণ সম্ভব নয়। অতএব দ্বন্দ্ব ; দুই ভিন্নমুখী আকর্ষে দীর্ণ কবির আত্মসত্তার আর্ত বিমূঢ়তা ; নিসর্গলোকের প্রচ্ছায় ভেঙে তাঁর ইন্দ্রিয়সংবেদী চেতনা মানবলোকের 'নিরাশার খাতে' ঘুরে বেড়ায়। তাই, কবির কাছে—

পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি—
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী হয়ে আছে,
অপরিচিতের মতো সমাজ সংসার শত্রু সবই······

'নিরালোক'-এর সমকালীন একটি কবিতা 'সিন্ধুসারস' শুধু 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থটিরই নয়, জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যসৃষ্টিলোকের

উজ্জ্বলতম এক জ্যোতিষ্ক। 'সিন্ধুসারস'ও সংক্ষুব্ধ এই দ্বিভুবনচারিতার দ্বন্দ্বে। কবির কল্পনায় মালাবার ফেনার সন্তান সেই পাখি হয়ে উঠেছে এক প্রাকৃত প্রাণোল্লাসের প্রতীক। তার নৃত্যময় দুটি ডানার ছন্দ মানবের মনে জাগিয়ে তোলে প্রয়াণের স্বপ্ন, নির্মাণ করে 'নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ'; বর্ণনার প্রতিটি অনুপুঙ্খই এক প্রকৃতিভুবনের স্বপ্ন লালন করে। তবু মানুষের এই স্বপ্নজগৎ ও প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পাখির নেই কোনও আত্মিক যোগ। তার জৈব প্রাণেষণার কাছে অজ্ঞাত, 'যে রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে' বাঁধে 'কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত'। 'পৃথিবীর সব পথ ছেড়ে দিয়ে একা বিপরীত দ্বীপে' মানুষেরা যে স্বপ্ন নির্মাণ করে নেয় তা নিসর্গ-লোকেরই এক অ-লৌকিক প্রতিমা ; সিন্ধুসারস সেই স্বপ্নের ঐকান্তি-কতা জানেনা। একবার এই স্বপ্নজগতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মানুষের কাছে 'পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো নিভে' শুধু থাকে 'গভীর নীলাভরম ইচ্ছা চেষ্টা', 'ইন্দ্রধনু ধরিবারে ক্লান্ত আয়োজন'। এ সব কিছু থেকেই বহুদূরস্থ সিন্ধুসারস তবু তার উড্ডীয়মান ডানার সঙ্গীতের উল্লাসে মানুষের মনে জাগিয়ে দেয় স্বপ্ন, প্রয়াণের এক তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা। কবিতার তৃতীয় স্তবকে সেই স্বপ্নজগতকে জীবনানন্দ চিনিয়ে দিয়েছেন ধানসিঁড়ি নদী, হলুদ পাতার গন্ধ আর সোনালি চিল ও মেঘের দুপুরের অনুষঙ্গে :

> ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো সাদা ডানা,
> যদিও এ পৃথিবীর স্বপ্নচিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

'আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ' : এভাবেই স্বপ্ন ও বাস্তবের ব্যবধানের ইঙ্গিত বহন করে এই অনবদ্য কবিতাটি, যার জন্যেই হয়তো বা শেষচরণকটিতে ধ্বনিত হয় এমন এক বিদায়মূর্চ্ছনা যা কীট্সের নাইটিঙ্গেল বিদায়ের অনুরূপ।

আসলে জীবনানন্দের কবিসত্তা বর্ধিত হয়েছিলো এক যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, এবং তাঁর পরিণতিশীল চেতনা ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছিলো আর

এক যুধ্যমান পৃথিবীর দিকে। এক বিবদমান বিশ্বের আসন্ন বিপন্নতার দায়ভাগ সৎ কবির মতোই তাঁর চেতনা আরও অধিকতর মাত্রায় গ্রহণ করছিলো। নিসর্গের অপরূপতার জগৎ থেকে, ইন্দ্রিয়সংরাগী রূপাবিষ্টতা থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর কবিতা, 'শোচনীয় কালের বিপাকে' 'আবর্তিত হয়ে যায় দানবের মায়াবলে'। সেকারণেই হয়ত একালে তাঁর কাব্যের নায়ক 'বিপন্ন বিস্ময়ে' ক্লান্ত হতে হতে একগাছি দড়ি হাতে একা একা গেছে অশ্বত্থের কাছে, 'যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা এই জেনে'। 'বনলতা সেন'-এর 'আমি যদি বনহংস হতাম' কবিতাটির বিশ্বাসভূমি থেকে এ-চেতনা অনেক দূরের জিনিস। অবশ্যই বিশশতকী অস্তিত্বের দায়ভাগ বহন করে 'আটবছর আগের একদিন' আমাদের মানসিকতার অনেক নিকটবর্তী। দেশকাল ও সমাজের আপতিক টান ক্রমেই তাঁকে তাঁর নিভৃত সান্ত্বনার আশ্রয় থেকে উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করছিলো 'সাতটি তারার তিমিরে'র আগ্রাসী তিমিরাচ্ছন্নতার বাস্তব ভূগোলে। আদি সংস্করণ 'মহাপৃথিবী'র শেষতম কবিতাগুচ্ছের ('প্রেম অপ্রেম' কবিতা) কয়েকটি চরণ এ প্রসঙ্গে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ :

> তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চলে গেলে কবে।
> সেই থেকে অন্যপ্রকৃতির অনুভবে
> মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে উঠেছে হৃদয়।

'অন্যপ্রকৃতির' কথাটি 'অন্যপ্রকার' অর্থে নেওয়া সম্ভব হয়না যখন পরেই দেখি জীবনানন্দ আবার লিখছেন :

> সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চলে গেছে
> ঢেরদিন প্রকৃতি ও বইয়ে নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
> হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করছে।

একদিকে ইন্দ্রিয়সংবেদী চেতনার জগৎ অন্যদিকে গ্রন্থধৃত মানব অভিজ্ঞতার শিক্ষা সবকিছুই তাঁর যুদ্ধধ্বস্ত উপলব্ধির কাছে অলীক, ছায়াসার মনে হয়েছে। নিসর্গানুভূতির এই দুরাপস্থতির

পটভূমিকায় 'সাতটি তারার তিমির'-এর নিরন্ধ্র আঁধারের জগতে প্রবেশ করে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পাঠক হয়তো বা কিছুটা বিমূঢ় বোধ করতে পারেন এই বিপর্যস্ত বিশৃঙ্খল পৃথিবীর 'ঋণরক্ত লোকসান ইতর খাতক', ভরা মানবসমাজের দিকে তাকিয়ে। তবু, এ অভিজ্ঞান 'মহাপৃথিবী'র পাঠকের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। আগেই বলেছি, যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রশান্তির জগতে জীবনানন্দের বিচরণ সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, 'আরো বড় চেতনার লোকে' উত্তরপ্রবেশ করে তা থেকে তিনি ক্রমেই বিচ্যুত হচ্ছিলেন। এই বড় চেতনার আশ্রয়, 'মহাপৃথিবী'র কবিতার ভাষায়, মানবিক ভিত্তি আর পংকিল সময়স্রোত। সৎকবিতার অন্তরে 'সমাজবেদের', পরিচ্ছন্ন তাড়না থাকা প্রয়োজন বলে জীবনানন্দ উল্লেখ করেছিলেন। আবার, তিনি এও জানতেন যে আমরা যে সময়ে বাস করছি দু'দুটো যুদ্ধে ও নানারকম বড় অনর্থ অত্যাচারে তা ভেঙে ধ্বসে যেতে থাকলেও জীবনের সব কাজই যুক্তি সফলতায় দাঁড় করাতে হলে যে ধরনের সমাজ-নমনীয়তার প্রয়োজন,[২৩] তা বিরল। এইসব অভিজ্ঞতার সারাৎসারে পুষ্ট হয়েছে 'সাতটি তারার তিমির' ও সে পর্যায়ের অন্য কবিতাবলীর জগৎ—মূল্যবোধের বিপর্যয়ে চিহ্নিত এক 'বিশৃঙ্খল শতাব্দী', 'মধ্যবিত্তমদির' এক 'তিমিরবিলাসী' সমাজ। তবুও, ইতিহাসচেতনার পরিশুদ্ধিতে তিনি 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির' থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তঃশীল প্রেরণার হৃদয়স্পন্দন সভ্যতার অন্তরে বারবার অনুভব করে শেষপর্যন্ত 'নিরাশার খাতে' আপন চেতনাকে বহে যেতে দেননি। সে বিষয়টি এ গ্রন্থের অন্য একটি অধ্যায়ের আলোচনার প্রসঙ্গ। প্রকৃতিচেতনার বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে 'সাতটি তারার তিমির' ও সমকালীন কবিতাবলী (যার অনেকগুলি 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় গ্রন্থিত) তাদের নেতিবাচক গুরুত্বেই সমধিক

২৩। 'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা'।

উল্লেখ্য। নিসর্গের অপহ্নব, প্রকৃতির প্রশান্তির প্রত্যয়ের বিচ্যুতিই একালের কবিমানসিকতায় উৎকীর্ণ। তবু, তার তাড়নায় কোন বিষণ্ণ বিলাপ বা দূরবিহারী প্রয়াণস্বপ্নে কবি উজ্জীবিত হননি, কারণ 'মানব-সমাজের ঘনঘটায়' তাঁর চেতনা অধিকৃত ছিলো। দু'একটি কবিতার উল্লেখ প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়। 'ভাষিত' কবিতার প্রথম কটি চরণ এই রকম :

> আমার এ জীবনের ভোরবেলা থেকে
> যেসব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার,
> একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
> আমাদের দুজনার মতো দাঁড়াবার
> তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে
> আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই।

কত অজস্র সংকেতময় উল্লেখে কবি এই নিরাশাভারাক্রান্ত অন্ধকার ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে অন্য এক উজ্জ্বল পৃথিবীর স্মৃতিতে মাত্র ধ্যানস্থ হয়েছেন, যে পৃথিবী নিসর্গের আবহে বাঙময়। জীবনানন্দের সন্ধি-পর্বের এজাতীয় রচনায় নিসর্গের উদ্দীপ্তি স্মৃতিবাহিত, স্বপ্নোজ্জ্বল নয়। 'জনান্তিকে' কবিতায় যে কবি বলেন, 'তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু / গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ, 'দীপ্তি' কবিতায় তাঁরই কণ্ঠস্বর : 'এছাড়া কোথাও কোনো পাখি নেই/বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই / তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে।' উদাহরণ অজস্র করা যেতে পারে ; তার প্রয়োজন নেই। 'ইতিহাসচেতনা' ও 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানের' নির্দেশে কবি উপলব্ধি করেছেন : 'নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে' তিমিরবিনাশী এক নিরন্তর প্রয়াণে, নাবিকের মতো সৈকতের সত্যের অন্বেষায়। কিন্তু 'নবপ্রস্থানের' কথা উল্লেখ করেই 'জনান্তিকে' কবিতায় তিনি বলে ওঠেন :

চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনান্তিকে
চোখে থেকে যায়
আরো-এক আভা :
আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিষ
হয়ে তুমি রয়ে গেছ।

'দীপ্তি' কবিতায় বসন্তের অনুষঙ্গে তিনি অবিনশ্বর মানবহৃদয়-নিহিত আভার কথাই বলেছেন। তারই আলোকে যখন 'সুর্যতামসী' কবিতার নিচে উদ্ধৃত চরণগুলি উদ্ভাসিত হয়, বুঝতে অসুবিধা হয়না জীবনানন্দ যে প্রশান্তি-সুন্দর পৃথিবীর আলোকিত আবির্ভাবের বিশ্বাসে চিরদিনই অবিচল ছিলেন, সে পৃথিবী নিসর্গের শান্তি ও সুষমায় আশ্রিত : 'তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে সূর্যালোকিত সব সিন্ধু পাখিদের শব্দ শুনি'। 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে তাঁর বিপন্ন চেতনার জগতে 'তিমিরবিলাসী' বিধ্বস্ততাকে কাটিয়ে উঠে 'উত্তর-প্রবেশ' ঘটেনি কোনো 'আরো বড়ো চেতনার লোকে' 'যেখানে বসন্তের উদার সমারোহ'। তবু 'সূর্যালোক, সমুদ্রের নীলিম বিস্তার আর পাখিদের কলকাকলির রূপকে অন্যতর নিসর্গাশ্রিত উজ্জ্বল পৃথিবীর ছবিই শেষ পর্যন্ত কল্পনার ধ্যানে ও প্রেরণায় গরিয়সী হয়ে উঠতে চাইছিলো এক 'আলোপৃথিবী'র চেতনায়, যার উৎসারই এ সময়কার কাব্যের চারিত্র্য। তাই জীবনানন্দের চেতনার জগতে প্রকৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ এবং প্রকৃতিলীন অস্তিত্বের সঙ্গে সাঙ্গীকরণের আকাঙ্ক্ষা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে প্রেমের আবেগে ; অন্যদিকে প্রেমের সূক্ষ্মতম উপলব্ধিগুলি আশ্রিত হয়েছে নিসর্গের নিজস্ব আনন্দবেদনার জগতে। একদিকে যেমন কবির চেতনায় 'তার মুখ মনে পড়ে এরকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর / পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে', অপরদিকে তেমনই, 'চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে' প্রেমিকমিথুনকে দেখে তাঁর উপলব্ধিতে বেজে ওঠে অনন্য এক নিসর্গস্তব। তিনি অনুভব করেন,

'হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে যেখানে মানুষ আশ্বাস খুঁজেছে এসে' সেই 'ব্যাপ্ত প্রান্তরে' তারা দুজনেও আজ এসেছেন, সেখানে 'আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে'; আবার সেখানেই 'ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের বলে'। তাহলেই দেখি, প্রকৃতিচেতনার বিবর্তনে জীবনানন্দের মানসিকতা অনেকদিনই অধিকৃত ছিল প্রকৃতির সান্ত্বনা, নির্লিপ্তির আশ্রয় ও প্রশান্তির অপরাহত শক্তির ধারণায়। মানুষের হৃদয়ে প্রেমের অপূর্ব উত্থান তিনি দেখেছেন, এও বুঝেছেন সে আবেগেরও একদিন নির্বাণ ঘটে; তখনও প্রকৃতির প্রশান্তির জগৎ তার সান্ত্বনার আশ্রয়ে স্থির অপরিম্লান থাকে স্বীয় সৌন্দর্যের ও শান্তির অবিরল উৎসারে।

কিন্তু জীবনানন্দের চেতনায় প্রকৃতি কাব্যরচনার মধ্য পর্যায়েও হৈমন্তিক নশ্বরতার অনুষঙ্গে পরিবৃত। 'দুজন' বা 'অঘ্রাণ প্রান্তর'-এর মত কবিতায় সেই পরিমণ্ডল সুপরিসর বর্ণনায় বিধৃত, অন্যত্র ক্ষুদ্র বা বিক্ষিপ্ত কিন্তু উজ্জ্বল উল্লেখে সঙ্কেতপ্রবণ। আদি ও মধ্য পর্যায়ের প্রায় মোহগ্রস্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত রূপাবিষ্টতা অতিক্রম করে মননঋদ্ধ অনুভূতির শক্তিতে নিসর্গের 'হৃষ্ট' রূপকার অনুভব করেছেন মৃত্যুর পরিব্যাপ্ত প্রাকৃত সত্য: 'বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের বলে'। নিসর্গের নিজস্ব জগতেও যে জীবন ও মৃত্যুর অনিবার্যতা আর অধিকার অব্যাহত, সেই প্রজ্ঞার আশ্রয় থেকেই তিনি বলেন, 'নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব'। জামিরের বনে একাকী পায়রার ডাক শুনে কবির মনে পড়ে যায় 'আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে' লীন সেই ঈপ্সিতাকে যাকে চেয়ে পরাস্ত চেতনা জেনেছে 'নিখিলের অন্ধকার' প্রয়োজনের শাসন মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার উত্তেজকে সংবৃত করেছে। তাই 'প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির' আহ্বানে ক্রমশ তাঁর চেতনা স্থিত হয় 'প্রেম ও অপ্রেম থেকে দূরে'। এই নির্মোহ মানসিকতার আবেগতীর্ণ উদবর্তনেই মধ্যপর্যায়ের কবিতাবলী চিহ্নিত। জীবনানন্দ একালে বারবার প্রতীকের অনতি-পরিমিত স্পষ্টতায় এক প্রকৃতিলীন মানবঅস্তিত্বের অনুধ্যানে নিযুক্ত

রেখেছেন আপন চেতনা। তার সেই চেতনার স্পষ্টতর ও পরিণত আর এক উদবর্তনের শিল্পিত অভিব্যক্তিতে দীপ্ত হয়ে আছে মৃত্যুর অব্যবহিত আগে লেখা কবিতার পর কবিতা। ১৩৬১তে প্রকাশিত তাঁর সব কবিতায় ছড়িয়ে আছে এক আলোকদ্যুতি, যা কখনও উদ্ভাসে অনতিতীব্র হলেও সবসময়েই সংকেতে গভীর। 'আলোকপত্র', 'আলোকপাত', 'আলোপৃথিবী', 'আলোকস্তম্ভ', 'অবিনশ্বর'—এ জাতীয় শিরোনাম আর অজস্র চিত্রকল্প এবং শব্দের আলোকাভিসারী ব্যঞ্জনায় তাঁর সেসব রচনা আনুপূর্বিক গরিয়সী হয়ে আছে। সহজলভ্য দু'একটি কবিতা বেছে নিয়েই আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।

তাঁর আগে পাঠককে একটিবার চোখ ফেরাতে বলি 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থেরই প্রথমতম কবিতাটির দিকে। নাম 'আকাশলীনা'; উদ্দিষ্ট সুরঞ্জনা। 'সুরঞ্জনা'র সাক্ষাৎ জীবনানন্দের পাঠক আর একবার পেয়েছেন 'বনলতাসেন' গ্রন্থে—প্রকৃতিপৃথিবীর প্রশান্তির ব্যাপ্ত পটভূমিতে আবহমান এক নারীপ্রতিমায কবি আভাসিত করেছিলেন মানবহৃদয়ের দুর্জয়প্রেম যা সভ্যতা থেকে নবসভ্যতার যাত্রিক অন্বেষার ক্লান্তি আর সংগ্রামের ঊর্ধ্বেস্থিত এক চিরকালীন অন্বিষ্ট। আদিম দেহজ কামনা থেকে উত্তরিত হয়ে ঐ কবিতায় 'সুরঞ্জনা' তাই ভোরের কল্লোল হয়ে রযে গেছে মানবহৃদয়ে। প্রতীকের অন্তরালবর্তিনী সেই সনাতন পরমাগতি প্রেমকেই জীবনানন্দ আহ্বান জানালেন আর একবার 'সাতটি তারার তিমিরে'র সমাচ্ছন্ন আঁধারের জগৎ থেকে, যেখানে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে' বারবার মানবহৃদয় জেগে উঠছে এক নিরর্থক কালিমায়। আমার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় যে শেষপর্যন্ত 'সাতটি তারার তিমির'-এর মতো গ্রন্থেও, যেখানে বা কিছু ধ্রুব, যা কিছু সুন্দর, তা এক সর্বাত্মক নিরর্থকতার বোধে পর্যবসিত, কবি 'সুরঞ্জনা' তথা 'প্রেম'কে আহ্বান জানালেন এক নবীনতর হৃদয়-অধিষ্ঠানে।

এ কবিতার একটি বিস্তৃততর বিশ্লেষণে আগ্রহী হবো জীবনানন্দের

প্রেমচেতনার আলোচনা ক্ষেত্রে। আপাতত লক্ষ্য করা যাক, প্রথম স্তবকেই নিষেধের নির্দেশে ('ওইখানে যেয়োনাকো, কয়োনাকো কথা অই যুবকের সাথে'); বিপরীতে কবি রেখেছেন প্রত্যাবর্তনের এক নৈসর্গিক পটভূমি : মাঠ, ঢেউ, নক্ষত্রের রাত।

ফিরে এসো সুরঞ্জনা,
নক্ষত্রের রূপালি আগুনভরা রাতে,
ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে,
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার,
দূরে থেকে দূরে, আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

সে আহ্বান শেষাবধি ধ্বনিত অনুরণিত হয়ে উঠছে আগুনভরা রাত, মাঠ, ঢেউয়ের নিসর্গলোক থেকে কবির অন্তরলোকে ('হৃদয়ে আমার')। 'সুরঞ্জনা' তথা প্রেমকে কবি ডেকে আনছেন নক্ষত্রের আকাশ থেকে নিসর্গে, মাঠের তরঙ্গ থেকে চৈতন্যের নিহিত গভীরে।

এতকথা বলার প্রয়োজন এই কারণেই যে যদিও সেই 'মহাপৃথিবী'র রচনাকাল (১৩৩৬-৪৮) থেকেই জীবনানন্দের চেতনার জগৎ ক্রমশ সরে আসছিলো সংকল্পনাস্পৃষ্ট এক নিসর্গলোকের প্রশান্ত পরিমণ্ডল থেকে বাস্তবপৃথিবীর অস্তিত্বের গ্লানি ও সমস্যাবলীর কাছাকাছি এবং 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে তিনি যুদ্ধবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর তীব্র সচেতন অধিবাসী, তবু প্রকৃতি কোনদিনই তাঁর কাব্যে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত হয়নি, বর্জিত হয়নি কোনো অলীক স্বপ্নের আধারলোক হিসেবে। যেমন, তিনি নিজেই লিখেছেন, 'অন্তত মানব সমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময়ভাবনা দূর দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয়।'[২৪]

প্রকৃতিচেতনার সাময়িক প্রস্থান এবং প্রগাঢ়তর এক বিশ্বাসভূমিতে তার প্রত্যাবর্তন পঞ্চাশের দশকে জীবনানন্দের লেখা সব

২৪। 'কবিতা প্রসঙ্গে' : কবিতার কথা।

কবিতাতেই প্রজ্ঞার এক 'মহনীয়' আভা সঞ্চারিত করেছে। 'মহাপৃথিবী'র কোলাহলের মধ্যে যে কবি বলেছিলেন,

কামানের থেকে নয়, আজো এইখানে প্রকৃতি রয়েছে।

'সাতটি তারার তিমিরে' সেই কবি 'নীলিমার থেকে আরো দূরে' সরে গিয়েও শেষপর্যন্ত বুঝেছেন :

ক : প্রকৃতি আবিল কিছু ; তবু-মানুষের প্রয়োজনমত তাতে নির্মলতা আছে। আরো কিছু আছে তাতে…

খ : নবপৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে ?

গ : হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি, কোথাও সূর্যের ভোর রয়ে গেছে বলে মনে হয়।

অন্তিমপর্বের অগ্রন্থবদ্ধ অনেকগুলি কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ ফিরে আসেন প্রকৃতির প্রশান্তির কাছে ; অনুচ্ছ্বসিত কিন্তু গাঢ়তর বিশ্বাসের উজ্জ্বলতায় তাঁর সৃষ্টির শেষতম বিবর্তনে উচ্চারিত হয় এক মহান নিসর্গস্তব। সে নিসর্গ বাস্তববেদী ; জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় অভিষিক্ত এক নতুন আলোপৃথিবীর চেতনা। বাস্তবের বর্জনে নয়, দেশকাল ও সমাজের দায় ও পাপ থেকে পলাতক কোনও প্রচ্ছায়ে নয়, এ সবেরই অমা ও গরলে জারিত হয়ে মানবচেতনা শেষপর্যন্ত উত্তীর্ণ হবে এক অমৃতলোকে, মহান্ নবীন জীবনে, এ বিশ্বাস জীবনানন্দ সমস্ত ঘনঘটার মধ্যেও লালন করেছিলেন।

দেখা যাক,
পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে
কী করে যে
মহা-নীলাকাশ। (হে হৃদয়। বেলা অবেলা)

তাই, তাঁর চেতনার জগতে প্রকৃতিপ্রবণ মানসতার চূড়ান্ত বিকাশে

পাই এক অন্যতর নিসর্গপৃথিবী যা মানব-অভিজ্ঞতার থেকে দূরস্থ নয়, যার প্রশান্তির দানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নির্লিপ্ত ও জৈব নিমজ্জনের ঊর্ধ্বে মানবের হৃদয়মূল্য। এমনই একটি বিশ্বাসে সঞ্জীবিত হয়ে 'আলো-পৃথিবী' কবিতার অবিস্মরণীয় ভাষণে জীবনানন্দ বলে ওঠেন :

শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি
নরনারী নেমে পড়ে
প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে
সবগ্লানি না কাটলেও
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপয়ে।

লক্ষণীয়, 'প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে' চরণটি। কোনও সংবেদনাহীন জড় নিসর্গ নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হবে মানবিক অনুভূতির হৃদয়মূল্য; তখনই এ পৃথিবী হবে 'আলোপৃথিবী'। আর প্রকৃতি চেতনার এই নবীন উত্থানে, আলোকদেশি পৃথিবীর পরিনির্মাণে, নারী তথা প্রেমের ভূমিকাই সবচেয়ে গভীর ও গুরুত্বময়। তাই, মৃত্যুপূর্ব কবিতার নিবিড় নিসর্গমননের পাশাপাশি অভিন্নপ্রায় সংশ্লেষে রয়েছে নারী, অবিনশ্বর মৃত্যুহীন এক সত্তার প্রতিমা। তাই, একদিকে যেমন কবির আত্মা 'বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী হয়ে' কোনও 'নবহরিতের সঙ্গীতে' নিশ্চিহ্ন নিমজ্জনে হারিয়ে ফেলে মানবিক পৃথিবীর ভাষা, অপরদিকে তেমনই সে ফিরে আসে 'দূর জন্মজন্মান্তের' এক 'অনাদি আলোর ভালবাসায়'। অবশ্যই এই সময়চিহ্নগ্রাসী অপার ভালবাসা নিসর্গের প্রতি মানবমনের অনাদিকালীন আকর্ষণ। তাই প্রেমের রূপকে ভাবটির বিস্তার ঘটে :

আমি সেই মহাতরু লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্য নীলিমায়—
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

শেষচরণের 'অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর' অনিবার্য ইঙ্গিতে এক প্রশান্ত উজ্জ্বল লাবণ্যময় নিসর্গভুবনের বাণী বহন করছে। সেই 'লাবণ্যসাগর' থেকেই উঠেছেন প্রেরণাদাত্রী নারী। অতএব, আবার পেয়ে যাই সেই জীবনানন্দীয় প্রতীকী ইঙ্গিতময়তার অন্তঃসারে পুষ্ট অভিভাষণ : এক প্রকৃতির ভাবসাযুজ্যে একাত্মীকৃত আর এক প্রকৃতি, জীবনানন্দের ভাষায় 'দ্বিতীয় প্রকৃতি'। নারী ও নিসর্গ বারে-বারেই তাঁর কল্পনাপ্রতিভার অনিবার্য ও অভিন্ন সংশ্লেষে সুস্থিত হয়েছে এক রমণীয় কল্যাণীমূর্তিতে।

বুদ্ধদেব বসু যথার্থই লিখেছিলেন, আলোর এমন উদার সমারোহ ইতিপূর্বে জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যায়নি। 'দুদিকে ছড়ায়ে আছে' এই কবিতাটির স্বল্প অথচ সুশৃংখল পরিসরের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে এক মহাতরু—মৃত্তিকার বাস্তব থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে,যা নীলিমামুখী, আলোকাভিসারী। 'রক্তনদীর তীরে কালো পৃথিবীর' কবিতাটিতেও পাঠক এই বৃক্ষটির দেখা পান। 'বনলতাসেন' পর্বেও কবির সংকল্পনার চকিত উদ্ভাসে কখনও ধরা পড়ে যায় এই আলোকতরুর দিব্যসত্তা, 'শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে'। 'মৌন বৃক্ষের একমুঠো আলো' 'সনাতন শূন্যের অন্বেষণে' ফেরা ব্যর্থ মানবকে শোনায় 'হরিতের অক্ষয় গুঞ্জরণ'; তখন কবি বলে ওঠেন :

> মৃত্তিকায় মূল রেখে লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়
> সহজ গাছের স্থির প্রতিচ্ছবি হবে—

এভাবেই, অনুপুঙ্খ-অনুশীলনে এ কথা অবশ্যমান্য হয়ে ওঠে জীবনানন্দের অন্তিমপর্বের সৃষ্টিতে নিসর্গ প্রত্যাবর্তিত হয়েছে দিব্য-মহিমায়। তাঁর 'আলোপৃথিবী'র সংকল্পনা ধূসর, ম্লান নয়, উদার উজ্জ্বল এক নিসর্গ-চেতনার জগতেই আশ্রয় ও মুক্তি খুঁজেছে। তাই তাঁরই ভাষায়—

> নিমিত্তের ভাগী হয়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়
> হরিতের কাছে এসে শিখবে অক্ষর গুঞ্জরণ।

রক্তনদীর তীরে / কবিতা বর্ষ ১৯, সংখ্যা-২ পৌষ

নিসর্গচেতনার এই আবর্তন—ইন্দ্রিয়মগ্ন রূপাবিষ্টতার প্রাথমিক আস্বাদ থেকে ইন্দ্রিয়সংবেদী উপলব্ধিতে প্রকৃতির শান্ত প্রাণপ্রবাহের মধ্যে আত্মনিমজ্জন, তারপর সেই নিমজ্জন থেকে উৎপাটিত হয়ে বাস্তবের 'বিষমানুপাতিক টানে' মানবজগতের রণ, রক্ত, রিরংসার তিমিরময় শূন্যতায় আত্মঅবলোপ, সেই পতন থেকে আবার উদ্ধৃত হয়ে এক আলো চেতনাময় নিসর্গজগতে প্রত্যাবর্তন—জীবনানন্দের প্রকৃতি-ভাবনার বিকাশের ধারায় এই পর্যায়গুলি তাঁর কাব্যের কোনো ধারাবাহিক নিষ্ঠ অনুশীলনে লক্ষ্য না করে উপায় নেই। জীবনানন্দ স্বয়ং এই অনুবর্তন ও উত্তরণপ্রয়াসী কবিসত্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'কবিতার কথা' নিবন্ধটির শেষাংশে রয়েছে সেই রকমই একটি প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি :

'কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন·····তিনি কি করবেন? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর চলে যাবেন,—শহরে বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতর ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনামনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন, আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মাদ পঙ্গুদের সঙ্গে করে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর, সেই কোন আদিজননীর কাছে যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনো অদিতির কাছে।'

এই ঋজু গভীর আবেগমন্দ্র ভাষণ কোনোও দ্বিতীয় বক্তব্যের অবকাশ রাখে না। তাঁর কবিতায় আদি ও অন্তিমে, চেতনার নানা বিচ্ছুরণে উচ্চারিত হয়েছে বাংলাকবিতায় অনাস্বাদিতপূর্ব এক নিসর্গ-প্রেম। শেষপর্যায়ের কাব্যে 'কবিমানসের আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন' ঘটিয়ে মানুষের 'আবহমান অভিজ্ঞতার' পাঠে সেই প্রকৃতি আরো বড়ো চেতনার আলোকে নবমূল্যায়িত হয়েছে; আর তখনই তাঁর কাব্যে এক উজ্জ্বল অনশ্বর প্রতিমায় আবির্ভূত হয়েছে 'মানুষের আবহমান পৃথিবীর শীর্ষে এই নতুন পৃথিবী', এক সৌরকরোজ্জ্বল আলোপৃথিবী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেম

প্রকৃতি, ইতিহাস, সময় ও সমাজ-অনুধ্যানের পাশাপাশি অনেকটা সমান্তরাল, কখনও বা কিছুটা উচ্চতর ভূমিকায় যে বিষয়টি জীবনানন্দের কাব্যে পূর্বাপর প্রাণরস সঞ্জীবিত করেছে, তা হল প্রেম। এমন অনেক পাঠকই আছেন যাঁদের কাছে জীবনানন্দের কাব্যের মুখ্য আবেদন প্রকৃতি নয়, প্রেম। কাব্যের রসাস্বাদনে পাঠকের মনে যে আবেদন প্রাথমিক ও অতিপ্রত্যক্ষ তার গুরুত্ব কোনো সময়েই অস্বীকার করা যায় না। তাই, জীবনানন্দের কাব্যের যদি কোনো দুটি মৌল বিষয় বেছে নিতে হয়, তা হবে প্রকৃতি ও প্রেম; অথবা কবি স্বয়ং যেমন লিখেছিলেন, 'প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেম'। অন্তত তাঁর সৃষ্টির মধ্যপর্ব পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত অবশ্যমান্য। তবু যে প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে আসে তা' হল, যে কবি কাব্যের মধ্যে মানব-অস্তিত্বের 'উৎসনিরুক্তি' সন্ধান করেছেন বারবার, তাঁর সৃষ্টিতে প্রেমের মুখ্যতম স্বরূপ কি। একমাত্র পরম্পরা ও প্রবণতাসাপেক্ষ বিশ্লেষণেই জীবনানন্দের বিকাশপ্রবণ কবিচেতনায় প্রেমের স্থান ও মহিমা নিরূপিত হতে পারে।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-এর প্রভাবিত পদ্যপ্রয়াসগুলিতে কোনও স্বকীয় উচ্চারণের সন্ধান পাওয়া দুরূহ; তবু ছন্দচাপল্য এবং দূরাবগাহী ভাবপ্রবণতার (যা দেশজ পরিসীমা থেকে পাঠককে ভুলিয়ে নেয় পরদেশী আবহের বৈচিত্র্য ও রহস্যময়তার মোহে) পাশাপাশি 'ঝরাপালকে' রয়ে গেছে এমন কিছু ধ্বনি ও ভাববিশিষ্টতা যা উত্তরসূরী জীবনানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তেমনই কিছু উদাহরণ থেকে যে কবি সামনে এসে দাঁড়ান, তিনি প্রেমের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের

উত্তাপ কবিতায় সঞ্চারিত করে দিতে পারেন নি, পরিবর্তে নিয়ে এসেছেন এক অস্পষ্ট, অনির্দেশ্য প্রেমব্যাকুলতা যা ইপ্সিতাকে খুঁজে ফিরেছে অতীতের লুপ্ত গরিমা, বিষাদ ও মৃত্যুস্পৃষ্ট এমন এক অলীক জগতে যা বাস্তব থেকে দূরস্থিত অথচ কল্পনার যথার্থ উজ্জীবনে স্বপ্নেও আশ্বস্ত নয়। তাই, 'ঝরাপালকে'র 'বিহ্বল বিরহী' 'চলেছে কত শত যুগজন্ম বহি' অথচ তাঁর ইপ্সিতা তবুও হয়ে ওঠেননি কোনও স্বপ্ন প্রত্যয় কি নিশ্চিত অন্বিষ্টের প্রতিমা ; তাই, 'প্রেমপিপাসার অগ্নি-অভিসার' 'হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি' রচনা করে 'অনন্ত অঙ্গারে'। 'কারা কবে বেসেছিল ভালো' কি 'যুগ যুগ ছুটিতেছে কার অন্বেষণে' জাতীয় চরণের অজস্র বিক্ষিপ্ত উদাহরণ পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তোলে 'ঝরাপালকে'র কবির প্রেমভাবনার অনিশ্চয়তা ও অপরিণতির রূপটি।

'অস্তচাঁদ' বা 'ছায়াপ্রিয়া'র মত কবিতা পাঠ করিলেই দেখা যায় এ সময়কার রচনায় প্রেমের কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে নায়ক আত্ম-বিস্মৃত ভাবাতিশয্যে আপনাকে দেখেছে 'দূর উর ব্যবিলোন মিশরের মরুভূসংকটে' 'ইসিসের বেদিকার মূলে' আসীরিয় সম্রাটের বেশে', কখনও তাতার কি স্পেনীয় জলদস্যুর মত দাবীতে নির্মম, আবার কখনও 'বাংলার মাঠ ঘাটে' বেনুহাতে ময়ূরপঙ্খচূড়া চিরকিশোরের মত মায়াবী। এভাবে অতীত ও ইতিহাস, পুরাণ ও লোককথার উচ্ছ্বাসপ্রবণ, কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন মিশ্রণে 'ঝরাপালকে' প্রেম ব্যক্তিগত আবেগের উত্তাপ ও প্রাণস্পন্দনকে হারিয়ে ফেলেছে। তবুও তারই মধ্যে কখনও 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল'-এর মত কবিতা দীর্ঘায়িত অক্ষরবৃত্তের বিষাদভারাবনত পাদচারণায় অভ্রান্ত জীবনানন্দীয় আমেজ নিয়ে আসে :

চুল যার শাওনের মেঘ আর—আঁখি গোধূলির মত গোলাপীরঙিন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে'—স্বপ্নে—কতদিন।

উদ্ধৃত চরণ দুটি বুদ্ধদেব বসুর আলোচনার ফলে আজ যথেষ্ট পরিচিত ও প্রচারিত। কিন্তু 'রাজার দুলাল', যাকে ঘিরে কবির স্বকণ্ঠ

উচ্চারিত হতে শুনেছেন বুদ্ধদেব, তাঁকে অতিক্রম করে এই কবিতার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন অভ্রান্ত জীবনানন্দীয় নায়িকা—সেই শঙ্খমালা নারী যাকে বারবার দেখি কবির স্বপ্নে ও জাগরণে বিষণ্ন প্রত্যাবর্তনে :

মীনকুমারীর মত কোন দূর সিন্ধুর অতলে
ঘুরেছে সে মোর লাগি ! ·····
······ ········ ·····················
······················নরম লালিমা !
জ্বলে গেছে, —নগ্ন হাত, —নাই শাঁখা, হারায়েছে রুলি,
এলোমেলো কালোচুল খসে গেছে খোঁপা তার,
বেণী গেছে খুলি'।
সাপিনীর মত বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙকালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁশা, —হিমস্তন, —হিম রোমকূপ !

এ কবিতার যে ত্রুটি তা রয়েছে অন্যত্র ; সে ত্রুটি দৃষ্টিকোণের ; অসংলগ্ন সংস্থান ও ভাবকেন্দ্রহীনতার। 'ডালিমফুলের মত ঠোঁট যার' সেই রাজার দুলাল—যাঁকে দিয়ে কবিতার সূচনা ও শেষ, যিনি নায়িকার ঘুমপথে, স্বপ্নে বারবার ফিরে আসেন—তাঁকে বিস্মৃত হয়ে কবিতায় মধ্যপথ হতে কবির চেতনায় বড় হয়ে উঠেছেন এক বিষাদ-ময়ী নারী। সেই ম্লান বিষণ্ন নারীর রূপ দুচোখ ভরে দেখে নিয়ে ছবি এঁকেছেন কবি স্বয়ং—কিন্তু কবিতার প্রারম্ভিক ও অন্তিম উচ্চারণে আছেন নায়িকা নিজেই। এই ভাবসংস্থানগত বিচ্যুতি কবিতাটিকে যথোচিত সংযম ও ভারসাম্য দেয়নি, যদিও যথার্থ জীবনা-নন্দীয় কাব্যধ্বনি 'ঝরাপালকে'র পাঠক এখানেই প্রথম শুনে নেন। এই নারীকের আবার দেখি 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' 'পরস্পর' কবিতায়, 'বনলতাসেন'-এর 'শঙ্খমালা'য়। 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশপদীগুলিতে তাঁরই মুখমণ্ডলের প্রচ্ছায়া বিষাদ ও স্মৃতিভারাতুরতার এক অপরূপ রোমান্টিক আবহ রচনা করে দেয়।

'ঝরাপালক' থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসে জীবনানন্দের পাঠক

কবিকে আবিষ্কার করেন তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গী ও স্বকীয় শৈলীতে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র চিত্রের পর. চিত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বিষণ্ণ শীতার্ত নৈসর্গিক পৃথিবীর 'রূপ। সেই প্রাকৃতিক পটভূমিকায় প্রেম বারবার নিয়ে এসেছে এক রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাস। এ কাব্যের প্রথমতম কবিতা 'নির্জন স্বাক্ষর,' যেখানে এক পরিব্যাপ্ত নৈসর্গিক নশ্বরতার প্রেক্ষাপটে মানবিক প্রেম তার মৃত্যুহীনতার এমন দ্যোতনা আনে যা 'নক্ষত্রের আকাশ' কিম্বা 'সমুদ্রের জল' কখনও জানেনি। চারিপাশের সবুজ মাঠ ঘাস আর 'আকাশে আকাশে ছড়ানো' নীল আকাশ, ইন্দ্রিয়গোচর সব জাগতিক মাধুরিমার চেয়েও ঢের বড় বিস্ময় এই প্রেম :

কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে।
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

লক্ষণীয়, আদিপর্বের এই কবিতাটিতে জীবনানন্দ প্রেমকে জৈব নশ্বরতার ঢের উর্দ্ধে রেখেছেন। নিসর্গের যে সৌন্দর্য তা স্পষ্টতই ইন্দ্রিয়গোচর, সাম্মোহনীক। কিন্তু 'জীবনের রঙ, কবির প্রশ্ন, ফলানো কি হয় এইসব ছুঁয়ে ছেনে? উত্তরও তিনি দিয়েছেন :

'সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল—
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল।'

অর্থাৎ, প্রেমের আসন মানব-হৃদয়ের গভীরে—জৈব এবং ইন্দ্রিয়-গোচর রূপাবিষ্টতার চেয়ে বড় এই প্রেম। তাই, কবির অনুভবে, যদিও প্রকৃতির বুকে নিত্য নবীনের আনাগোনা, নতুন সময় আর নতুন নক্ষত্রের ভিড়, তবু 'কোনো এক মানুষীয় তরে' পুরোহিত হয়ে যে প্রেমের পূজাদীপ তিনি জ্বালিয়েছেন তার শিখা চির-অম্লান। এভাবেই প্রেম কবির চেতনায় জড় এবং জৈব অস্তিত্ব ও কামনার

ঊর্দ্ধে স্থিত এক অপরিবর্ত দিব্যসত্তায় মূর্ত হয়েছে ; এভাবেই কবি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন চিরআকাঙ্খিত অপ্রাপনীয়তার রোমান্টিক বোধ। প্রেমানুভূতির এই বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাকে আশ্রয় করেই 'নির্জনস্বাক্ষর' এবং ঐ জাতীয় আরও কয়েকটি কবিতায় ঘনীভূত হয়েছে বিষাদ ও স্মৃতিভারাতুরতার রোমান্টিক অনুষঙ্গ। জীবনানন্দ যখন বলেন, 'জীবনের স্বাদ লয়ে জেগে আছ—তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে পার তুমি' —তখনই আমাদের মনে পড়ে শেলী, কীট্স, হাইনে, হুগো, গতিয়েয়ের হোল্ডারলিন প্রমুখ রোমান্টিক কবিকুলের কথা যাঁরা প্রেমকে জেনেছিলেন এক অপ্রতিরোধ্য মরণাকর্ষ, এক চিরঅতৃপ্ত তীব্র আকাঙক্ষার স্বরূপে যার হাত থেকে প্রেমিকের কোনো পরিত্রাণ নেই। মৃত্যু ও জীবনের প্রবল বিষমানুপাতিক টানে দীর্ণ হতে হতেই যেন 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর নায়ক বলে ওঠেন :

আমি চলে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর পরে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।

জীবনানন্দের এ পর্যায়ের কবিতাবলীতে প্রেমের এই ক্ষণশাশ্বতী স্বরূপ কবিতার চরণে চরণে সঞ্চারিত করেছে আত্মদীর্ণ অনুভবের গাঢ়তা। প্রেমের যে লোকোত্তর মহিমার উপলব্ধি 'নির্জন স্বাক্ষরে'র নায়ককে শেষপর্যন্ত প্রত্যয়ী করেছে, ঠিক তার বিপরীত সংক্ষোভ 'সহজ', ১৩৩৩', 'কয়েকটি লাইন' প্রভৃতি কবিতায় নিয়ে এসেছে তীব্র, অপরিতৃপ্ত, বাসনার প্রহার, প্রেমের ক্ষণউদ্ভাসের বেদনা। এসব কবিতার নায়িকা নিতান্তই মানুষী, দেহবদ্ধ বাসনার প্রতিমা। এখানে পঙক্তির পর পঙক্তিতে ধ্বনিত ভালবাসার ক্ষণউল্লাস, নশ্বরতার বেদনা :

ক তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর।
খ একদিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে একরাত্রি দিতে পারে যত !

গ একদিন দিয়েছিলে যেই ভালবাসা,
ভুলে গেছ আজ তার ভাষা।

তবু ক্ষোভ, সংশয়, হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই কেবলমাত্র 'ধূসরপাণ্ডুলিপি'র প্রেমভাবনাকে বিশিষ্টতা দেয়নি, তারই পাশাপাশি আছে ভালবাসার চিরন্তনতার জন্য প্রেমিকের সেই ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা যা সর্বকালীন :

তুমি যদি রহিতে দাঁড়ায়ে।
নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু যদি তোমার দুপায়ে
হারায়ে ফেলিতে পথচলার পিপাসা।
একবার ভালবেসে যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি
সেই ভালবাসা।

জৈব দেহবদ্ধ বাসনার বিপরীত এই অনুভূতি দেহজ উপভোগের ক্ষণিক উল্লাসবোধ থেকে মুহূর্তের আনন্দকে উত্তরিত করে নিতে চায় চিরকালীন সম্পদে। তাই, জীবনানন্দের আদিপর্বের প্রেমকাব্যে কখনও কখনও যুক্ত হয়েছে বাস্তবতার অতিরিক্ত লোকোত্তরতার মাত্রা। কিন্তু, রচনারীতির কিছু অপস্রিয়মান মুদ্রায় এবং মানসিকতার কোনও কোনও পুনরাবৃত্ত প্রকাশে এ সময়কার কাব্যেও কল্লোলকালীন দেহবাদিতার ভাবানুষঙ্গ স্পষ্ট। তবু রোমান্টিক প্রেমকাব্যের বিশিষ্ট কুললক্ষণ যে নিয়তিতাড়িত আকাঙ্ক্ষার মরণাকর্ষণ, এবং তার বিপরীত মেরুতে আশ্রিত যে অতীন্দ্রিয় লোকোত্তর সৌন্দর্যের প্রতিভাস রোমান্টিক কবি তাঁর ঈপ্সিতা নারীর মধ্যে খুঁজে পান, অপ্রাপনীয় বলেই যা আকাঙ্ক্ষাকে করে নিরন্তর অচরিতার্থতায় তীব্রতর, জীবনানন্দের এ সময়কার প্রেমের কবিতাগুলিতে তার লক্ষণ আদৌ অপরিস্ফুট নয়।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাবলীর যে স্বতন্ত্র চেতনা ও আসক্তি বাংলা নিসর্গকাব্যে এক অশ্রুতপূর্ব ধ্বনিগভীরতা যুক্ত করেছে তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতে। এই

কবিতায় নিসর্গরূপের অজস্র উদ্ভাসন ও মাধুরিমার অনুপুঙ্খ ভাষ্যকার কবি পাঠকের আবিষ্ট দৃষ্টি আলেখ্য থেকে আলেখ্যান্তরে চালিত করে নিয়ে যান এক ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাসে :

জানিনা কি আহা
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ,

কামনার আগে 'রাঙা' বিশেষণ মৃত্যুর মুখ ধূসরতর করেছে এ চিত্রে ; সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'দেয়ালের মত' শব্দ দুটির আঘাতের ব্যঞ্জনা। যেন, এতক্ষণ যে আলোছায়ার খেলা হিজলের জানালা থেকে নেমে এসেছিল জ্যোৎস্নার উঠানে, বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাস আর নীলাভ নোনার বুকে আকাঙ্ক্ষায় গাঢ় হওয়া রস, ঘনান্ধকার বটের নিচে লাললাল ফল—পৃথিবীর মাসঋতু বৎসরের এই বর্ণাঢ্যতাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে কবিতাটিতে আর এক প্রচ্ছায়া —যেদিকে 'বিকেলবেলার ধূসরতায়' 'পৃথিবীর কঙ্কাবতী'কে কেড়ে নেয় 'অন্ধকার নদী' : 'পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর।' লক্ষণীয়, কি আশ্চর্য অনায়াস কল্পনায় একটি সহজ সরল গ্রাম্য নিসর্গচিত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়েই কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন তন্নিষ্ঠ নিসর্গবর্ণনার অতিরিক্ত অন্য ব্যঞ্জনার মাত্রা। বিকালের ক্রমক্ষীয়মান আলোয় নদীর উপর জমে ওঠা অন্ধকার আর তার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে-যাওয়া হারিয়ে-যাওয়া নারীর শরীর—এই অতিপরিচিত সাধারণ গ্রাম্যছবিটি থেকেই উঠে এসেছে মৃত্যুস্পৃষ্ট সৌন্দর্যের এক অপরূপ প্রতিমা—'ধূপের শরীর' পাওয়া পৃথিবীর কঙ্কাবতী নারী। 'কঙ্কাবতী' এই শব্দটির সুপ্রয়োগে লোককাহিনীর রূপসী নায়িকা বিয়োগান্তিক বেদনায় সর্বকালীন ও সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। তবু, সাধারণভাবে বলা যায়, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে জীবনানন্দের কাব্যের নায়িকারা সকলেই প্রবলভাবে মানবী ; সহজ বাসনায় বদ্ধ, ঈর্ষা ; বঞ্চনা, অবহেলা ব্যর্থতায় চরিত্রায়িত।

দেহাতীত প্রেমের দিব্যতা সেখানে ক্ষণিক বিদ্যুৎদ্যুতির মতই কথন কথনও আবির্ভূতমাত্র।

মৃত্যুর দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গ-নিবিষ্টতাে যেমন বিষাদঘন করেছে, তেমনই সেই মৃত্যুস্পৃষ্ট নিসর্গভূমিে আবির্ভূত হয়ে কবির প্রেমভাবনাও হয়ে উঠেছে মৃত্যু-আহত। পর্যায়ে জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম মরণজয়িতার অনুভবে বলশালী ন যতটা মরণার্ত নশ্বরতার বোধে পীড়িত। কবি জানেন, 'সূর্যের চে আকাশের নক্ষত্রের থেকে প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি'; এ মানুষের জীবন 'প্রার্থনার গানের মতন' হয়ে ওঠে 'তুমি আছ বা প্রেম'। তবু সেই সঞ্জীবনী—'সকল ক্ষুধার চেয়ে বড়, সকল শক্তি আগে' যে প্রেম সেও মৃত্যুর কাছে পরাহত :

> আমি শেষ হবো শুধু ওগো প্রেম, তুমি শেষ হলে।
> তুমি যদি বেঁচে থাক, জেগে রব আমি এই পৃথিবীর পর—
> যদিও বুকের পরে মৃত্যু রবে,—মৃত্যুর কবর।

এই সর্বায়ত মরণশীলতার বোধই কবিচেতনায় সঞ্চারিত করে নশ্বরতার বেদনা, ক্ষণ উল্লাসে অতৃপ্তি। একটির পর একটি কবিত 'সিন্ধুর-জল', 'সমুদ্রের ঢেউ' প্রেমের উপমেয় হয়ে আসে;

ক তুমি জল—তুমি ঢেউ—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন

খ জলের আবেগে তুমি চলে যাও—

কারণ ঢেউয়েরই মতন প্রেম চিরপলাতক, উদ্বেল, অস্থির; আব প্রত্যাবর্তিত হতে জানে 'স্মৃতির হাড়ের মাঠে—কার্তিকের শীতে'।

অতএব দেখছি, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা' পর্যা জীবনানন্দের প্রেমচেতনাও দুটি বিপ্রতীপ বিন্দুতে আবর্তিত একদিকে, প্রেমের ঐশ্বর্যময় আবির্ভাবের রোমহর্ষ নৈসর্গিক প্রেক্ষাপ মুদ্রিত :

> যখন সবুজ অন্ধকা
> নরম রাত্রির দেশ, নদীর জলের গন্ধ কোন এক নবীনাগত

মুখখানা নিয়ে আসে—মনে হয়ে কোনোদিন পৃথিবীতে প্রেমের আহ্বান
এমন গভীর করে পেয়েছি কি : প্রেম যে নক্ষত্র আর নক্ষত্রের গান,
প্রাণ যে ব্যাকুল রাত্রি প্রান্তরের গাঢ় নীল অমাবস্যার—
চলে যায় আকাশের সেই দূর নক্ষত্রের লাল নীল শিখার সন্ধানে,
প্রাণ যে আঁধার রাত্রি আমার এ—, আর তুমি স্বাতীর মতন
রূপের বিচিত্র বাতি নিয়ে এলে,—তাই প্রেম ধূলায় কাঁটায় যেইখানে
মৃত হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর শূন্যপথে পেল সে গভীর শিহরণ ;

অন্যদিকে, বিচ্ছেদকাতরতা, নশ্বরতার বেদনা, অচরিতার্থতার ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাস :

ক শরীরে ননীর ছিরি,—ছুঁয়ে দেখো—চোখা ছুরি,—ধারালো হাতির দাঁত !
হাড়েরই কাঠামো শুধু,—তার মাঝে কোনোদিন হৃদয় মমতা ছিল কই ! ['পরস্পর'/'ধূসর পাণ্ডুলিপি']

খ জানি তবু,—নদীর জলের মত পা তোমার চলে ;—
তোমার শরীর আজ ঝরে
রাত্রির ঢেউয়ের মত কোনো এক ঢেউয়ের উপরে !
যদি আজ পৃথিবীর ধুলোমাটি কাঁকরে হারাই,
যদি আমি চলে যাই
নক্ষত্রের পারে,—
জানি আমি তুমি আর আসিবে না খুঁজিতে আমারে !
['১৩৩৩'/ধূঃ পাঃ]

গ জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে
আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়, আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ ম্লান চুল

এই নিয়ে খেলা করে : জানে সে যে বহুদিন আগে আমি
করেছি কি ভুল
পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে,
[রূপসী বাংলা]

চিরঅলভ্য প্রেম আর চিরঅতৃপ্ত হৃদয় উভয় মিলে রচনা করেছে জীবনানন্দের প্রথম পর্যায়ের কাব্যে স্মৃতিভারাতুরতার এমন আবহ যা স্বাভাবিকভাবেই রোমান্টিক কাব্য ঐতিহ্যের ধারায় আশ্রিত।

রোমান্টিক প্রেমকাব্যের নায়িকা নিষ্ঠুরা মোহিনী ; 'লা বেল্ দাম সাঁ মের্শি' (অকরুণা এক রূপসী)। সেই 'ফাম্ ফাতাল' বা সর্বনাশীর প্রতি রোমান্টিক কবি অনুভব করেছেন অপ্রতিরোধ্য নিয়তিতাড়িত জৈব-বাসনা-সংরাগক্ষুব্ধ মৃত্যু-আকর্ষণ। সেই তীব্র একাগ্র আকাঙ্ক্ষা আপন অতৃপ্তি থেকে রচনা করেছে এমন এক অধরা মোহিনী-প্রতিমা যা কাম্য তবু অপ্রাপণীয়, চিরঅধরা তাই দিব্য। এভাবেই দেহজ বাসনায় প্রোথিত থেকেও শেষপর্যন্ত শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যে প্রেম হয়ে উঠেছে দেহাতীত দিব্য এক অন্বিষ্টের প্রতীক—ঈপ্সিতা নারী সেখানে মানবাত্মার চিরন্তন সৌন্দর্যপিপাসার গরীয়সী দেবী। মনে করা যাক শেলীর সেই বিশ্রুত পঙক্তিগুলির কথা :

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something after
From the sphere of our sorrow ?

রোমান্টিক প্রেমকাব্যের মূল্য ও মহিমার শিখরস্পর্শী তাৎপর্য এই চরণগুলিতে অভিব্যক্ত। এখানে উষার পশ্চাতে ধাবমান রাত্রির চিত্রকল্পে এক নিরবচ্ছিন্ন একাগ্র অন্বেষার কথা উচ্চারিত যা কিন্তু নিয়তিতাড়িত সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করছে প্রথমচরণের 'বহ্নিমুখ-বিবিক্ষু' পতঙ্গের উল্লেখে। আবার, এ সব কিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে

উঠেছে অতীন্দ্রিয় দেহাতীত ব্যঞ্জনা : কারণ, শেলী লিখলেন না অগ্নিশিখার প্রতি ধাবমান পতঙ্গের কাহিনী, নিয়ে এলেন নক্ষত্র-আলোকমুখী পতঙ্গের চিত্র যা শেষ দুটি চরণে আরও বিস্তারিত, ব্যাখ্যাত হয়েছে : প্রেম যেন এক অমর্ত্য আকাঙ্ক্ষা যা আমাদের শোকদুঃখপীড়িত এই ভূলোক থেকে উত্তীর্ণ করে নেয় অন্য এক জগতে, অন্যতর মহত্তর অনন্যমুখী অন্বেষায়। একদিকে স্পর্শগন্ধময় এই নশ্বর মর্ত্যভূমির সহস্র আকর্ষণ আর সহস্র প্রহারে ধূলিম্লান মানবহৃদয়ের আকুতি, অন্যদিকে মরণাতীত দিব্য-সৌন্দর্যের প্রতিভাস ভালবাসায় ঐশ্বর্যময়ী এক নারীর প্রতিমায়—দেহ ও দেহাতীত, ইন্দ্রিয়গোচর ও অতীন্দ্রিয় এই দুই বিপ্রতীপ টানে রোমান্টিক প্রেমকাব্য গভীর ব্যঞ্জনাবহ।

জীবনানন্দ দাশ সময়ের দিক থেকে আধুনিককালের কবি। তবু কবিচেতনার নানা লক্ষণে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতাগুলিতে রোমান্টিক ভাবনার স্পষ্ট স্বাক্ষর লক্ষ্য না করে উপায় নেই। অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতাগুলি খুঁজে নিতে আমাদের পেরিয়ে আসতে হয় তাঁর কাব্যের আদিপর্যায়—'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা'র মানসিকতা—পৌঁছাতে হয় মধ্যপর্যায়ে 'বনলতাসেন'-সমকালীন কবিতাগুচ্ছে যার অনেকটাই উদ্ধৃত হয়েছে সিগনেট সংস্করণ 'বনলতাসেন' গ্রন্থটিতে। তবু, তার আগেই. রোমান্টিক প্রেমভাবনার কিছু কিছু সর্বকালীন বিশিষ্টতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগেও অনুপস্থিত নয় তাঁর কাব্যে। আমরা দেখেছি, নৈসর্গিক ক্ষয়বিলয়ের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত প্রেম তাঁর এ'সময়কার রচনায় মৃত্যুস্পৃষ্ট এক বেদনার উৎসার; আবার নশ্বরতার নিয়তিকে অতিক্রম করে সম্ভোগের ক্ষণ-উল্লাস খুঁজে পেতে চায় শাশ্বতের অভিজ্ঞান। মুহূর্তের মধ্যে চিরন্তনকে ধরার আকুতি, দেহজ রমণীয়তাকে কেন্দ্র করে বৈদেহী সৌন্দর্যের রহস্যময়তার উদ্ভাস—এ সব কিছুই উনিশশতকী রোমান্টিক মানসচেতনার মনোবীজ বহন করছে।

লক্ষণীয়, জীবনানন্দের আধুনিক মন সনাতন দেশজরীতিতে

প্রেমকে কামগন্ধহীন কোনও 'নিকষিত হেম' প্রমাণে তিলমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। দেহ এবং সম্ভোগের উল্লাসানুভূতি দুই-ই তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। 'পিপাসার গান'-এর মত কবিতায় জীবনানন্দ কোনরকম সংশয়ের অবকাশ না রেখেই বলেন 'দেহের পীড়নে / সাধ মোর—চোখে ঠোঁটে চুলে / শুধু পীড়া—শুধু পীড়া'। আবার, 'নারীর অধরে / চুলে চোখে—জুঁয়ের নিঃশ্বাসে / ঝুমকোলতার মত তার দেহ ফাঁসে' একদিন কবি 'রক্তমাংসের স্পর্শ-সুখভরা' 'পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা' জেনেছেন। কিন্তু তখনকারমত রোমান্টিক ভাবনাদীপ্ত এই কবির চেতনা কোনও জৈব বাসনা কি দেহোল্লাসকেই প্রেম বলে চিহ্নিত করেনি ; আরও পরিণত ভাবনায় উচ্চারিত হয়েছে : 'দেহ ঝরে—তার আগে আমাদের ঝরে যায় মন'। এই 'মন'ই তাঁকে শিখিয়েছে জৈবতা-অতিরিক্ত সংবেদ : 'এ জীবন ইহা যাহা, ইহা যাহা নয়' ; এবং সেই বোধের নিরন্তর অনুভাবনাতেই তাঁর কাব্য আধুনিক। আসলে জীবনানন্দের কবিতায় প্রেম কোনও দেহবাদী প্রতিন্যাসেই আবদ্ধ থাকেনি, যদিও কাব্যসাধনার শিক্ষা-নবিশীযুগে তিনি ছিলেন মোহিতলাল, নজরুল প্রমুখের শৈলী ও বিষয়গত অনুকারী। দেহসর্বস্ব দেহবাদিতা জীবনানন্দকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেনি বলেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে তাঁর কাব্যে শোনা যায় দেহকে স্বীকার করে নিয়ে উচ্চারিত বৈদেহী প্রার্থনা : 'সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে নিয়া / তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া'। তবে, সেই সঙ্গে একথাও অবশ্যমান্য যে এ সময়ে তাঁর কাব্যে প্রেমের অতীন্দ্রিয় দেহাতীত উপলব্ধি ক্ষণভাসিতমাত্র। স্বপ্নপ্রয়াণের অন্তিম আবেদন-সত্ত্বেও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেম ঐহিক অস্তিত্বের সীমারেখা প্রবলভাবে লঙ্ঘন করেনি। কারণ, জীবনানন্দ জেনেছেন :

> নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
> পথ ভুলে পৃথিবীর পথে
> জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল। ('স্বপ্নের হাতে'/ধূঃ পাঃ)

'জন্মিতেছি' এই ক্রিয়াপদটির অনবদ্য প্রয়োগে অন্তহীন ও প্রবহমান মানব জীবনধারার ইঙ্গিত, যেখানে একের 'পিপাসার ধার' অন্যের বুকে জাগিয়ে তুলছে বারবার 'প্রেমের পিপাসা'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নায়িকা তাই শেষাবধি এক মর্ত্যনারীই থেকে যান- -যাঁর 'চোখে ঠোঁটে অসুবিধা ভিতরে অসুখ'। কবিরা যে রূপসীর কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন তাঁদের কাব্যে, তিনি এক রূপকথার নায়িকা : 'আমরা সাধিয়া গেছি যার কথা—পরীর মতন এক ঘুমানো সে মেয়ে' ; কিন্তু জীবনানন্দ যার কথা আমাদের শোনালেন, সে—

এ ঘুমানো মেয়ে
পৃথিবীর,—ফোঁপরার মত করে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে।

তাই, শেষপর্যন্ত, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেম লৌকিক বাসনাসংরাগে মথিত মৃত্যুআহত সৌন্দর্যানুভূতির বিষণ্ণআবহ রচনা করেছে যা একান্তভাবেই মর্ত্যমুখীন :

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব পৃথিবীর থেকে
রূপ ছেনে তখনও হৃদয়ে কোনও আসে নাই ক্লান্তি অবসাদ
('পৃথিবীতে থেকে' / ধূঃ পাঃ)

এমনকি সব আহত ব্যর্থতার গ্লানিও উত্তীর্ণ এই নিবিড় মর্ত্যপ্রাণ রূপপিপাসায় :

তুমি প্রেম দাও নাই—জানি আমি—তবুও রক্তাক্ত
কোনও রেখা
সোনার ভাঁড়ারে আমি রাখি নাই শীতমধু মোমের সঞ্চয়ে,
কুয়াশা হতাশা নিয়ে সরে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে ;

যে অগাধ ইন্দ্রিয়মগ্ন সৌন্দর্য উপলব্ধি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—'রূপসী বাংলা'র নিসর্গবর্ণনায় সঞ্চারিত করেছে আঞ্চলিক স্বাদ আর অনুপুঙ্খতার রমণীয় জাদু তাই যেন জীবনানন্দের এ সময়কার প্রেমের কবিতায় যুক্ত করেছে এক গভীর বিস্ময়বোধ :

তোমারে দেখেছে ভালোবেসেছে অনেকে
তাহাদের সাথে আমি—আমিও বিস্ময় এক পেয়েছি যে টের
গভীর বিস্ময় এক শুধু তার ম্লান হাত-চুল—চোখ দেখে।

এই বিস্ময় বোধেই কবি বলে ওঠেন :
তোমার মুখের রূপ নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে তোমার শরীরে
তাইতো মসৃণ তুলি হাতে লয়ে জীবনেরে এঁকেছি এমন
অনেক গভীর রঙে ভরে দিয়ে, চেয়ে দেখ ঘাসের শোভা কি
লাগেনি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে।

এই অশ্রুতপূর্ব উচ্চারণের পর 'প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেম' বলে জীবনানন্দ কি বোঝাতে চেয়েছেন তার আর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়না।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে জীবনানন্দের কাছে প্রকৃতিই ছিলেন সমস্ত প্রতীকের জননী; 'মেঠো চাঁদ, শিঙের মত বাঁকা চাঁদ', 'কার্তিকের মাঠ' কিংবা 'পেঁচা' তাদের নিজস্ব নৈসর্গিক পরিমণ্ডলের অতিরিক্ত কিছু দ্যোতনায় কবিতার ভাববস্তুতে সঞ্চারিত করেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। 'বনলতাসেন' পর্যায়ে প্রতীকায়নের সেই প্রবণতা আরও প্রবল ও পরিণত এবং বিষয়ের সঙ্গে গাঢ় সাযুজ্যে উপস্থাপিত। এ পর্যায়ে প্রতীক আর শুধুমাত্র কিছু নৈসর্গিক উপকরণের মধ্য দিয়ে শব্দের অভিধার অতিরিক্ত মাত্রাযোজনার কারণ হয়নি; প্রায়শই তা বিষয় বা ভাববস্তুর উপস্থাপনার মধ্য হতেই উৎসারিত। প্রতীকী রীতির এই নবপ্রসৃতি অনেকগুলি কবিতার নামকরণেই আভাসিত। 'বনলতা' এই নামের মধ্যেও যে এক নিসর্গপ্রতিম নারী উপস্থিত তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি; প্রেম ও প্রকৃতি এ' কবিতাটিতে এক অভিন্ন প্রতিমায় উপস্থিত হয়ে কবিতার ভাববস্তুতে যোগ করেছে তাৎপর্য-গভীরতা। আর, সেইভাবে গৃহীত হলেই কবিতাটি যথার্থ

অর্থময় হয়ে ওঠে। 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে বা জীবনানন্দের সেই সময়ের অন্য রচনায় প্রেম প্রকৃতির শোভাভূমিকায় উপস্থিত শুধুমাত্র এটুকু বললে তা অর্ধসত্যের মত শোনাবে। 'বনলতাসেন' গ্রন্থের কবিতাবলীতে নারী এসেছেন বারবার নানা মূল্যবোধের আধারিকারূপে। প্রকৃতির প্রশান্তির সম্ভার নিয়ে 'বনলতাসেন' অপেক্ষা করে আছেন অন্বেষাক্লান্ত মানবাত্মার জন্য। 'সুরঞ্জনা', 'সুদর্শনা', 'সুচেতনা', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কবিতার বাহিরের আয়োজনে কোনও নারী, কোনও মানবীর প্রেম বিষয়ীভূত বলে মনে হলেও নিবিষ্ট অনুধাবনে এসব কবিতার প্রতীকী আবরণ উন্মোচিত হয়ে যায়। দেখা যায়, মানব-জীবনের কোনও না কোনও অভীপ্সার শক্তি ও প্রেরণা এখানে নারীর প্রেমের রূপকে আশ্রিত ; নারী হয়ে উঠেছেন প্রতীক। 'সুরঞ্জনা' কবিতায় 'সুরঞ্জনা'কে সম্বোধন করে কবি মানবহৃদয়ের দুর্মর প্রেমবাসনাকেই তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন এবং তাকে ইতিহাস-চেতনায় জারিত করে নিয়েছেন ('সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো')। কিম্বা 'সুচেতনা' কবিতাটিতে পৃথিবীর গভীরতর অসুখের যুগে মানবহৃদয়ের সুচৈতন্য তথা সুস্থ চেতনা দূরতর দ্বীপের অবসিতপ্রায় প্রতীকে এই কথাটিই কবি জানাতে চেয়েছেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা' পর্যায়ের প্রেমের কবিতাবলী থেকে 'বনলতাসেন'-এর অন্তর্ভুক্ত প্রেমবিষয়ক কবিতাবলীর স্বাদ তাই ভিন্নতর। পূর্ব পর্যায়ের কাব্যের অনুপুঙ্খ চিত্রায়নের অবিরল প্রবাহের পরিবর্তে এ পর্যায়ের কবিতায় এসেছে মিতভাষণ আর প্রতীকী ব্যঞ্জনার নবীন বিস্তার। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবির ভূমিকা এক মুগ্ধ আবিষ্ট দর্শকের ; প্রকৃতির ক্ষয় বিলয়ের পটভূমিতে তাঁর সেই 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' রূপান্তরিত হয়েছে বিষণ্ন সংবেদনায়। ধূসর ম্লান হিমার্ত নিসর্গজগতে আবির্ভূত হয়ে প্রেম সেখানে বহন করে এনেছে 'বঞ্চনা, হতাশা ক্ষোভ, যন্ত্রণার বিষ'। প্রেমের মৃত্যুহীনতার কথা সেখানেও আছে, আছে তার অমর্ত্যপ্রসাদ

আর ক্ষণভাসিত উল্লাসের কথাও।' কিন্তু অপ্রাপনীয়ের জন্য আর্তি আর বঞ্চিত প্রেমের সংক্ষোভই সেখানে প্রবল, নেই কোনও গাঢ় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বাণী। 'বনলতাসেন' পর্যায়ে প্রেম আরো বড়, আরো গভীর চেতনার আলোকে মূল্যায়িত। নিসর্গ তাঁর একালের কাব্যে[১] শুধুমাত্র প্রেক্ষিতই রচনা করেনি, হয়ে উঠেছে জীবনের মূলাধার। ফলে 'বনলতাসেন' গ্রন্থটিতে ও পরবর্তীকালের অনেক কবিতায় বহুসময়েই জীবনানন্দের প্রেমভাবনা প্রকৃতিলীন এক জৈবিক অস্তিত্বের চেতনায় নিরাপত্তা ও শাস্তি খুঁজেছে।[২] আবার, জায়মান এক ইতিহাসচেতনায় এ সময়কার কাব্যে প্রেম এক স্থির প্রতিশ্রুতির স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, পরিণত হয়েছে প্রশান্ত বিশ্বাসদীপ্ত উপলব্ধিতে। ফলে, কবিতার পর কবিতায় প্রেম আবির্ভূত এক গাঢ় আবেগার্দ্র উচ্চারণে।'

এ পর্যন্ত জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম-প্রতিবোধের প্রকাশনায় সংবেদনা ও মননের নবীন বিস্তারের কথাই বলেছি। 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতায় ভাবের প্রকাশ-মাধ্যমগুলিকেও জীবনানন্দ নূতন শক্তি ও ব্যঞ্জনায় সঞ্জীবিত করেছেন। ঠিক যতটা অংশে মাধ্যম বা রীতির নবীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য বিষয়বস্তুকে এ যাবৎ দুর্লক্ষ্য কোনও ব্যঞ্জনা ও শক্তিতে চিহ্নিত করে ততটাই তা আমাদের বর্তমান আলোচনার অংশভুক্ত হবার দাবী রাখে। তেমনই একটি প্রসঙ্গ : 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে প্রতীকের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও তাৎপর্যময়তা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত জীবনানন্দের বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহে এই প্রতীকী তাৎপর্যের উপস্থিতি ও তার উপলব্ধি কাব্যের অর্থ-অনুধাবনের বিশেষ সহায়ক। 'সুচেতনা'কে সম্বোধন ('সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ') করে

১। 'বনলতাসেন'-'মহাপৃথিবী' পর্যায়ের কাব্যের রচনাকাল ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫—৪৮ সন; কবির নিজের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী। দ্রষ্টব্য : মহাপৃথিবী ১ম সং ভূমিকা।

২।· 'আমি যদি হতাম' ও 'হাস' কবিতা দুটি দ্রষ্টব্য।

এজাতীয় উচ্চারণের অর্থোদ্ভাস কোনও রসবেত্তা পাঠকের কাছে গোপন থাকে না। কিন্তু কেন জীবনানন্দ বিশেষ করে নারীকেই বেছে নিলেন মানুষের চেতনানিহিত কোনও মূল্যবোধ তথা প্রেরণা-শক্তির বিমূর্ত উপস্থিতিকে তাঁর কবিতায় একটি অবয়ব দিতে, কেন কোনও মানবীর প্রেমের সাঙ্গীকরণে রূপায়িত করলেন মানবসভ্যতার সম্মুখ-যাত্রার অন্তর্জাত শক্তিরূপী মূল্যবোধগুলি—এসব প্রশ্নও স্বাভাবিক। উত্তরে বলা যায়, সৌন্দর্য ও কল্যাণের সমাহারে নারী মানবহৃদয়ের চিরআদরনীয়া; তার আকাঙ্ক্ষার অভীষ্ট, যেমন মানবমনের মূল্যবোধগুলি ইতিহাসের ঘনঘটায় কখনও কখনও দুর্নিরীক্ষ্য হলেও চিরন্তন, নাবিকের কাছে সৈকতের সত্যের মত, ধ্রুবতারকার মত অকম্প্র ও দিশারী; আবার প্রেমেরই মত তারা যন্ত্রণাহত ও মৃত্যুস্পৃষ্ট হয়েও দুর্মর ও চিরজীবিত। জীবনানন্দের এ' পর্যায়ের কবিতায় নারী শুধু তাঁর সৌন্দর্যরূপেই আবির্ভূতা নন, তিনি এসেছেন তাঁর কল্যাণস্বরূপে। তাঁর নারী-নায়িকাদের সকলের নামের আগেই তাই 'সু' শব্দটি উপস্থিত ['সুদর্শনা,' 'সুরঞ্জনা,' 'সুচেতনা']।

নারীর প্রেমের রূপককে আশ্রয় করে কবিতাবস্তুর এই প্রতীকী বিস্তার ['বনলতাসেন' পর্যায়ে] জীবনানন্দের প্রেমচেতনায় নবীনতার স্বাদ ও তাৎপর্য সংযুক্ত করলেও বাঙলাকাব্যের পূর্বঐতিহ্যে তা একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। মনে করা যেতে পারে 'মহুয়ার' সেই 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছ: শ্যামলী, কাজলী,জয়তী, উষসী, করুণী ইত্যাদি কবিতাগুলি লঘুভার হলেও এসব রচনায় নারীর ভাবরূপের এক একটি দিক চিহ্নিত এবং সেই ভাবানুযায়ী নামে নায়িকা সম্বোধিত। এভাবেই কোনও অব্যবহিত প্রয়োজনে রচিত হয়েও কবিতা সেই প্রয়োজনের বাস্তব সীমারেখা অতিক্রম করে যায়:

> সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব
> নিখিলের অস্তিত্ব গৌরব।

অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
নিদ্রাহীন আলো
কি অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলালো।
যুগে যুগে কি অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে ওই চক্ষে ওই হাসিটিতে।[৩]

রবীন্দ্রনাথের হাতে যা ছিল বিমূর্ত ভাববস্তুর রূপাধার, জীবনানন্দের কাব্যে সেই রীতিতে সংযুক্ত হল প্রতীকী দ্ব্যর্থকতার অতিরিক্ত মাত্রা। রূপকায়নের মধ্যে অর্থের সমান্তরাল সাযুজ্য বা বিস্তার অনেক সময়েই আরোপিত বা যুক্তিধৃত, তাই কৃত্রিম বলে মনে হয়। জীবনানন্দের আধুনিক শিল্পী-মনস্কতা সেই রীতিগত কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে প্রতীকের গহনতা ও অভেদে। কবিতার বহিরঙ্গের আয়োজন তিনি সম্পূর্ণ করেছেন বাস্তবের পরিচ্ছদে; কিন্তু তার অন্তরঙ্গ আবেদন এই বাইরের বেশ খুলে ফেলেই মেলে ধরে শব্দের প্রতীকী রহস্য-গভীরতা ও ভাবতাৎপর্য। তাঁর নারী-নায়িকাদের নামের সঙ্গে জীবনানন্দ কখনও যুক্ত করেছেন পদবী ('সেন,' 'সান্যাল,' 'ঘোষাল'), কখনও বা আঞ্চলিকতার আবহ ('নাটোরের বনলতাসেন')। এসবই কিন্তু এসেছে শিল্পরূপসিদ্ধির সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে। প্রতীককে একটি নাতিস্পষ্ট যাথার্থ্য দেবার প্রয়োজনেই যেন কবিতার ওপরে বিস্তৃত রাখা হয়েছে বাস্তবিকতার একটি আবরণ।

রবীন্দ্রনাথ 'শক্তির মহিমা'কে নারীর চোখ, মুখ, ও হাসিতে, এক কথায় নারীর আবয়বিক রূপের সীমায়, প্রকাশিত হতে দেখেছিলেন।

৩। 'সৃষ্টিরহস্য': মহুয়া: রবীন্দ্রনাথ

জীবনানন্দ মানবের চৈতন্যগত শুভবোধ বা প্রেরণাগুলির 'কল্যাণ-শক্তি ও ঐশ্বর্য নারীর প্রতীকে উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর 'সুরঞ্জনা', 'সুচেতনা', 'সুদর্শনা,' 'বনলতা,' 'শ্যামলী', 'সবিতা'রা তাই কেউ রক্তমাংসের মর্ত্যমানবীমাত্র হয়েই কবিতার পর কবিতায় উপস্থিত হননি. এনেছেন যথাক্রমে মানবহৃদয়ের দুর্মর প্রেমবোধ, শুভচেতনা, সৌন্দর্যপিপাসা, আদিম নিসর্গমুখিনতা, মানবেতিহাসের অন্তর্লীন যৌবন-অভীপ্সা ও প্রেমের সৌর-প্রেরণার ব্যঞ্জনা। এইসব কবিতার অর্থবোধ সহজতর হয় এবং যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড়ায় যখন আমরা কবিতার এই প্রতীকী ব্যঞ্জনার দিকটি সম্পর্কে অবহিত থাকি। এই কবিতাগুলির পূর্ণতর ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র অভিনিবেশের দাবী রাখে, যা এই পর্যালোচনার বর্তমান ধারার পক্ষে প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে বলেই অন্তত এইখানে সে চেষ্টায় বিরত থাকাই উচিত মনে করেছি।

প্রেমচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতাই রোমান্টিক ভাবাদর্শের চারিত্র্যচিহ্নিত। এক পরিপূর্ণ জীবন ও সৌন্দর্যজগতের কল্পনা, সেইজগতে প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষা এবং অনুষঙ্গী অপ্রাপনীয়তার বোধ, স্মৃতিভারাতুরতা ও বিষাদ, মধ্যযুগীয় গরিমা ও সৌন্দর্যের জগতে বিচরণ এবং তার লুপ্ত জীবনৈশ্বর্যের বোধন—এই সমস্ত চেতনালক্ষণ জীবনানন্দের একালের কবিতাবলীকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

স্মৃতিভারাতুরতা ও ব্যর্থতার বিষাদ 'কুড়ি বছর পরে' 'দুজন' 'অঘ্রাণপ্রান্তরে' কবিতাগুলিতে নিজস্ব জীবনানন্দীয় আমেজ সঞ্চার করেছে। 'দুজন' ও 'অঘ্রাণপ্রান্তরে' কবিতা দুটি দীর্ঘ অক্ষরবৃত্তের চলনে, হৈমন্তিক নিসর্গ-পটভূমির বিস্তারে, চিত্রকল্পে ও ধ্বনির নানা অনুষঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ক্ষয়িষ্ণু নিসর্গ-সৌন্দর্যের জগতের স্মৃতি বহন করে। তবে, এখানে আর শুধু 'চিত্ররূপময়' প্রাকৃতিক পটভূমিতে 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ'ই শেষ কথা নয়; তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল মানবিক অনুভাবনার মাত্রা :

অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে,
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু,[৪]

এখানে অঘ্রাণ প্রান্তর আর ঘাসের ভিতরে পড়ে থাকা শুকনো ছেঁড়া পাতা যেন নিষ্প্রেম হৃদয়েরই শূন্য প্রান্তর আর-'জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি'র ভাববহ। মেজাজের দিক থেকে 'কুড়ি বছর পরে' কবিতাটিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ভাবানুষঙ্গ নিয়ে আসে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেমিক পঁচিশ বছর ঈপ্সিতা নারীর প্রতীক্ষায় কাটিয়ে শীতের শিশির ভেজা মাঠে পাখির ঠাণ্ডা কড়কড়ে ডিম, নষ্ট শাদা শসা, ছেঁড়া মাকড়ের জাল দেখতে দেখতে ব্যর্থ ক্লান্তিতে বলেছেন : 'পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে'—নারী তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখেননি। 'কুড়ি বছর পরে' কবিতার নায়ক কার্তিকের শস্যরিক্ত নৈশপ্রান্তরে পাঠককে ডেকে নিয়ে এসে হঠাৎ স্মৃতিবিস্মৃতির সরু আলপথে দাঁড় করিয়ে দেয় যখন শিরীষের ডালপালার ফাঁকে মধ্যরজনীর চাঁদ উঁকি দিয়ে যায়। তখন কবির সঙ্গে পাঠকও অনুভব করেন স্মৃতিমথিত আবেগ :

"জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার।"[৫]

যে তিনটি কবিতার কথা এতক্ষণ উল্লেখ করেছি তার কোনোটিই কিন্তু জীবনানন্দের প্রেমচেতনার কোনও নতুন দিকনির্দেশ করে না; প্রকৃতির শোভাভূমিকায় তারা মানবিক প্রেমকে উপস্থাপিত মাত্র করে প্রায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের কবিতাবলীরই মত। তবু, কবির নিজেরই কথায়, 'হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে সেখানে মানুষ / আশ্বাস খুঁজেছে এসে'। এই 'সেখানে' অবশ্যই নিসর্গের বিলয়ধূসর রূপের জগৎ, যেখানে "ঝরিছে মরিছে সব—বিদায় নিতেছে

৪। অঘ্রাণ প্রান্তরে : বনলতাসেন।
৫। কুড়ি বছর পরে : বনলতাসেন।

ব্যাপ্ত নিয়মের বলে'। 'দুজন'[৬] কবিতার নায়কনায়িকাকে কবি ডেকে এনেছেন প্রকৃতির হৈমন্তিক বিষণ্ণতার জগতে, কারণ হেমন্তের শস্যহীন মাঠের সঙ্গে প্রেম-অবসিত মানবহৃদয়ের সার্থক সাযুজ্য তিনি অনুভব করেছেন : 'আজ এই মাঠসূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে / প্রাণ তার ভরে গেছে'। এই 'দুজন' কবিতাটির কয়েকটি উচ্চারণই পাঠককে সচেতন করে তোলে জীবনানন্দের প্রেমভাবনায় নবনীত মনন-রূপটির দিকে। কবির কাছে 'পৃথিবী ও আকাশ', অর্থাৎ নিসর্গভুবন 'চিরস্থায়ী'। মানুষের মনোজগতে ভালবাসার জন্মমৃত্যুর চঞ্চল নশ্বরতার পাশে প্রকৃতির শান্তি ও সান্ত্বনার অপরিবর্তনীয় আশ্বাসের বাণী এখানেই যেন প্রথম উঁকি দিয়ে যায়। আবার, এই কবিতায় নায়িকা যখন বলে ওঠেন 'আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না / হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের',—কিম্বা তাঁর প্রেমিকের যখন মনে হয় 'এই নারী অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে' যেখানে 'অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতাকে' খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রেমের সেই চিরন্তন দিব্যতার আদর্শ যা এক অপ্রাপনীয়ের সৌন্দর্যমূর্তি ঘিরে উৎসারিত হয়েছে রোমান্টিক কাব্যের দেশকালনিরপেক্ষ সম্ভারে।

জীবনানন্দের কল্পনা এবং চেতনায় ('বনলতাসেন' গ্রন্থটিতে বা সেই পর্যায়ের কাব্যে) নিসর্গ শুধু সৌন্দর্যের জগৎ নয়; শান্তি ও নিশ্চিতির এক আশ্রয়ভূমি। এই পরিবর্তিত চেতনাভূমির ওপরই কবির প্রেমভাবনা নবাঙ্কুরিত হয়েছে মননোজ্জ্বলতায় এবং ইতিহাস-বেদী বিশ্বাসে। 'শুদ্ধ প্রতর্কের ইঙ্গিত' (বা সংশয়বাদী মনন) এবং 'চতুর্দিককার প্রতিবেশ-চেতনা' কিভাবে কবিকল্পনায় সঞ্চারিত হয়ে তাকে পরিণতি ও সারবত্তা দেয় সে প্রসঙ্গে জীবনানন্দের অভিমত 'কবিতার কথা' নিবন্ধে অভিব্যক্ত। সেই মনন ও প্রতিবেশচেতনার

৬। 'দুজন'—বনলতাসেন।

অভিঘাত পরোক্ষে ধারণ করেছে তাঁর একালের কাব্য। চতুষ্পার্শ্বের বিরুদ্ধ বাস্তব, খণ্ডচৈতন্যের গ্লানি ও অপূর্ণতা থেকে প্রেম এক পূর্ণতর জীবন-অভিজ্ঞতার আস্বাদ ও আশ্রয় খুঁজেছে নিসর্গের জৈব প্রাণরঙ্গে। নিসর্গের নিবিড় নিরবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের মধ্যে আত্ম-নিমজ্জনের অভীপ্সা 'আমি যদি হতাম' ও 'ঘাস' এই দুটি কবিতায় অভিব্যক্ত। 'ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে' জন্মানোর যে ঈপ্সা কবির চেতনায় ধ্বনিত তারই স্পষ্টতর, সরলতর প্রকাশ ঘটেছে 'আমি যদি হতাম'-এর মত রোমান্সধর্মী কবিতায়। এ কবিতার বিষয় প্রেম, প্রেক্ষিত প্রকৃতি। প্রেম এখানে মুক্তি ও শান্তির আশ্রয় খুঁজছে নিসর্গলোকে, মনুষ্যভিন্ন অস্তিত্বের প্রকৃতিলীন জৈব সম্পূর্ণতার মধ্যে : 'কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে ধানক্ষেতের কাছে / ছিপছিপে শরের ভিতরে / এক নিরালা নীড়ে'। বনহংসমিথুনের জৈব প্রাণোল্লাস প্রতীকের অন্তরাল থেকে আভাসিত করে নিসর্গ-জীবনপ্রবাহের মধ্যে নিমজ্জনে কিভাবে কবির চেতনা খুঁজছে বাধাবন্ধ-হীন জীবনের প্রণয়োল্লাস। কবি জানেন নিসর্গজীবন নানা মারণ-আকস্মিকতায় ভরা, যে কোন মুহূর্তে নেমে আসতে পারে মৃত্যুর যবনিকা : 'হয়তো গুলির শব্দ আবার, আমাদের স্তব্ধতা, আমাদের শান্তি'। তবু সেই জীবনই কবির অভিপ্রেত ; কারণ সেখানে মানুষের জীবনের 'টুকরো টুকরো মৃত্যু', 'টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার' নেই। এভাবেই মানুষের আধুনিক জীবনের ক্ষুদ্র খণ্ডত্বের বিপরীতে নিসর্গলীন অস্তিত্বের সপ্রাণ পূর্ণতার বাণী 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থেই পরিণত মননের আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কাব্যরূপ নিয়েছে। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সংবেদিতার মধ্য দিয়েই প্রকৃতি জীবনা-নন্দের একালের কাব্যে তার ঐশ্বর্য অবারিত করেনি, নিয়ে এসেছে পূর্ণতর মনন অভিজ্ঞতায় লব্ধ এক নিশ্চিতি, অখণ্ড পরিপূর্ণ অস্তিত্বের বোধ ও প্রশান্তির আশ্বাস। মানবের ইহজাগতিক অস্তিত্বে নিসর্গের এই নবমূল্যায়িত মহিমার পরিপ্রেক্ষিতেই এ পর্বে প্রেমের আবির্ভাব

এমন উজ্জ্বল। 'বনহংস-মিথুন', 'বুনোহাঁস', 'হরিণ' হয়ে উঠেছে এক মুক্ত, নির্বাধ, পূর্ণতর প্রেমবাসনার প্রতীক। বুনোহাঁসের প্রতীকটি একই সঙ্গে বন্য জৈব কামনা ও বাধামুক্ত বাসনার উল্লাস আভাসিত করে বুনোহাঁস তখনই পাখা মেলে যখন 'পেঁচার ধূসর পাখা' উড়ে যায় 'নক্ষত্রের পানে'। পেঁচা এখানে বিচক্ষণতা, বুদ্ধি বা সংস্কার-আশ্রিত জীবনের প্রতীক—যে জীবন 'নিয়মের রূঢ় আয়োজনে বা নিষেধের শাসনে অবদমিত রেখেছে মানবহৃদয়ের প্রেমের মুক্তি স্পৃহা। 'পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে গেলে' অর্থাৎ বিচারপ্রবণ বিচক্ষণ সতর্কতার অবরোধ অপসৃত হলে, 'বুনোহাঁস পাখা মেলে'—মগ্ন-চৈতন্যের গহনতা থেকে বেরিয়ে আসে বুনো হাঁসের দল। নির্বাধ উল্লসিত বাসনার পাখিরা তখন মুক্তির আনন্দে ডানা মেলে দেয় 'পউষের জ্যোৎস্নায়'। এ কবিতার শিল্পসিদ্ধি এমনই অনায়াস যে কখন বুনোহাঁসের দল 'কল্পনার হাঁসে' রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে পউষের জ্যোৎস্না ছেড়ে 'হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার' ভিতর উড়তে থাকে তা বুঝে উঠবার অনেক আগেই কবিতার যাদুকরী চরণগুলি পাঠকের কল্পনায় মুদ্রিত করে দেয় 'কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ'—দূরকালের ব্যবধান ভেঙে উঠে আসে হারানো প্রেম, ভাল-বাসার নারী, তার লজ্জারুণ মুখশ্রী। কিন্তু, এখানেও দেখি, নিসর্গের অবারিত জৈব প্রাণপ্রবাহের মধ্যে বুদ্ধিগত চেতনাকে নিমজ্জিত করে দিয়েই হৃত, অবদমিত প্রেমবাসনা কথা কয়ে উঠেছে। বুনোহাঁসের প্রতীকটির ব্যবহার সেই নিমজ্জনেরই ইঙ্গিতবহ।

ব্যবহারিক জীবনের অবলেপে দমিত প্রেমবাসনার ক্ষণজীবি মুক্তির উল্লাসের সাক্ষ্য বহন করছে এ গ্রন্থের সমধর্মী আর একটি কবিতা : 'হরিণেরা'। হরিণ শুধু তার লোকপ্রসিদ্ধ সৌন্দর্যের জন্যই নয়, প্রেয় ও অপ্রাপনীয়ের প্রতীক হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠ। আবার, দ্রুতচারী এই প্রাণীটি মুক্তির দ্যোতনাও বহন করে তার উল্লাসস্পৃষ্ট গতির ইঙ্গিতে। কিন্তু, ভুললে চলবে না, হরিণ নিসর্গচারী;

জীবনানন্দের কবিতাটিতে সে স্বপ্নের মধ্য হতে উঠে এসেছে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় পলাশের বনে। চারিদিককার নিসর্গমাধুরিমার মধ্যে ক্রীড়াচঞ্চল হরিণদের নির্বাধ উল্লাস কবির চেতনায় জাগিয়ে তুলছে হারানো প্রেমের জন্য আর্তি : 'বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা বোস' নিসর্গের এই রম্য অন্তরাল থেকে তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। এক দূরাপসারিত স্বপ্নের জগৎ অবদমিত প্রেমবাসনার মুক্তির মধ্য দিয়ে আবার বাঙময় হয়ে ওঠে :

বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

আলোচিত দুটি কবিতাতেই দেখা যায় ভালবাসা বা ব্যর্থবাসনার বিষাদভার যে জগতে মুক্তি খুঁজছে তা প্রাত্যহিকতায় অবলীন আমাদের পরিচিত পৃথিবী নয়, এক কল্পজগৎ ('পৃথিবীর সব রঙধ্বনি মুছে গেলে পর') যেখানে নৈসর্গিক প্রশান্তির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বহে চলেছে এক পরিপূর্ণ প্রাণপ্রবাহ যা ইন্দ্রিয়সংবেদী, প্রতর্কতাড়িত নয়।

প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেমের উপস্থাপনা জীবনানন্দের পূর্ব-পর্যায়ের কাব্যেও দেখা গেছে। সে প্রকৃতিলোক ছিল ধূসর, হৈমন্তিক বিষাদ ও মৃত্যুর ভারাবলীন। নিসর্গসৌন্দর্যের ক্ষণজীবি রমণীয়তায় কবি তখন অনুভব করেছিলেন বিষাদ আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন ভালবাসার নশ্বরতার বেদনা। জীবনানন্দের কাব্যের প্রাথমিক পর্বে প্রেম তাই মৃত্যুস্পৃষ্ট। তাঁর মধ্যপর্যায়ের কাব্যে, অর্থাৎ 'বনলতাসেন' ও সমসাময়িক কবিতাবলীতে, প্রেমের এই মৃত্যু-আহত নশ্বরতার রূপটিই বড় নয়। একালে প্রকৃতি-পৃথিবী জীবনানন্দের কাছে হয়ে উঠেছে প্রশান্তি ও নিশ্চিতির কেন্দ্র, এক পরিপূর্ণ প্রাণরঙ্গের দ্যোতক। নিসর্গনিমগ্ন প্রেমকে সেই পূর্ণজীবনলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবি। তাই, প্রেম 'বনলতাসেন' গ্রন্থে ও পরবর্তী পর্যায়ের বহু কবিতাতেই মৃত্যুর বৈনাশিক বিষাদকে অতিক্রম করে এক মরণ-জয়িতার শক্তিতে আবির্ভূত। আবহমান মানবচেতনার এক মৌল

অপরাহত বোধের স্বরূপেই যেন তার প্রকাশ। প্রেমের মরণজয়িতার বোধ পরিপুষ্ট হয়েছে কবির ইতিহাসচেতনায়—জীবনানন্দের একালের কাব্যেই যার একটি সুনির্দিষ্ট ও মননঋদ্ধ বিগ্রহ পাওয়া যায়। প্রকৃতি সংযুক্ত করেছেন মানবচিত্ত গহনবাসী এই মৃত্যুত্তীর্ণ প্রেমবোধে তাঁর প্রশান্তির সম্পদ। এভাবেই জীবনানন্দের মধ্যপর্যায়ের কাব্যে 'প্রেম' হয়ে উঠেছে প্রেয় অন্বিষ্টের এক গরীয়সী প্রতিমা, যাঁকে আমরা আবিষ্কার করি দীর্ঘক্লান্ত সহস্রবর্ষব্যাপী অন্বেষার পরে 'সবুজ ঘাসের দেশে' বনলতাসেনের ইতিহাসমণ্ডিত অবয়বে, তার 'পাখির নীড়ের মত চোখে'র প্রত্যাশিত প্রশান্তির আশ্রয়ে। এই কবিতার প্রথম স্তবকের যুগযুগান্তব্যাপী মানবঅন্বেষার উত্তর-ব্যক্তিক আবহ, দ্বিতীয় স্তবকের দিশাভ্রান্ত নাবিকের ঘাসের দেশে আশ্রয়-গ্রহণের চিত্রকল্প, নায়িকার ইতিহাসমণ্ডিত মুখচ্ছবি, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইতিহাসচেতনায় অভিষিক্ত প্রেমবোধের মূল্যমহিমার কথা। এই প্রেম চিরজীবিত, তাই 'দুদণ্ডের শান্তি'র প্রসঙ্গ অতিক্রম করে নায়ক শেষপর্য্যন্ত 'বনলতাসেন'কে যেন পুনরাবিষ্কার করেন কবিতার শেষ-স্তবকে ইহজাগতিক বিনিময়ের ঊর্ধ্বে স্থিত চিরন্তনতার মধ্যে। আবার প্রথম স্তবক থেকেই নায়ক যখন নিজেকে যুক্ত করে নেন 'হাজার বছর ধরে' পথ-হাঁটা মানবসত্তার সঙ্গে, তখনই 'বনলতাসেন' হয়ে ওঠেন আবহমানকালব্যাপী ভ্রাম্যমান মানবসত্তার অন্বিষ্টের প্রতীক, চিরমানবাত্মার প্রেয়সী। বিদিশা শ্রাবস্তীর উল্লেখ তখন তাঁকে ঐশ্বর্যময়ী করে তোলে; কবির ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হয়ে ওঠে মানব-প্রেয়সীর প্রত্নপ্রতিমা। জীবনানন্দ যেন ঐহিক প্রেমের আয়োজন স্বীকার করে নিয়েই 'বনলতাসেন'কে ঘিরে রচনা করে ছিলেন মানবহৃদয়ের চিরন্তন অভীপ্সার পরিমণ্ডল। প্রেয়সী নারী হলেন প্রেয় অন্বিষ্টের ও নিশ্চিতির প্রতীক।

কিন্তু 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে প্রেম মুক্তি ও শান্তির আশ্রয় খুঁজেছে নিসর্গলোকে, প্রকৃতিপৃথিবীর নির্বাধ ও অখণ্ডিত প্রাণপ্রবাহে।

নাম-কবিতাটির তাৎপর্য তাই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রণিধেয়। 'বনলতা' এই নামটির মধ্যেই রয়েছে প্রকৃতি-পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতির ব্যঞ্জনা। এই বনলতা সেন শেষপর্যন্ত দীর্ঘঅন্বেষার সফেন-সমুদ্র পেরিয়ে আবিষ্কৃত হন 'সবুজ ঘাসের দেশের' মতন, আর অন্বেষাক্লান্ত মানবপ্রেমিকের প্রতি অভ্যর্থনা জানায় তাঁর 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'। দুটি চিত্রকল্পই নিসর্গপৃথিবী থেকে আহৃত (ঘাস ও পাখি) হয়ে 'বনলতা'কে আরও সুনিশ্চিতভাবে করে তোলে প্রকৃতিস্বরূপিনী। এ কবিতাটিতে এক প্রকৃতি (নিসর্গলোক) ভাবসাযুজ্য পেয়েছে আর এক প্রকৃতি (নারীর) মধ্যে। জীবনানন্দের বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহের পূর্বাপর প্রকৃতিমুখিনতা এবং 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে অভ্রান্তভাবে লক্ষণীয় প্রাকৃতিক জীবন-অস্তিত্বের পূর্ণতা ও প্রশান্তির প্রসঙ্গটি স্মরণে রাখলে এই দাবী স্বীকার্য মনে হয়। কিভাবে লৌকিক প্রেম-আখ্যানের বহিরঙ্গ ও আঞ্চলিক ভৌগোলিক স্বাদের বাস্তবতা ('নাটোর' ও 'সেন'—উপাধির প্রয়োগ) বজায় রেখেও জীবনানন্দ তাঁর এই অনবদ্য কবিতাটিতে সঞ্চারিত করেছেন লোকোত্তর ব্যঞ্জনা তা ভেবে আমরা বিস্ময়াবনত হয়ে পড়ি ঠিকই। তবু নিছক ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনীর কবিতা হিসাবে সমস্ত রোমান্টিকতা ও উত্তাপ নিয়েও এ কবিতা তার অর্থের বহুতলবিস্তার উন্মোচিত করে না।

'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে জীবনানন্দের প্রেমচেতনা ইতিহাসবেদে আশ্রিত ও পরিপুষ্ট। মানবসভ্যতার উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে মানবসত্তার প্রেয় অন্বিষ্টের জন্যে সম্মুখযাত্রার চিত্রকল্পটি 'বনলতাসেন' কবিতার প্রথম স্তবকেই ইতিহাসবেদিতার ভূমিতে আশ্রিত হয়ে মহত্তর ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে। এই 'হাজার বছর ধরে পথহাঁটা মানবপথিকের চিত্রটি 'পথহাঁটা' কবিতাটির শেষ দুটি চরণে সহসা এক অপ্রতিরোধ্য অভিঘাতে পাঠককে পৌঁছে দেয় অব্যবহিত নাগরিক অস্তিত্ব থেকে আবহমান মানবঅস্তিত্বে: "বেবিলনে একা

একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর / কেন যেন, আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।' কিন্তু সে কবিতার প্রসঙ্গে প্রেম নয়, শুধু হাজার বছরের ভ্রাম্যমানতার চিত্রকল্পটি কেমনভাবে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে তাই দেখানোর প্রয়োজনে উল্লেখিত হল। অন্যদিকে 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি অভ্রান্তভাবে সময়ের বিলয়ধর্মী পটভূমিতে চিররাত্রির আবহে ('চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান') মানবচেতনায় দীপ্যমান রেখেছে প্রেম। ইহজাগতিক লেনদেনের পরেও, ব্যক্তি মানবের মৃত্যু হলেও ('শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের') যেন এক মরণাতীত সত্তায় বিরাজ করেন বনলতা সেন—মানবচেতনার গভীরে নিহিত দুর্মর প্রেমবোধ : 'মনে আছে' ? সুধাল যে—সুধালাম আমি শুধু—বনলতাসেন' ?

'পৃথিবীর বয়সিনী' যে মেয়েটিকে কবি 'সুরঞ্জনা' বলে সম্বোধন করেছেন তিনিও এই চিরন্তন প্রেমেরই প্রতিমা। 'সুরঞ্জনা' নামটির বাগর্থ বিশ্লেষণেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নারীপ্রতীকের অন্তরালবর্তিনী প্রেমের মুখশ্রী। তিনিই সুরঞ্জনা যিনি আমাদের হৃদয়কে সুন্দরভাবে রঞ্জন করেন। [মনে রাখা ভাল, 'রঞ্জন' আর 'রাগ' এই দুটি শব্দ একই ধাতু থেকে সংগঠিত।] 'বনলতাসেন' গ্রন্থে প্রেম বার-বার আবির্ভূত হয়েছে নারীত্বের প্রত্নপ্রতিমায়, ইতিহাসচেতনার সারাৎসারে পরিপুষ্ট হয়ে। 'সুরঞ্জনা' কবিতাটিতে জীবনানন্দের দৈবী উচ্চারণে মানবসভ্যতার অন্তর্লীন প্রেরণা-স্বরূপিনী এই প্রেম অঙ্গীকৃত হয়ে ওঠে কবির ইতিহাসবেদে ; ধর্মাশোকের সন্তান মহেন্দ্রের সমুদ্র যাত্রা ও সভ্যতাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষার পিছনে প্রেরণার মত কাজ করেছে এই কল্যাণী প্রেমেরই শক্তি :

তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

পূর্ব স্তবকের নৈসর্গিক প্রেক্ষাপটে এই বক্তব্যকেই কবি উপস্থাপিত

করেন যখন তিনি জানান মানুষের সভ্যতার বয়স বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য-নক্ষত্রের আলোও হয়তো ক্রমক্ষীয়মান; তবু প্রকৃতিরই জগতে আছে চিরপ্রাণরঙ্গলীলা : সমুদ্রের নীল, ঝিনুকের গায়ের আল্পনা, পাখির গান নবীন মানবমানবীকে ডেকে নেয় ভালবাসায়। কারণ, 'মানুষ কাউকে চায়'; তার জায়মান বিশ্বচেতনার কেন্দ্রে এক নিশ্চিতির আশ্রয়। একদিন তার ছিল ঈশ্বরে উজ্জ্বল বিশ্বাস; সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়চ্যুত মানব নতুন আশ্রয় খুঁজেছে 'অন্য কোনো সাধনার ফলে', যা হল প্রেম। আর এই প্রেম বলতে জীবনানন্দ যদিও বোঝেন 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'; তবু তার অমর্তদাক্ষিণ্য, মৃত্যুহীনতা ও প্রয়াণের শক্তি সম্পর্কে তিনি আশ্বস্ত করেন পাঠককে ইতিহাস-প্রদক্ষিণ পথে :

'যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে,—
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ নিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।'

'মিতভাষণ' ও 'সবিতা' কবিতা দুটির কেন্দ্রেও রয়েছেন জীবনানন্দের এই ইতিহাসবেদী প্রেম-চেতনায় উদ্ভিন্ন শ্রেয়সী নারী। 'মিতভাষণ' কবিতাটির প্রথম স্তবকেই প্রেয়সী নারীর সৌন্দর্যদীপ্তিকে কবি চিনেছেন তার ঐতিহ্য মহিমায় ('তোমার সৌন্দর্য, নারি, অতীতের দানের মতন')। প্রেম যেন এক 'শ্রেয়তর বেলাভূমি' যা 'সময়ের শতকের মৃত্যু' হলেও অর্থাৎ মানবেতিহাসের যুগ থেকে যুগাবসানের পরেও 'ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো' মানবকে ডেকে নেয় উজ্জ্বল বিশ্বাসে ও প্রেরণায়। নারীর মুখশ্রীর 'স্নিগ্ধ প্রতিভায়' কবি সেই

বিশ্বাস ও প্রেরণার শক্তি দেখেছেন। তাই কবিতার অন্তিম স্তবকে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় উত্তরণের যাত্রায় মানবের ভ্রান্তি, হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বিকল্পে কবি রেখেছেন প্রেমের মৃত্যুমথিত উদ্বর্তনের ঘোষণা :

'মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে,
বড় বড় নগরীর বুক ভরা ব্যথা
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো :
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।'

লক্ষণীয় জীবনানন্দ এখানে জল, আলো কিম্বা সেসবের উৎস নদী সূর্যের মত প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সমপর্যায়ে রেখেছেন নারীর প্রেমের প্রেরণাশক্তিকে। এভাবেই 'বনলতাসেন' গ্রন্থটিতে বারে-বারেই নারী ও নিসর্গ—'প্রকৃতি' শব্দটির এই দুই অভিধাই খুব কাছাকাছি এসেছে, সাঙ্গীকৃত হয়েছে একে অপরের ভাব ও শক্তির সাযুজ্যে, যে কথা আমরা পূর্বেই 'বনলতা' নামকরণটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছি। 'সবিতা' কবিতাটিতেও নর-নারীর প্রেমজীবনচর্যার প্রেক্ষাপটে এসেছে ইতিহাসের বিস্তৃত প্রান্তরে সভ্যতা থেকে নব সভ্যতার যাত্রায় পরস্পরকে চেনা। তাই প্রেয়সী নারীর মুখের রেখায় আভাসিত 'মৃত কত পৌত্তলিক খ্রীষ্টান হিন্দুর / অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন' প্রতিভা ও প্রেরণার শক্তি ; তার নিবিড় কালো চুলের ভিতর 'কবেকার সমুদ্রের নুন'। ইতিহাস চেতনার উৎসারে ও বিস্তারে নারী হয়ে উঠেছেন শক্তি ও প্রেরণার এক প্রত্নপ্রতিমা—শুধুমাত্র সৌন্দর্য আর নিয়তিতাড়িত প্রেমবাসনার চির-অলভ্যা প্রতীক নন তিনি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে প্রেম যদি হয়ে থাকে প্রেয় ও অপ্রাপনীয় ; একালের কাব্যে তা হয়ে উঠল

শ্রেয় ও আরাধ্য। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে প্রেমের ক্ষণজীবি অমর্ত আস্বাদের আনন্দ ধ্বনিত হয়েছে কবিতার পর কবিতায় নশ্বরতার বেদনাবহ উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে। 'বনলতাসেন' পর্যায়ে কবিতার পর কবিতায় প্রেম তার মরণজয়িতার শক্তিতে উপলব্ধ এবং প্রেমের শক্তির এই মরণাতীত মহিমার বোধ জারিত হয়েছে কবির ইতিহাস চেতনায়। তাই প্রেমিক নায়ক হয়ে উঠেছেন আবহমান মানবসত্তার প্রতিভূ, প্রেয়সী নারী হয়েছেন এক পরমা অন্বিষ্টের প্রতীক। ইতিহাস-চেতনায় বলয়িত হয়ে এই প্রেম মানবাত্মাকে ডেকে এনেছে প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রশান্ত আশ্রয়ে; প্রেমের প্রেরণার শক্তি ও নৈসর্গিক 'পূর্ণপ্রাণে'র শক্তি যেন সাঙ্গীকৃত হয়েছে একটি বিন্দুতে। 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কাব্যে এভাবেই জীবনানন্দের প্রেমচেতনা স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতর পরিণতি-চিহ্নিত হয়েছে।

তবে কোনও কবিই, যদি তিনি মানব-অভিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তাঁর প্রেমের কবিতাবলী হতে সম্পূর্ণভাবে হতাশা, বিষাদ ও মৃত্যুর বোধগুলিকে মুছে দিতে পারেন না। তাই বিষাদ ও মৃত্যুর প্রচ্ছায়া, ব্যর্থতা, আহত বাসনার আর্তি 'বনলতাসেন' গ্রন্থের অনেক কবিতার মধ্যেই আবর্তিত। তবে সে সব কিছুই আগের মত সংবেদনার প্রবলতায় প্রেমের শুভ ও প্রেরণাশক্তির নবজাত বোধকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। 'দুজন' বা 'অঘ্রাণপ্রান্তরে' কবিতা দুটি পাঠককে ফিরিয়ে আনে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র হিমার্ত মৃত্যুস্পৃষ্ট জগতে। শঙ্খমালা' কবিতার নারী যেন পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কিম্বা 'পরস্পর' কবিতার জীবনানন্দীয় নায়িকার কথা যাঁকে ঘিরে মৃত্যুর আবহ; তবু তিনি আমাদের হৃদয়-সন্ধানে অব্যর্থ, ঘোর মায়াবিনী নিষ্করুণা এক নারী। 'সোনালি ডানার চিল' এই মায়াবিনীরই অপ্রাপনীয় মুখচ্ছবি বহন করে আনে' 'ভিজে মেঘের দুপুরে'। পৃথিবীর যত রূপকথার রাজকন্যার সৌন্দর্যের সুদূরতা ও চিরঅলভ্যতা যা মানবকে চিরদিন করেছে হতাশ স্বাপ্নিক

তা এই শঙ্খমালার প্রতীকেই হাহাকার করে ওঠে জীবনানন্দের কবিতায়। শঙ্খমালাও রূপকথা থেকে উঠে এসেছেন; তিনি সুদূরিকা, অপ্রাপনীয় সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক। এই চির-আকাঙ্ক্ষিতা অথচ চিরঅলভ্যা নারী হয়ে ওঠেন অপ্রাপনীয়ের প্রত্নপ্রতিমা কবি যখন তাঁর চোখে দেখেন 'শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার', তার মধ্যে খুঁজে পান 'কবেকার শঙ্খিনীমালা'কে।

'শঙ্খমালা' কবিতাটি কয়েকটি কারণে আরও নিবিষ্ট মনোযোগ দাবী করে। শঙ্খমালাকে আমরা অপ্রাপনীয়ের প্রতীক বলে দেখেছি; কবিতার শেষচরণে ('পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর') তার সমর্থন মেলে। শঙ্খমালা লোককাহিনী বা রূপকথার কল্পনাভূমি থেকে উঠে এসেছেন। তিনি 'কবেকার শঙ্খিনীমালা'র অনুষঙ্গ বহন করেন আর সেই অনুষঙ্গ হল: 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মত সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'। সেই সুদূর কালের রূপসীকে কবি ডেকে এনেছেন তাঁর স্বকালে। কিন্তু 'বনলতা'; 'সুরঞ্জনা' 'সবিতা'র মত 'শঙ্খমালা', কবিকে মিলন ও প্রাপ্তিতে পূর্ণ করেননি, রেখে গেছেন কবিতার চরণে চরণে ব্যবধানের হাহাকার ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। কোনও একদিন যে মানব শঙ্খমালার মত নারীকে ঘিরে রচনা করেছিল সৌন্দর্য ও প্রেমের রূপকথা প্রাপ্তির আনন্দে, এই অবিশ্বাসী সময়ে কবি তাঁকে স্বচেতনায় আবির্ভূত হতে দেখলেন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে, বিষাদ ('বিমর্ষপাখির রঙে ভরা তার দেহ'), চঞ্চল নশ্বরতা ('শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ' যার প্রতীক) আর মৃত্যুর আয়োজনে: 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার, / দুইখানা হাত তার হিম; / চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম / চিতাজ্বলে: দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায় / সে আগুনে হায়।' এ সবই যেন ইঙ্গিতে পাঠককে জানিয়ে দেয় এক রিক্তবিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিহীনতার যুগে পূর্ণ সৌন্দর্য আর প্রেমের অপমৃত্যুর কথা।

আরও লক্ষণীয়, কিভাবে এই কবিতায় দুই নারী পরস্পরের

প্রতিদ্বন্দ্বী। কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে যে নারী কবিকে আহ্বান করেছেন 'নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে' তারই চোখে হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে, যার আগুনে শঙ্খমালা পুড়ে যায়। অন্যদিকে, জীবনানন্দের কবিতায় যে পেঁচা বারেবারে উপস্থিত বিজ্ঞতা ও জাগতিক বিচক্ষণতার প্রতিভূরূপে, সেই পেঁচার প্রাণের সঙ্গে সাযুজ্য দেখেছেন কবি কান্তারে আবির্ভূত নারীর, যাঁর যুগ প্রতিবেশ-সম্ভূত বিচক্ষণ মানসতা মানবহৃদয়ের চির-আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বপ্নপ্রতিমা শঙ্খমালাকে দগ্ধ করে। একদিকে কঠিন জাগতিক আধুনিকা ; অন্যদিকে স্বপ্নবাসিনী শঙ্খমালা—এই দুই নারীর ট্রাজিক অনন্বয় থেকে 'শঙ্খমালা' কবিতাটি আহরণ করেছে তার অর্থগূঢ়তা। এই 'শঙ্খমালা' নারীকেই কবি 'হাওয়ার রাতে' আবিষ্কার করেছেন এশিরিয়া মিশর বিদিশার মৃত রূপসীদের মধ্যে যারা 'দীর্ঘ বর্শা' হাতে কাতারে কাতারে হানা দিয়েছে কবির 'আধোঘুমের' স্বপ্নে—

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?

এই নারীকে ঘিরেই গুঞ্জরিত 'নগ্ননির্জন হাত' কবিতার স্মৃতি-ভারাতুর অতীতচারিতার আনন্দবিষাদ : 'তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না, খুঁজি না'। এমনকি, নিতান্তই স্বকালে, কুড়ি বছরের ব্যবধান ভেঙে কবি যাকে 'ধানের ছড়ার পাশে কার্তিকের মাসে' হেমন্তের নতুন কুয়াশার ভিড়ে ফিরে পেতে চান সেই নারীও মানবহৃদয়বাসিনী চিরন্তন স্বপ্নের শ্রেয়সী এই শঙ্খমালা যাঁকে আমাদের কবি পুড়ে যেতে দেখেন 'হিজল কাঠের রক্তিম চিতা'য় যেন তার নিজেরই সমকালবদ্ধ ঐহিক অভিজ্ঞতার আগুনে। তাই, শঙ্খমালাকে আমরা বলেছি সৌন্দর্য ও প্রেমের এক প্রত্ন-প্রতিমা বা archetype। আমাদের এই ব্যাখ্যার সমর্থন জানাবে 'মহাপৃথিবী'র 'সিন্ধু সারস' কবিতার শেষতম স্তবকটি—যেখানে শ্রেয়সী নারী হয়েছেন

'পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী' যাঁর সঙ্গে তার মানব প্রেমিকের চিরন্তন ব্যবধানের যন্ত্রণা। শঙ্খমালার প্রেমিকের মুখের রূপ তাই ম্লান নিঃসঙ্গ, 'বিশুষ্ক তৃণের মতো তার প্রাণ'।

জীবনানন্দের বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহে 'বনলতাসেন' গ্রন্থটি কবির প্রেমভাবনাকে রেখেছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের বিপরীতে এ কথা আমরা বলেছি। উভয় পর্যায়ের প্রেমের কবিতাবলীর উপস্থাপনা ঘটেছে কবির ভাষায় প্রকৃতির শোভাভূমিকায়। কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে সেই প্রকৃতিলোক ক্ষয়িষ্ণু রূপের বেদনায় মৃত্যুস্পৃষ্ট; অন্যদিকে 'বনলতাসেন' ও তৎপরবর্তী 'মহাপৃথিবী' এবং সমসাময়িক অন্যান্য কবিতাবলীতে প্রকৃতির বিষণ্ণম্লান মৃত্যুপীড়িত রূপটিই বড় হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে স্থান নিয়েছে এক শান্ত সুষমা ও পরিপূর্ণ প্রাণলীলা। 'অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' এখানে; 'এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ'; এখানে 'ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায়' পলাশের বনে 'হাওয়া আর মুক্তার আলোকে' 'হরিণেরা খেলা করে', এখানে 'কচি লেবু পাতার মত নরম সবুজ আলোয়' ভোরের পৃথিবী জেগে ওঠে; এখানে 'নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো' অজস্র তারার সমারোহ। এভাবেই অপরাজেয় প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের এক প্রকৃতি-পৃথিবী নিজের আসন নিঃশব্দে বড় করে নিয়েছে জীবনানন্দের কাব্যে। প্রেমের উপস্থাপনায়ও ঘটেছে এক শান্ত নিরুদ্বেগ নিসর্গপটভূমিতে। শুধুমাত্র নর-নারীর প্রণয় ও বিরহমিলন প্রসঙ্গই নয়, মানবেতর প্রাণীকুলের মধ্যেও এই প্রেমের বিস্তার ঘটিয়েছেন কবি কাব্যের শিল্পপ্রসাদ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হতে দিয়ে। অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখ, মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জন, বনহংস-মিথুনের উল্লাস, সুন্দর বাদামি হরিণের সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেওয়া—নিসর্গআবহ নির্মাণের মধ্যে এসব ছোট ছোট অনুপুঙ্ক কারুকর্ম কবিতার পর কবিতায় রমণীয়

চমকই শুধু নিয়ে আসেনি, প্রকৃতির বিরাট সজীব নিরবচ্ছিন্ন প্রাণরঙ্গপ্রবাহের শান্তি ও নিশ্চিতির মধ্যে মানবঅস্তিত্বের মৌল তাড়না বা প্রেরণাশক্তিটিকে উপস্থাপনার উপযুক্ত পটভূমিক্ষেপই এদের লক্ষ্য।

প্রাকৃতিক জীবনের আদিম প্রাণময়তা ও পূর্ণতার সঙ্গে অন্বয়ের উৎসাহ 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে কবির চেতনায় এনেছে স্বাতন্ত্র্য ও অপূর্বতা। নর-নারীর প্রেম যেমন নিসর্গজীবনের পূর্ণতা ও সজীবতার পটে চিত্রিত হয়ে মানবিক অস্তিত্বের দুর্বলতাগুলিকে স্পষ্টতর করেছে, অন্যদিকে তেমনই এই মানব-মানবীর প্রেমের আখ্যানরূপকেই প্রকৃতি-পৃথিবী এবং মানবপৃথিবী ঘনিষ্ঠতর ও একাত্ম হয়েছে। যেমন, 'বনলতাসেন' কবিতাটিতেই এক প্রকৃতি (নিসর্গ) অন্যপ্রকৃতির (নারী) সঙ্গে ভাবসম্মিলনে অভেদাত্ম ও অভিন্নকায় হয়ে উঠেছে। মানব ও প্রকৃতির এই মিলনে মৃত্যুও 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে কোনও অন্তরাল রচনা করেনি। জীবনের অমোঘ সত্যের মত মৃত্যু এখানে উপস্থিত ঠিকই; কিন্তু অখণ্ড প্রাণপ্রবাহ-চেতনার উন্মেষে তার নিজের ভূমিকাটিতে সীমিত। কবি জেনেছেন এক 'ব্যাপ্ত নিয়মের' কথা যার বলে সবকিছুই একদিন বিদায় নেয়। কিন্তু তবু আকাশ ও পৃথিবী 'চিরস্থায়ী', যেখানে মানুষ বারবার ফিরে আসে 'যেন কিছু চেয়ে কিছু একান্ত বিশ্বাসে'।[৭] এভাবেই ব্যক্তিক প্রেমের স্বপ্ন ও হতাশা, 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানে' ও 'ইতিহাসবেদে' জীবনানন্দকে ফিরিয়ে আনে 'মাটি-পৃথিবীর টানে'। স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের কল্পজগৎ ছেড়ে সেখানে ফেরার ইচ্ছা কবির প্রবল ছিল না।[৮] কিন্তু প্রত্যাবর্তিত হয়ে তিনি জেনেছেন মানবেতিহাসের সারসত্য, সুচৈতন্যের উদ্বোধনে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় বারবার উত্তীর্ণ হওয়া।[৯] এই 'মানবজন্মের

৭। 'দুজন'—বনলতাসেন।

৮। 'হাওয়ার রাত'; আমি যদি হতাম'—বনলতা সেন।

৯। 'সুচেতনা'—বনলতা সেন।

ঘরে' ফিরে আসা তাই কবির কাছে হয়ে উঠল, 'গভীরতর লাভ'। তারই আলোকে মানবের প্রেমানুভূতিকে ঘিরে বিষাদ, হতাশা ও মরণাধীনতার গ্লানিকে জীবনানন্দ যেন অনেকটাই অতিক্রম করেছেন শান্ত প্রজ্ঞায়। এই প্রজ্ঞার একটি উৎস ইতিহাসচেতনা, অপরটি পরিপূর্ণ নিসর্গমগ্নতা। প্রিয় যে নারীটির সঙ্গে 'হৃদয়ের খেলা নিয়ে' একদিন 'কত অপরাধ' করেছেন[১০] তার মুখ মনে পড়ে 'এরকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে'।[১১] তবু অনর্গলিত যন্ত্রণার হাহাকার নেই ; কারণ, কবি জানেন কাচপোকা গঙ্গাফড়িঙের মতো সেও আজ ঘুমে'—'আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছে'—'প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো'।[১২] মানুষের জীবন যে চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অসংখ্য অভিঘাতে কাতর এবং দিশাভ্রান্ত তার থেকে ঢের গভীরতর এক শান্তির মধ্যেই শুয়ে আছেন কবির প্রেয়সী :

'শান্তি তবু - গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।'[১৩]

'শিরীষের ডালপালা', 'ধানকাটা হয়ে গেছে' ও 'তুমি'—এই তিনটি কবিতায় মৃত্যু শুধু দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়াই ফেলেনি, এসেছে চির-বিচ্ছেদের রূপে। তবু, এসব কবিতার কোনটিতেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা' পর্যায়ের কবিতার মৃত্যু-আক্রান্ত আর্তি ও হাহাকার নেই—আছে মৃত্যুর শান্ত সম্মত অভিগ্রহণ যার অন্তরাল হতে স্ফুরিত হয় দীর্ঘশ্বাস। মৃত্যুর শেলতীব্রতাকে অতিক্রম করে জৈব সংসক্তির মধ্যে তাকে দেখা সম্ভবপর হয়েছে নিসর্গজীবনে নিমজ্জন ও প্রকৃতি-পৃথিবীর সঙ্গে অন্বয়ের চেতনার উদবর্তনের ফলেই, একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

১০। 'ধান কাটা হয়ে গেছে'—বনলতাসেন।
১১। 'শিরীষের ডালপালা'—বনলতাসেন।
১২। 'তুমি'—বনলতাসেন।
১৩। 'ধান কাটা হয়ে গেছে' বনলতাসেন।

'শঙ্খমালা' কবিতাটিকে কেন্দ্র করে 'বনলতাসেন' পর্যায়ে জীবনানন্দের প্রেমের কাব্যের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ স্পষ্ট করতে চেয়েছি। এ'গ্রন্থের প্রশান্তিমগ্ন প্রকৃতিভুবনের দাক্ষিণ্যে স্মিত, লাবণ্যে স্নিগ্ধ 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'শ্যামলী' প্রমুখ নারী-প্রতিমাদের মাঝখানে 'শঙ্খমালা দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিষাদ ও মৃত্যুর পরিমণ্ডলে। 'বনলতাসেন' কবির কাছে 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' হয়ে উঠেছেন তাঁর কল্যাণ ও প্রশান্তির আশ্বাসে ; শঙ্খমালাকে ঘিরে কিন্তু অপ্রাপনীয়তার দীর্ঘশ্বাস ('এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর') আর স্বপ্নবিনাশের আর্তি ('শঙখমালা যেন পুড়ে যায়')। এই কবিতায় নেই নিসর্গজীবনের সঙ্গে একায়নের প্রত্যয় ; পেঁচা এখানে রচনা করেছে ব্যবধান স্বপ্নের শ্রেয়সী নারী আর কান্তারের পথ থেকে উঠে আসা সেই স্বপ্নের প্রেত-প্রতিমার মধ্যে। 'শঙখমালা' এই অনন্বয় আর ব্যবধানের মধ্য দিয়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় 'আদিপর্বের কবিতার অপ্রাপনীয় সৌন্দর্য আর পরিপূর্ণ জীবনের রোমান্টিক আদর্শের অনুধ্যানে, স্বপ্নে আর বাস্তবে আবার রচনা করে দুরপনেয় ব্যবধান যার পরিণতি ঘটে 'মহাপৃথিবী'র 'সিন্ধুসারস' কবিতাটিতে। সিন্ধুসারসের গান কবির চেতনায় বহন করে আনে স্বপ্নের প্রবলতা :

নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে

তার নৃত্যময় ছুটি ডানার ছন্দে মানুষের মনে জেগে ওঠে প্রয়াণের নবীন উদ্যম। তবু, জৈব প্রাণেষনা ও উল্লাসের প্রতীক এই সিন্ধুসারসের সঙ্গে মানবের কোনও আত্মিক যোগ নেই। কারণ, সিন্ধুসারস স্বপ্ন দেখতে জানেনা ; সিন্ধুসারস জানে না বাস্তবের অপর পিঠে আছে মানবের কল্পনার জগৎ যেখানে দেখা মেলে পৃথিবীর শঙখমালা নারীর :

স্বপ্ন তুমি ছাখোনি তো—পৃথিবীর সবসিন্ধু সবপথ ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ;

তাই, সিন্ধুসারসের শাদা ডানা ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীকে আনন্দ জানায় বটে, তবে সেই 'আনন্দের অন্তরালে' নেই মানব-অস্তিত্বের 'প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত'। এ'ভাবেই প্রকৃতি-পৃথিবীর জৈব প্রাণোল্লাসময় জীবনের সঙ্গে মানবপৃথিবীর জীবনের আত্মিক সংযোগ, যা 'বনলতাসেন' গ্রন্থে অর্জিত হয়েছিলো, তা যেন ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতিপৃথিবীর একান্ত আবাস ও আশ্রয় থেকে কবি চলে আসেন 'মহাপৃথিবী'র বৃহদায়তন জীবন প্রান্তরে যেখানে নিসর্গ আর মানব আর একাত্ম নয়। বরং তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতে এই দুই ভিন্ন জীবনঅস্তিত্বের মৌল ব্যবধানের চারিত্র্য বড় হতে থাকে। 'মহাপৃথিবী'র কবিতার পর কবিতায় নিসর্গজীবনের নিবিড়তা ও প্রশান্তির মধ্যে হানা দিয়েছে রূঢ় বাস্তব, পারিপার্শ্বিক মানবজগতের নানা সমস্যার অভিঘাত দীর্ণ করেছে প্রকৃতিপৃথিবীর প্রাচীন প্রশান্তির আশ্বাস। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানবমানবীর প্রেম আবার ক্লিন্ন দেহবাদিতায়, প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যয়হীনতার অভিশাপে জান্তব ও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে ; সঙ্গে সঙ্গে আর্ত ও বাঙ্ময় হয়েছে কবির আহ্বান। প্রেমকে তিনি ফিরিয়ে আনতে চান 'স্বপ্নে', 'ডাইনির মাংসের' থেকে 'কল্পনার অবিনাশ মহনীয় উদ্‌গীরণে',[১৪] 'আম নিম ঝাউয়ের জগতে'[১৫]। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা দেখি 'শঙ্খমালা' (যিনি অভ্রান্তভাবেই জীবনানন্দীয় নায়িকা) 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতিপৃথিবীর প্রশান্ত ভূখণ্ডে আবির্ভূত হয়ে আমাদের সচকিত করে তোলে বিষমানুপাতিক টানে। একদিকে অপ্রাপনীয় সৌন্দর্য : প্রেমের রোমান্টিক আদর্শে ঘিরে নিয়তিতাড়িত মৃত্যুর পরিমণ্ডল, অন্যদিকে প্রাকৃতিক জৈব প্রাণরঙ্গের সঙ্গে বিশ্বাস ও চিন্তার সঙ্কটে

১৪। মনোবীজ : মহাপৃথিবী।
১৫। ফিরে এসো : মহাপৃথিবী।

দীর্ণ মানবজীবনের পূর্ণ আত্মিক সংযোগের অসম্ভাব্যতার ব্যঞ্জনা যেন 'শঙ্খমালা' বহন করেন কবিকল্পনায় বিধৃত তাঁর প্রত্নপ্রতিমায় সংকেতময় নির্দেশে।

জীবনানন্দের অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই রোমান্টিক প্রেমকবিতার চারিত্র্যচিহ্নিত এ কথা আদিসংস্করণ 'বনলতাসেন' গ্রন্থ সম্পর্কেই বিশেষভাবে সত্য। প্রেমের কবিতামাত্রেই স্বপ্নের কবিতা। জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির ইতিহাসে 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতাসেন' পর্যায়ে সেই স্বপ্ন বিশেষভাবে অপ্রাপনীয় ও প্রেয়কে ঘিরে গুঞ্জরিত। উনিশশতকী মহাদেশীয় রোমান্টিক কাব্যের আরও একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল অতীত গরিমা ও সৌন্দর্যের জগতে প্রত্যাবর্তন। মধ্যযুগীয় শৌর্য ও ঐশ্বর্যবহুল জীবনচর্যার কাব্যিক পুনর্নির্মাণ ঘটেছিল সে যুগের কবিতায়। রোমান্টিক কাব্যের সমালোচকরা কল্পনার এ জাতীয় স্ফুরণের পশ্চাতে দেখেছেন পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্যের কল্পজগৎ পরিনির্মাণের শৈল্পিক প্রয়াস। আধুনিক কালের কাব্যে অতীতচারিতা কোনোসময়েই মুখ্যপ্রসঙ্গ হয়নি; স্মৃতিভারাতুরতার অনুষঙ্গ সেখানে নিয়ে এসেছে বিগতের জন্য শোচনার পাশাপাশি সাম্প্রতের গ্লানিদীন খণ্ডজীবনের প্রতি প্রগাঢ় অনীহার প্রকাশ। 'বনলতাসেন' গ্রন্থে বা তার পরবর্তী কাব্যেও অতীতচারী আবেগ বারবার উচ্ছ্বসিত হয়েছে বটে, তবে সে আবেগ গরিমামণ্ডিত অতীতজীবনের শোচনায় বা স্বপ্নপ্রয়াণে অবসিত না হয়ে প্রকাশ করেছে বর্তমানের খাণ্ডত জীবনের গ্লানি, চেতনার শূন্যতা। 'হাওয়ার রাত' এবং 'নগ্ননির্জন হাত'-এর মত কবিতা দুটি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য। 'নগ্ননির্জন হাত' কবিতাটিতে মূল্যবান আসবাবেভরা এক প্রাসাদের ধূসররূপ কবির মনে জেগে ওঠে, যার অনুষঙ্গে বাঙ্ময় হয়েছে লুপ্ত স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি। দুটি নিটোল গদ্য পংক্তি পাশাপাশি রেখে জীবনানন্দ বিগত ও বর্তমানের অনপনেয় ব্যবধান ও তজ্জনিত শোচনার অনুভূতি অনুরণিত করে দেন পাঠকের

মনে :

'পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিনতরঙ্গের নিটোল মুক্তাপ্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃতচোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা।'

বিগতকালের ঐশ্বর্যবহুল জীবনোপকরণের উল্লেখমাত্র প্রথম চরণটির অবলম্বন ; কিন্তু দ্বিতীয় চরণ তাকে অতিক্রম করে উদবর্তিত করে গত জীবনের পরিপূর্ণতার সম্পদ যা থেকে কবি ভ্রষ্ট হয়েছেন এই অধুনায়। এ ভাবেই তুলনামূলক বৈপরীত্যে অতীত ও অব্যবহিত জীবন তাদের ব্যবধান প্রকট করে ; 'অপরূপ খিলান ও গম্বুজের রেখা' হয়ে ওঠে 'বেদনাময়'। এই ক্লিন্ন সাম্প্রতে অনধিগম্য সেই ঐশ্বর্যময় জীবনচর্যা ; তাই তার কাহিনী যেন এক 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', তাকে ঘিরে 'লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ'। কিন্তু, লক্ষণীয়, 'নগ্ননির্জন হাত'-এর এই লুপ্ত ঐশ্বর্যের জগতের কেন্দ্রে রয়েছেন এক নারী, সেই চির-অপ্রাপনীয়া প্রেয়সী যার মুখের রূপ কতশত শতাব্দীর বিস্মৃতির অন্তরাল পেরিয়ে হানা দেয় কবির অনুভাবনায়। 'হাওয়ার রাত' কবিতার পরাবাস্তব বিস্তারেও এক অতীত ঐশ্বর্যের জগতের প্রবল উপস্থিতি কবির হৃদয়ে, পৃথিবী তথা অব্যবহিত অস্তিত্বের বন্ধন ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় এক দুরন্ত 'শকুনের মত'। শকুনের উপমাটি ব্যগ্র ক্ষুধার ইঙ্গিত বহন করে এবং মৃত জীবনের অনুষঙ্গ গাঢ়তর করে। 'হাওয়ার রাতে' কবির সংবেদনা রয়েছে এক 'আধোঘুমে'র ভিতর, এই 'আধোঘুম' কবি-চেতনায় জাগরণ ও স্বপ্ননিমজ্জনের বহির্সাক্ষ্য বহন করছে। কবি দেখেন মৃত রূপসীদের কাতারে কাতারে বর্শাহাতে দাঁড়াতে—মৃত রূপসীরা এক লুপ্ত সৌন্দর্যজগতের প্রতিভূ ; তাদের হাতে বর্শার মত মারণাস্ত্র পাঠককে প্রস্তুত করে তোলে 'হাওয়ার রাতে'র প্রবল নীল অত্যাচারের কাহিনী শোনবার জন্য। এই অত্যাচার কবির আধো-জাগরিত চেতনার উপর ; তা 'প্রবল' কারণ অতীতের ঐশ্বর্যময় জীবনের বলশালী উদ্বোধনে তা বর্তমানকে নিক্ষেপ করে এক তুচ্ছ গ্লানিময়তার দৈন্যে। আবার, এই 'অত্যাচার' 'নীল'—'নীল' এই

বিশেষণটি নিয়ে আসে স্বপ্নের অনুষঙ্গ—যে স্বপ্নের প্রবলতায় 'পৃথিবী কীটের মতো' মুছে যায় এক অখণ্ডিত পূর্ণ জীবনের 'দুর্দান্ত নীল মত্ততায়'।

জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির ধারায় প্রেমচেতনার উদবর্তনের প্রসঙ্গে 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীর আলোচনা দীর্ঘতর হয়ে পড়ে! তার অন্যতম কারণ, এ কালের কাব্যেই কবির প্রেমচেতনা পূর্ণতর প্রেক্ষিত, পরিণতি ও স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক প্রেমআদর্শের প্রভাব নিঃসন্দেহে তার এ সময়কার কবিতায় সংযোজিত করেছে এমন এক বিশিষ্টতা যা বাঙলা কাব্যের বহতাধারায় সহজদৃষ্ট নয়। নিয়তিতাড়িত প্রেমবাসনার আর্তি ও মরণাকর্ষ, অচরিতার্থতার বেদনা ও প্রেমের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিশ্বাসযোগ্য উত্তাপ ও তীব্রতা জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় যতটা প্রবলভাবে ও শিল্পপ্রসাদে অভিব্যক্ত তা বাংলা কবিতার আর কোথাও, এমনকি রবীন্দ্রনাথেও, সুলভ নয়। তবু জীবনানন্দ প্রথমাবধি প্রকৃতিনিমগ্নপ্রাণ এবং প্রেমকে তিনি 'প্রকৃতির শোভাভূমিকা'য় দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন। 'বনলতাসেন' পর্যায়ে সেই প্রকৃতিনিমগ্নতা পূর্বের চেয়ে গভীরতর—ইন্দ্রিয়সংবেদনার ঐশ্বর্যের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে মননের দীপ্তি। সেই মননোদ্ভাসিত প্রকৃতিচেতনার আলোকে প্রেম হয়েছে তাৎপর্যগভীর। ইতিহাসচেতনার অঙ্গীকারে এবং প্রকৃতিজীবনের একাত্মতার মধ্য দিয়ে প্রেম বঞ্চনা ও প্রাপ্তির, বিষাদ ও উল্লাসের ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমারেখা পেরিয়ে বিশ্বজনীন মূল্যমহিমায় অভিষিক্ত ও অভিব্যক্ত হয়েছে। এরই ফলে অধিকাংশ প্রেমের কবিতা, যেমন 'বনলতাসেন' 'সুরঞ্জনা,' 'মিতভাষণ,' 'সবিতা' বা 'শ্যামলী' এমন এক ভাবঅনন্যতা পেয়েছে যা কবিতার স্নিগ্ধ সুষমা-মণ্ডিত বাণীরূপেও প্রতিফলিত।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মহাপৃথিবী'-কে কবি একটি সংলগ্ন বা পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তবু 'মহাপৃথিবী'র অন্তর্গত

কবিতাবলী মৌলভাব ও সুরের বিচারে বহুলাংশেই বিচ্যুত 'বনলতাসেন' গ্রন্থের নিবিষ্ট প্রকৃতিমুখিনতার প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা থেকে। 'মহাপৃথিবী'র আপৎকালীন প্রেক্ষাপটে বিপন্ন মানব অস্তিত্বের গ্লানিদীনতা, উদভ্রান্তি ও অনিশ্চিতি মানবমানবীর প্রেমপ্রসঙ্গকে করে তুলেছে গৌণ। অন্যদিকে নৈসর্গিক অস্তিত্বের জৈবতা ও নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিতি প্রশ্ন চিন্তা ও নিশ্চয়তাহীনতায় দীর্ণ বিশশতকী জীবনের সঙ্গে কবির সংকল্পনা-সৃষ্ট প্রকৃতি-পৃথিবীর ব্যবধান ও অনম্বয়ই প্রকট করে দেয়। সিন্ধুসারসেরা জানেনা মানবের রক্তাক্ত অন্বেষা ও ব্যর্থ স্বপ্নের কাহিনী; যে জীবন ফড়িঙের 'দোয়েলের' তার সঙ্গে মানুষের কোনও দিন দেখা হয়নাকো৷ জেনেই আত্মঘাতী চলে আসে অশ্বত্থের কাছে। প্রেম ও প্রকৃতির নিকট হতে ক্রমাপসারিত এবং রূঢ়বাস্তব পৃথিবীর সন্নিকটবর্তী কবি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের বিরতিহীন অচরিতার্থতার শ্রম। তাই 'লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে'[১৬] তিনি প্রার্থনা করেছেন 'মনোবীজ'। আর সেই বীজ যখন উপ্ত হয়েছে চেতনায় তখন 'কান্তারের পথে সৌন্দর্যের ভূতের মতন'[১৭] তিনি আবিষ্কার করেন 'প্রণয়ের সম্রাজ্ঞী'দের। এক বিপন্ন পৃথিবী যখন'সৌন্দর্যকে ফেলিতেছে ছিঁড়ে', তখন পৃথিবীর বয়সিনী সেই 'সুরঞ্জনা'দের জীবনানন্দ হারিয়ে যেতে দেখেন কুশ্রীতার মধ্যে

—তুমিও তো পৃথিবীর নারী

কেমন কুৎসিত যেন[১৮]

একদা যারা ছিল অপ্সরা উর্বশীর মত ক্রমে বাদুড়ের খাদ্য হয়ে যায় তারা; 'পৃথিবীর মানুষীর রূপ' ব্যবহৃত হতে হতে শেষপর্যন্ত 'শূয়ারের মাংস' হয়ে যায়।[১৯] এভাবেই 'মহাপৃথিবীর' জগতে প্রেমের সৌন্দর্য আর মাহাত্ম্য

১৬। সিন্ধুসারস / মহাপৃথিবী।

১৭। আট বছর আগের একদিন / মহাপৃথিবী।

১৮। মনোবীজ / ম. পৃ.।

১৯। আদিম দেবতারা / মহাপৃথিবী।

যুগবৈগুণ্যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং প্রেম হয়েছে নির্দেশে পরাহত, অচরিতার্থ, প্রেরণাবিহীন নিরাশ্বাস এক বোধ।

প্রেমের এই নিরর্থকতা ও প্রেরণাবিচ্যুতির বোধ 'মহাপৃথিবী'র 'প্রেম অপ্রেমের কবিতা'শীর্ষক তিন স্তবকবন্ধেই স্ফুট হয়েছে। কবি অনুভব করেছেন 'পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি' বদলে ফেলেছে যেন 'দানবের মায়াবলে'। পুরোনো বিশ্বাস বোধ সংকল্প ও স্বপ্নের জগৎ মৃত ; নতুন কোনও প্রত্যয়ও জন্ম নেয়নি :

'একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে
আরেকটি পৃথিবীর দাবী
স্থির করে নিতে হলে লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স,
সে সকাল কখনো আসেনা ঘোর স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।

এই ঘোর অমাময়ী রাত্রির দেখা জীবনানন্দের পাঠক পান 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'র জগতে পৌঁছে। কিন্তু, তার আগে এই সন্ধিপর্বে, যখন সবকিছুই ধ্বংস ও পতনের তীরে, তখন মানবহৃদয়ের প্রেমচেতনাও অবসিত নিরালোক প্রত্যয়হীনতায় যার প্রতিধ্বনি 'মহাপৃথিবী'র কবিতার চরণে চরণে :

ক। তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চলে গেলে কবে
সেই থেকে অন্যপ্রকৃতির অনুভবে

খ। সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চলে গেছে।
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।

গ। তোমার সংকল্প থেকে খসে গিয়ে ঢের দূরে চলে গেলে তুমি,[২০]

কিন্তু এর বিকল্পে 'মহাপৃথিবী'র কাব্যজগতে নেই কোনও তীব্র অন্বেষার আর্তি, নেই অন্যতর প্রত্যয়ের আহ্বানও, আছে এক বিপন্ন মানবঅস্তিত্বের কাহিনী যা আমাদের জানিয়ে দেয় 'নারীর হৃদয়

২০। প্রেম অপ্রেমের কবিতা / মহাপৃথিবী।

প্রেম শিশু গৃহ নয় সবখানি'।[২১] উদ্‌ভ্রান্তি বিমূঢ়তা, এবং প্রেমের আলোকদেশিতা বা অন্য কোনও প্রেরণাউদ্দীপ্তির অভাবে 'মহাপৃথিবী' যেন মোহভঙ্গের তিক্ততা ও বিবমিষায়ে সংক্ষুব্ধ। প্রেমের অন্তর্ধানের পর :

ক। হলেও বা হয়ে যেতো এ জীবন দিনরাত্রির মতো মরুভূমি

খ। তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা,
জীবনেও নেই কো অন্যথা,

গ। হেমন্তের সহোদর রয়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি
উদাসীন।[২২]

আসলে 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে কোনও শুদ্ধ প্রেমের কবিতাই নেই। যা আছে তা প্রকৃতির সান্ত্বনা ও প্রশান্তির জগৎ থেকে উৎক্ষিপ্ত মানবের অনিকেত অস্তিত্বের মধ্যে অপসৃয়মান, ব্যবধানদীর্ণ প্রেমানুভূতির আকস্মিক আবির্ভাব, (উল্লেখ বলাই হয়তো আরও সঙ্গত) যা সাম্প্রতের গ্লানি ও অবক্ষয়ী জীবনের স্বরূপ আরও উলঙ্গ করে উন্মোচিত করে দেয়। একটি কথা উল্লেখ না করে পারি না, নারীর প্রেমের প্রতিশ্রুতিহীনতায় বিশ্বাসভ্রষ্ট কবি প্রেমপাত্রীর জীবন থেকে সরে যাওয়ার পর প্রকৃতি ('অন্যপ্রকৃতির অনুভবে') ও গ্রন্থের নিকট আত্মসমর্পন করেছেন প্রেরণা ও প্রত্যয়ের প্রার্থনায়। কিন্তু সেখানেও যথেষ্ট উদ্দীপ্তির অভাবে কবিকে শেষে বলতে হয় 'হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে'। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'ফিরে এসো' কবিতাটির আর্ত আহ্বানের স্পষ্ট আন্তরিকতা বিচার্য। প্রেমকে সেখানে তিনি প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন সেই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নিসর্গজীবনের প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের জগতে ('আম নিম ঝাউয়ের জগতে')। প্রেমের অবক্ষয়, বিশ্বাসভ্রষ্ট পৃথিবীতে তার দূরাপসারণ, অন্তর্ধানের স্থির, স্পষ্ট অথচ

২১। আট বছর আগের একদিন / ম. পৃ.।

২২। প্রেম অপ্রেমের কবিতা / ম. পৃ.।

শোকাবহ কাব্যোচ্চারণই পরবর্তী গ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমিরের' মুখবন্ধী কবিতা 'আকাশলীনা'কে যেমন আধুনিক মানস-অভিজ্ঞতার প্রতিনিধি করেছে, তেমনই মানবহৃদয়ের মৃত্যুহীন প্রেমচেতনাকে এক সমকালচিহ্নিত অথচ চিরন্তন বাণীরূপ দিয়েছে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 'বনলতাসেন' গ্রন্থের 'শঙ্খমালা' কবিতাটিতে কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের নারী কবেকার শঙ্খিনীমালাকে চিতার আগুনে পুড়ে যেতে দেখেছিলেন, সে চিতা কান্তারের পথে সন্ধ্যার আঁধারে আবির্ভূতা এক রমণীর চোখের আগুন। এই রমণীর পরিচয় আরও স্পষ্টতর হয় 'মহাপৃথিবী'র অন্তর্গত 'মনোবীজ' কবিতাটির অনুধাবনে। 'মনোবীজ' কবিতায় এই রমণীর দেখা মেলে আবার সেই কান্তারের পথে। এখানে কবি তাকে আবিষ্কার করেন 'সৌন্দর্যের ভূতের মতন'। যে পৃথিবীতে স্বপ্ন অবসিত, সৌন্দর্য ছিন্নভিন্ন ('পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে') সেখানে প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা তো যুগবিলীন মালিন্যেই উপস্থিত হবে। এই কবিতাটিতে এবং অন্যত্র ('আদিম দেবতারা') জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি প্রেমের সমুজ্জ্বল মহিমার অবক্ষয় ও দেহসর্বস্বতায় হারিয়ে যাওয়ার কথা। 'পৃথিবীর মানুষীর রূপ' 'স্থূল হাতে ব্যবহৃত' হয়ে 'শূয়ারের মাংস' হয়ে যায় অপ্সরা উর্বশীরা 'ডাইনির মাংসের মতন' তাদের 'জঙ্ঘা ও স্তন' মেলে ধরে। 'মহাপৃথিবী'র প্রধান উচ্চারণ তাই, অন্যান্য প্রসঙ্গে যেমন কবির প্রেমভাবনার ক্ষেত্রেও তেমনই, মূল্যবোধ ও আদর্শবিচ্যুতির অনুষঙ্গে ঘনীভূত হয়ে ওঠা এক শোকাবহ নিস্পৃহা, কবি নিজে যাকে বলেছেন, 'জীবনের হেমন্তকাল'—'সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন' এক নৈরাশ্য।

'সাতটি তারার তিমির—বেলা অবেলা কালবেলা' পর্বে পৌঁছে জীবনানন্দের কবিতার পাঠক বিশ্বসঙ্কটের বিষমানুপাতিক টানে তাঁর কাব্যের ভাব ও বাণীরূপ, বিষয় ও চারিত্র্য আমূল পরিবর্তিত হতে দেখেন। পূর্ববর্তী কাব্যজগতের মূলত নৈসর্গিক শান্তি ও

সৌন্দর্যের সমাহিতির রূপ ভেঙে দিয়ে এখন তাঁর রচনায় প্রবলভাবে প্রবেশ করতে চাইছে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের অভিঘাতে বিপর্যস্ত বিশ্বমানবের বিপন্ন নাগরিক অস্তিত্ব। সে বিপন্নতা, 'মহাপৃথিবী'র পাঠকমাত্রই জানেন, তীব্রতম উপলব্ধির প্রহারে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও উত্তরব্যক্তিক যুগ-যন্ত্রণার উদ্‌ভ্রান্তি ও নৈরাশ্য থেকে সঞ্জাত। জীবনানন্দের তৎকালীন কাব্যসৃষ্টির পরিধির মধ্যে 'মহাপৃথিবীতে'ই এই বিপন্নতার বোধ গাঢ়তর এবং নাগরিক জীবনের বাস্তবতার স্পর্শে তীব্র। তবু, 'মহাপৃথিবী'কে জীবনানন্দ 'বনলতাসেন'-এর সংলগ্ন গ্রন্থ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতিলোক ও নগরজীবন উভয়েরই অন্তঃসারে কবিচেতনা তখনও পর্যন্ত দুই ভিন্নাবর্তে ঘূর্ণিত। একদিকে, 'আট বছর আগের একদিন'-এর মত কবিতায় আধুনিক মানবের তীব্র বিপন্নতার বোধ ; অন্যদিকে, 'সিন্ধুসারস', 'ফিরে এসো,' 'শ্রাবণরাত' কিংবা 'বলিল অশ্বত্থ সেই' প্রভৃতি কবিতার নিসর্গমদিরতা। উপলব্ধির এই দ্বিচারণিক স্পৃহা ও প্রবণতা 'মহাপৃথিবী'র কাব্যজগৎকে করেছে সন্ধিপর্বের লক্ষণযুক্ত। কিভাবে 'মহাপৃথিবী' কবিচেতনা 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে' অবলীন হলেও নিসর্গপৃথিবীর প্রশান্তি ও কল্যাণবহ প্রত্যয়ের আকাঙ্ক্ষায় একাগ্র ছিল, তার স্বপক্ষে একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি :

> অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
> রূপ কেন নির্জন দেবদারু দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনেনা—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?

'আদিম দেবতারা' নামক বিখ্যাত কবিতাটির থেকে উদ্ধৃত এই চরণগুলির তাৎপর্য অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে। 'নির্জন দেবদারু দ্বীপ ও 'নক্ষত্রে'র উল্লেখ 'সুচেতনা' কবিতাটির ভাবানুষঙ্গ বহন করে আনে :

> সুচেতনা তুমি এক দূরতর দ্বীপ
> বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;

সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা
সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে,
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

মানবহৃদয় তথা সমাজ থেকে যে সু-চৈতন্য দূরনির্বাসিত, তাকে কবি 'নির্জন দারুচিনি বনানী' তথা প্রকৃতিপৃথিবীর প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের জগতে আবিষ্কার করেন। আবহমান মানবসত্তা যে তারই প্রেমে চিরপ্রাণিত 'বনলতাসেন' গ্রন্থের কবিতাবলীর মৌলভাব-প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্ধৃত চরণগুলিতে সেই কথাটিই অভিব্যক্ত। 'মহাপৃথিবী'র ধ্বস্ত আধুনিক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কবি আহত বিমূঢ়তায় যেন প্রশ্ন করেন: পৃথিবীর মানুষীর রূপ তথা সৌন্দর্য কেন সেই নির্জন দেবদারু দ্বীপের (নিসর্গ ভুবন) নক্ষত্রের (ধ্রুবতার প্রতীক) ছায়া চেনেনা, অর্থাৎ এককথায়, সু-চেতনায় আশ্রিত নয়। সৌন্দর্য ও মঙ্গলের চিরঅনন্বয়ের প্রাচীন বেদনাই এখানে আধুনিক মানবের অভিজ্ঞতার নিকষে প্রতীকী কবিতার তির্যগ তীব্রতায় অভিব্যক্ত। অনুরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে 'বনলতাসেন' গ্রন্থের 'সুদর্শনা' কবিতাটিও বিচার্য হলে গভীর অর্থময় হয়ে দেখা দেয়। আরও বহু অনুদ্ধৃত উল্লেখের সমর্থন পাঠককে জীবনানন্দের মধ্যপর্যায়ের কাব্যের অন্তিমপর্বে, অর্থাৎ 'মহাপৃথিবী'র কবিতাবলীর রচনাকালের শেষ-পর্যায়ে কবিমানসে প্রকৃতিভুবনের সৌন্দর্য ও শান্তি ফিরে পাবার অন্তঃশীলপ্রচ্ছন্ন-আকাঙ্ক্ষাটি স্পষ্ট করে।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থ বা তৎপরবর্তী কবিতা কিন্তু এই সন্ধিপর্বসুলভ দ্বিধা বা দ্বিচারণা থেকে মুক্ত। নৈসর্গিক অভিকর্ষের বাইরে, সমকাল ও প্রতিবেশের অগ্নিপরিধির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনানন্দের কাব্যজীবনের এই ঊনশেষতম পর্যায়, দুই বিশ্বমহাযুদ্ধের

অন্তর্বর্তী ও সমসাময়িক কাব্যে, যার কিছুটা সংকলিত 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে, নিসর্গ জীবনের শান্তি সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রসঙ্গ তিরোহিত ; পরিবর্তে এসেছে ভয়াল অন্ধকারময় এক নাগরিক জগৎ যেখানে মানুষের সংকটময় জীবন কেবলই জেগে ওঠে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে', যেখানে 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' অস্তিত্বে নিমজ্জিত-মানব দিশাহীন সভ্যতার স্মরণীয় উত্তরাধিকারের দিকে তাকিয়ে দেখে 'সেইসব রীতি আজ মৃতের চোখের মত তবু'—যেখানে 'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে'। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের অজস্র অনুরূপ উল্লেখ এক সমাচ্ছন্ন অন্ধকার, সভ্যতার জান্তব অধঃপতন ও মূল্যবোধ-বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবহ। এই পরিব্যাপ্ত মূল্যবোধহীনতা ও বিপর্যয়ের আলোকে 'সাতটি তারার তিমির' চিত্রকল্পটিও অর্থবহ হয়ে ওঠে। 'সাতটি তারা' আমাদের মনে আনে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অনুষঙ্গ যা চিরকাল অন্ধকার রাত্রিতে, সমুদ্রে, বিপর্যয়ের ঘনঘটায় মানবকে দেখিয়েছে পথ। তেমনই যে সমস্ত মূল্যবোধের আশ্রয়ে মানুষের সমাজ এতকাল লালিত ও প্রাণিত হয়েছে, যুদ্ধ-অবলীন পৃথিবীর এই সংকট-কালে যে সবকিছুই নির্দেশে ব্যর্থ, তাই নিরর্থক। সপ্তর্ষিমণ্ডল বা সাতটি তারা আজ আর আলোকদেশি নয়, তিমিরাচ্ছন্নতায় অবলীন। স্বাভাবিকভাবেই এই আবিশ্ব ঘোর অমানিশায় পথভ্রষ্ট মানবিক পৃথিবীতে প্রেম ও প্রকৃতির ভূমিকা গৌণ ও অনুল্লেখ্যপ্রায় হয়ে পড়েছে ; কারণ জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্য রচনায় প্রেম ও প্রকৃতিই বারংবার আবির্ভূত হয়েছে প্রেরণা ও শুভচেতনার কল্যাণ-ভূমিকায়। এ প্রসঙ্গে কবি নিজে মনে করেছেন তার 'শেষের দিকের কবিতায়' 'পারিপার্শ্বিক-চেতনা' 'প্রৌঢ় পরিণতি' লাভ করেছে। সে পারিপার্শ্বিক অবশ্যই সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে।

'সাতটি তারার তিমির' ও তৎপরবর্তী কাব্যের আলোচনায় এই দিকপরিবর্তন ও কাল-প্রেক্ষিত বিস্মৃত হওয়া যায় না। এ সময়কার

কাব্যে প্রেমের ভূমিকা-নির্ণয়ে আগ্রহী পাঠক কবিকে বলতে শোনেন : 'প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে' কিম্বা 'প্রেমিককে শেখায়েছি ফাঁকির কৌশল'। প্রেমের দিব্যপ্রেরণা ও মূল্যমহিমার এই অপহ্নব 'আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে' সপ্রতিভ রূপসীর মত বিচক্ষণ, যে কোনও 'রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে'। এক দিৎসাহীন প্রেমবিবিক্ত অন্ধকার আধুনিক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে 'অচল অভ্যাসের ভিতর' চেতনা ও বিবেক হারিয়ে যেতে দেখে কবির মতন পাঠকও যেন বলে ওঠেন : 'প্রেম নেই প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে'। 'সাতটি তারার তিমির' তাই বীতপ্রেম বিশ্বাসরিক্ত আধুনিকের মনের ছবিটিই প্রবল-ভাবে এঁকেছে। কথনও ক্ষীণ বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত হয়তো বা শোনা যায় প্রেমের প্রত্যয় ও স্বপ্ন ফিরে পাবার ব্যাকুল আহ্বান : 'কোথায় প্রেমিক তুমি দীপ্তির ভিতরে'। লক্ষণীয় 'দীপ্তি' শব্দটি এখানে কিরকম অর্থবহুভাবে সুপ্রযুক্ত, শুধুমাত্র জ্যোতি বা আভা নয়, শব্দটির উদ্দিষ্ট অভিধা এখানে উদ্দীপ্তি বা প্রেরণার ইঙ্গিত নিয়ে আসে, যে প্রেরণা কবি তাঁর ইতিহাসবেদী প্রজ্ঞায় জানেন, প্রেমই ফিরিয়ে দিতে পারে অবিশ্বাসী মানবসমাজকে। এই উপলব্ধির আলোকে যখন 'দীপ্তি' ও 'জনান্তিকে' কবিতা দুটি পড়া যায় তখনই তারা উন্মোচিত হয় তাৎপর্যে। 'জনান্তিকে' কবিতাটির আরম্ভেই রয়েছে এক প্রেমবিবিক্ত অন্ধযুগের উদ্‌ভ্রান্ত মানবঅভিজ্ঞতার কথা ; মানুষের চেতনার গভীরে তবু নিহিত রয়েছে এক শুভ প্রেমবোধ :

> তোমাকে দেখার মত চোখ নেই—তবু
> গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই তুমি
> আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।

আধুনিক মানবের বিপন্ন অভিজ্ঞতার ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন, মেশিন ও মেশিনের দেবতার জোরে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল। যুদ্ধ-আলোড়িত

পৃথিবীতে কোথাও নেই সান্ত্বনা ও শান্তির নীড়। এই রিক্ততা ও উদ্‌ভ্রান্তির মূলে কিন্তু আছে জাতি ও নেশনের প্রতিভূদের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিবেকবর্জিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়েও যা বড় সেই আধুনিক মানুষের যান্ত্রিক হৃদয়হীনতা। তাই 'মানুষের হৃদয়কে না জাগালে', প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয় প্রেম ও সৌন্দর্যের 'সুনিবিড় উদ্বোধনে' জাগরিত করতে না পারলে, মানবতার মুক্তি নেই, মুক্তি নেই মানুষের অন্তর্লোকের চির-মানবের :

> মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
> ভোর, পাখি অথবা বসন্তকাল বলে
> আজ তার মানবকে কি করে চেনাতে পারে কেউ।

চারিদিকে রণরক্ত মৃত্যু ও অন্ধ উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে জীবনানন্দ অনুভব করেন 'আরো এক আভা' যা আমাদের 'এই ধৃষ্ট শতাব্দীর' হৃদয়ের জিনিস না হয়েও চিরন্তন মানবতার 'হৃদয়ের নিজের জিনিস' হয়ে রয়ে গেছে। সংস্কার, গ্রন্থ বা বিজ্ঞানের কাছে নয়, মানবকে ফিরে যেতে হয় মানব-হৃদয়ের সেই শাশ্বত প্রেমবোধের উদ্দীপ্তি বা প্রেরণারই কাছে শুভ ও শান্তির প্রত্যাশায়। তখন প্রেয়সী নারী হয়ে ওঠেন প্রতিভূ ও প্রতীক :

> অপরনারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে
> অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
> আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরো নারী
> আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল
> রয়ে গেছে।

'জনান্তিকে' কবিতার এই 'আদিনারী শরীরিনী' যাকে কবি 'মানবের হৃদয়ের ভাঙ্গা নীলিমায়' কিম্বা 'বকুলের বনে অপার রক্তের ঢলের মধ্যেও চিরজীবিতের মত আবিষ্কার করেছেন, 'দীপ্তি' কবিতাটিতে তাকেই আবার পাঠক দেখেন সাম্প্রত ও শাশ্বতের অনন্বয়ের পটভূমিতে : 'তুমি যত বহে যাও / আমি তত বহে চলি /

'তবুও কেহই কারু নয়'। এই অনন্বয়ের পশ্চাদভূমিতে রয়েছে বিশ্ব-সংকট ও মূল্যবোধের বিপর্যয়। 'কলকাতা থেকে দূর / গ্রীসের অলিভবন' 'রক্তের সমুদ্রে' যখন একাকার এবং অগনন মানুষের নিরন্তর মৃত্যুর ঘটনাও যখন 'ব্যসনের মত মনে হয়', তখন মৈত্রেয়ীও ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর হয়ে দেখা দেন। তবুও এই গ্লানি অবলীন সাম্প্রতের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের দিৎসাহীন স্তব্ধতার মধ্যেও মানুষের অন্তর্লোকের 'মানব' তার চেতনায় অনুভব করে: 'তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে।'

'সাতটি তারার তিমির' বা এই পর্যায়ের কাব্যসৃষ্টির চেতনা পটভূমিটির উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। যে অন্ধ দেশকালে মানুষ কেবলি জেগে উঠেছে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে', সেখানে সমাজ চাইছে সকলের কাছ থেকে নিরন্তর 'তিমির বিদারী অনুসূর্যের কাজ'। যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে মূল্যবোধের ব্যাপক বিনষ্টিতে যখন ঘরে ও বাহিরে নিরন্তর তমসা এবং সেই ভীষণ অমার উৎস শুধু বহির্জাগতিক বিপর্যয়ই নয় ('এই দিকে ঋণ, রক্ত লোকসান, ইতর, খাতক,'),[২৩] মানবের হৃদয় থেকে 'মহৎ সত্য বা রীতি' অর্থাৎ সকল মূল্যবোধের অন্তর্ধান, যার পরিণামে বিশশতকী মানুষের নাগরিক পৃথিবী হয়ে যায় 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো'[২৪] এবং কবি অনুভব করেন, সত্যভ্রষ্টের মতো, সভ্যতার এই জান্তব অধঃপাতের পেছনে আছে 'হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস'[২৫]। 'সাতটি তারার তিমির,' গ্রন্থে যে নিরন্ধ্র তিমিরাচ্ছন্নতার সম্মুখীন হন জীবনানন্দের পাঠক, তা প্রতিবেশজাত এবং সমকালবদ্ধ। কবি এই অমারাত্রি উৎস দেখেছেন মানুষেরই অধঃপতিত 'ইতিহাসবিবর্ণ' হৃদয়ে ('বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের রাত্রির বেবুন')[২৬]। কিন্তু অন্ধ যুগতমসা ও বীতবিশ্বাস উদভ্রান্তি থেকে মানবের অন্তর্লোকের প্রেমবোধই যে

২৩। 'নাবিকী' / সা. তা. তি.। ২৪। রাত্রি / সা. তা. তি.।
২৫। সূর্যপ্রতিম / সা. তা. তি.। ২৬। উৎসর্গ / সা. তা. তি.।

মুক্তির পথ দেখাতে পারে এ কথাও বারম্বার উচ্চারিত হয়েছে জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ের কাব্যরচনায়, কিছুটা ক্ষীণ ও বিক্ষিপ্তভাবে 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে, প্রবলতরভাবে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এবং একেবারে অনন্যনিরপেক্ষভাবে তাঁর শেষতম রচনাসম্ভারে। প্রেমের শক্তি ও প্রেরণায় এই আস্থাশীলতা 'মহাপৃথিবী' 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের কাব্যের প্রবলবিবমিষা, বিদ্রূপ ও উদভ্রান্তির বিপরীতে কবিচেতনার অন্তঃশীল মৌল আস্তিকতার প্রতিই সংবেদনশীল পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে।

'সাতটি তারার তিমির'-এর নাগরিক জগৎ ভাব ও আবহে যেমন কাব্যসৃষ্টির পূর্ব-পর্যায়ের শান্ত নির্জন প্রকৃতিভুবন থেকে দূরস্থিত তেমনই প্রেমও এ জগতে তার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও মহিমা থেকে স্খলিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থের প্রারম্ভিক কবিতা 'আকাশলীনা'র নায়িকা সেই 'পৃথিবীর বয়সিনী,' প্রেমস্বরূপা 'সুরঞ্জনা'কে কবি দেখেন যুবকের বাহুলগ্না, দুরাপস্রয়মানা। স্পষ্টতঃই যুবক এখানে দেহী বাসনার, জৈব জীবনের প্রতিভূ; 'সুরঞ্জনা' যুগাবলীন মালিন্যে অধঃপতিত। মনে পড়ে 'বনলতাসেন' গ্রন্থে আমরা যে 'সুদর্শনা' নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম তিনি 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে' লীন হতে না দিয়ে তাঁর প্রেমিকের চেতনাকে করেছিলেন অমৃতসূর্যমুখী। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে সেই কবিরই উপলব্ধিতে প্রেম মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মহিমাবিহীন, জৈবজীবন উপচারে পর্যবসিত। 'বনলতাসেন' কাব্যের ইতিহাস-উদ্বর্তিত চির-শ্রীময়ী 'সুরঞ্জনা'র হৃদয় তাই জীবনানন্দের কাছে 'ঘাস', ইতরপ্রাণের খাদ্যবস্তু হয়ে দেখা দেয়। গ্রন্থের অন্তিম কবিতা 'সূর্যপ্রতিম'—সেখানেও যুগের যন্ত্রণাহত মানব-চেতনার নিকষে প্রেমের অবমূল্যায়নের অভিব্যক্তি—'প্রেমিককে শেখায়েছি ফাঁকির কৌশল। শেখাইনি?'[২৭] শতাব্দীর যুদ্ধধ্বস্ত সামাজিক ভূখণ্ডে মূল্যবোধবিবিক্ত নাগরিক দুনিয়ার 'মূর্খ আর রূপসীর

২৭। সূর্যপ্রতিম / সা. তা. তি. ; পৃঃ ৭৯।

ভয়াবহ সঙ্গম'ই স্বাভাবিক। তাই 'নিবিড়রমণী' তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে, 'অনেক রক্তমলিন পথ' হেঁটে 'আজ এই সময়ের পারে' খুঁজে পায় 'আবহমানের ভাঁড়'কে।[২৮] জ্ঞান ও প্রেমের যে শুভ অন্বয় বা মিলনের স্বপ্ন ও নির্মাণ জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্যে অভিব্যক্ত; 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ের রচনায় তাদের ব্যবচ্ছেদ ও অনন্বয়ের যন্ত্রণাই প্রধান। প্রেমের এই অবমূল্যায়ন ও নিরর্থকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এ কালের কাব্যে তমসার আধিপত্য। কারণ, নারীকে জীবনানন্দ বারবার দেখেছেন জ্যোতিস্বরূপে—প্রেমের আন্তরমূল্যেই নারীকে ঘিরে এই উদ্ভাসনা, এই আলোকদেশিতা। তাঁর 'সুরঞ্জনা' ('বনলতাসেন') 'দেহ দিয়ে ভালোবেসে' তবু 'ভোরের কল্লোল' হয়ে ওঠেন, যাঁর আলোকদেশি আহ্বান কোনও একদিন ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রকে যেমন, তেমনই অন্ধকার সমুদ্রের অন্বেষাক্লান্ত মানবকে, যুগ যুগে নবসভ্যতার উদয়সৈকতে ডেকে নিয়ে আসে। তাঁর 'মিতভাষণ' কবিতার নায়িকার হাতে সেই 'মণিকা-আলো' যা শ্রেয়তর বেলাভূমিতে নাবিককে আহ্বান জানায়। 'শ্যামলী' বা 'মিতভাষণ'-এর নায়িকার মুখশ্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিকে ব্যবহার করতে হয় 'প্রতিভা' শব্দটি যা অভ্রান্তভাবেই বিভা বা ঔজ্জ্বল্যের দ্যোতক। আর 'সবিতা'র নায়িকার মুখ স্পষ্টতই 'অন্ধকার থেকে এসে নবসূর্যে জাগার মতন' বলে কবির কাছে মনে হয়েছে।

এভাবেই জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্যসৃষ্টিপটে নারী বারবার আবির্ভূতা এক উজ্জ্বল আলোকবৃত্তে। এই আলো অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে প্রয়াণের পথ-নির্দেশী; সে প্রয়াণ ইতিহাসবেদে জারিত প্রেমচেতনার আলোকে, জীবনানন্দের পাঠককে জেনে নিতে হয়, নবসভ্যতার শ্রেয়তর বেলাভূমির অন্বেষায়। স্বভাবতই আলোক-মহিমাময়ী, প্রেরণাদাত্রী ও সভ্যতার ধাত্রী এই জীবনানন্দীয় নারী

২৮। উন্মেষ / সা. তা. তি. ; পৃঃ ২৪।

'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে অনুপস্থিত। কারণ, এ কাব্য সমাচ্ছন্ন আঁধারের কাব্য যেখানে 'পৃথিবী প্রতিভা হয়ে আকাশের মত শুভ্রতাকে' চেয়ে শেষ পর্যন্ত 'ভঙ্গুর হয়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায়'। তবু, এখানেও কবির চেতনালোক থেকে সেই 'আদি শরীরিনী নারী' নির্বাসিত নন। কবি গভীর বিস্ময়ে টের পান প্রেম এখনও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছে। 'দীপ্তি' ও 'জনান্তিকে' এ দুটি কবিতাই এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তবে, প্রেম বা নারী 'সাতটি তারার তিমির'-এ ঈপ্সিত ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়—প্রেমের সেই প্রাচীন প্রেরণাশক্তির অন্তর্ধানই বরং প্রকটতর। তার কারণ ইতিহাসবেদী চেতনার আলোকে স্বকাল ও প্রতিবেশে নিবদ্ধ কবি জেনেছেন: 'তিমির হননে' অগ্রসর হয়ে আমরা আজ 'তিমিরবিলাসী' বলেই 'কোথাও দিৎসা নেই,' 'প্রেম নেই'। পুনরাবৃত্তির মত শোনালেও বলতে হয়, জীবনানন্দ প্রেমের দিব্য-প্রেরণার শক্তিতেই যুগবিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও সম্পূর্ণ আস্থাভ্রষ্ট হতে পারেন নি :

> চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনান্তিকে
> চোখে থেকে যায়
> আরো এক আভা :
> আমাদের এই পৃথিবীর এই ধ্বস্ত শতাব্দীর
> হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস
> হয়ে তুমি রয়ে গেছ ![২৯]

এখানেও সচেতন পাঠককে লক্ষ্য করতে হয় নারীর প্রেমপ্রতিমা ঘিরে 'আভা', তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি ভোরের আলোকলগ্ন। জীবনানন্দের চেতনায় প্রেম তাই সর্বদাই এক দীপ্ত আলোকবৃত্তের অনুষঙ্গে সৌন্দর্য ও পবিত্রতার মেলবন্ধনে আবির্ভূত। প্রেমকে কেন্দ্র করে নারীর রূপবর্ণনায় কবি 'আভা' 'দীপ্তি', 'প্রতিভা'র মত ঔজ্জ্বল্য-

২৯। জনান্তিকে/সাতটি তারার তিমির।

দ্যোতক শব্দগুলিকে বেছে নিয়েছেন। যা আলোকদেশি তাই তিমির হন্তারক; তাই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই নারীকেই জীবনানন্দ 'তিমির-পিপাসী' রমণীর চিত্রকল্পে অঙ্কিত করেছেন 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে। তিমিরপিপাসী নারী-প্রেয়সীকে হারিয়ে নাবিক-মানবতা আজ পথভ্রান্ত; সভ্যতার প্রয়াণ ও উত্তরণও তাই যেন স্তব্ধ জড়ীভূত।

পরবর্তী গ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কালপ্রেক্ষিত কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত অগ্নিমুহূর্ত নয়, এক উত্তরসামরিক অধ্যায় যেখানে বহির্জাগতিক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিপর্যস্ত মানব-চেতনা নির্মাণ ও সৃজনের মৃত্যুহীন শক্তিগুলি চিনে নিতে, সংঘবদ্ধ করে নিতে চাইছে। স্বাভাবিকভাবেই মানবহৃদয়ের দুর্মর প্রেমবোধ, যা জীবনানন্দের কাব্যে চিরদিনই সৃজনের প্রতীতি ও উৎসবের প্রতীকে অভিব্যক্ত, এ গ্রন্থে আরও প্রবল ও প্রয়াণমুখী ভূমিকায় উপস্থিত। প্রেমের আধারস্বরূপা প্রেয়সী নারীও অঙ্কিত হয়েছেন সৃষ্টির প্রেরণাদাত্রী ও সভ্যতার ধাত্রীর আলোকদীপ্ত দ্বৈত ভূমিকায়। তবে এখানেও জীবনানন্দ সমসাময়িক কালের তিমিরাচ্ছন্ন রক্তঅবলীন রূপটিকে বিস্মৃত হননি, উপেক্ষা করতে পারেননি। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে প্রেমের মূল্যমহিমা খণ্ড আপতিক দেশকালের দৌরাত্ম্যে অধঃপতিত, 'বেলা অবেলা'য় সেই প্রেম ইতিহাস চেতনার সঞ্জীবনে তার সনাতন কল্যাণশক্তিতে পুনরুজ্জীবিত। 'বেলা অবেলা'র মুখবন্ধী কবিতায় ঘোর তমিস্রার মহাবিশ্বপটে একটি পবিত্র নারীবোধনের সুর অনুরণিত; জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল আলোকবৃত্তের মত সৃষ্টির নিদ্রাহীন ধাত্রীর ভূমিকায় আবিষ্কৃত হয়েছেন শাশ্বত মানব-প্রেয়সী :

> মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
> মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছে তার প্রতি
> লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
> দেহ হবে মন হবে তুমি হবে সে সবের জ্যোতি।[৩০]

৩০। মাঘ সংক্রান্তির রাতে/বেলা অবেলা।

এই মূল সুরটি গ্রন্থের অন্যান্য বহু কবিতায়ও প্রতিধ্বনিত। 'তোমাকে' কবিতাটির সমকালীন অবক্ষয়ের চিত্রে বিচ্ছিন্নতা ও বিনাশের অপশক্তিগুলিই সক্রিয় ('প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো')। তারই মধ্যে কবি নারীকে চেনেন 'ইতিহাসের শেষে' এসে 'মানব-প্রতিভার নিষ্ফলতার অক্ষম অন্ধকারে' এক মৃত্যু-হীন সৌন্দর্যদীপ্তির পরিচয়ে :

মানবকে নয় নারি শুধু তোমাকে ভালবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

'মানবকে নয় নারি'—কথাগুলি লক্ষণীয়। সমকাল ও যুগপ্রতিবেশবদ্ধ মানবকে জীবনানন্দ দেখেছেন ঐতিহ্যবিস্মৃত ('ব্যর্থ উত্তরাধিকারে'), মানবতাবর্জিত ('রক্তনদীর পারে') এবং জৈব জীবনে অধঃপতিত ('ক্রম-পরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী')। পৃথিবীকে যখন 'বলয়িত মরুভূমি' বলে কবির মনে হয়েছে এবং ইতিহাসবোধের মধ্যেও যখন তিনি আস্থা ও প্রেরণার বাণী খুঁজে পাননি, বরং ইতিহাসকে মনে হয়েছে 'গোলকধাঁধায় বন্দী মরুভূমি', তখন চারিদিকে 'মৃতোপম মানুষের ভিড়' থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নারীর মধ্যেই পেয়েছেন স্থির শুভ প্রেরণার আশ্বাস ও উদ্দীপ্তির বাণী :

মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন :
আমি যাকে ভালবেসেছি আবহমান কাল সেই নারীর।

আমাদের পূর্ববক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, 'সাতটি তারার তিমির'-এর নিরন্ধ্র আঁধারে আবৃত পৃথিবী কবির প্রেমচেতনার আলোকে প্রয়াণের পথ খুঁজে পায় যেন, 'বেলা অবেলা কালবেলা'র জগতে পৌঁছে।—

যে নারী দেখেনি কেউ—ছ'সাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ে এসেছে সেই নারী। ···
সৃষ্টির গভীর গভীর হংসীপ্রেম
নেমেছে—এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।[৩১]

৩১। অনেক নদীর জল/বেলা অবেলা।

'খণ্ডিত রক্তবণিক পৃথিবীতে' 'অন্ধকারে যে শরণ সবচেয়ে ভালো' সেই শরণই বেছে নিয়েছেন জীবনানন্দ, আর তা হল : 'যে প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো'।[৩২] এই জ্ঞানসিঞ্চিত প্রেমই প্রয়াণের শক্তিতে বলীয়ান, কারণ এই প্রেমই মানুষকে জানায় 'মানব ক্ষয়িত হয়না জাতি ব্যক্তির ক্ষয়ে' এবং সময়ের অমেয় আপতিক আঁধারে পৃথিবীতে বারবার 'জ্যোতির তারণ কণা আসে'। প্রেমই এ পৃথিবীতে নিয়ে আসে বারবার 'ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি'।[৩৩] এভাবেই একটির পর একটি কবিতায় আশ্চর্য অর্থগভীর সব চিত্রকল্পের মাধ্যমে মানবপ্রয়াণে নারীর প্রেমপ্রাণিত ভূমিকার কথা জীবনানন্দ তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যের অন্তিম পর্যায়ে। স্বকালচিহ্নিত অভিজ্ঞতায় 'আদি নারী শরীরিনী' প্রেমকে কবি নতুন করে চেনেন :

> অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে
> সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
> তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
> স্বর্গীয় শিখার মতো,
> সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার করে সে তো থাকবে
> এইখানেই,
> আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে। (সময়ের তীরে)

'সাতটি তারার তিমির'-এর পরবর্তী কাব্যসৃষ্টিতে প্রেমই প্রবলতম বিষয় হিসাবে আবির্ভূত, যদিও কখনও কখনও কবির দৃষ্টি প্রত্যাবর্তিত স্মৃতি, নির্জনতা ও সর্বোপরি প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের অনুষঙ্গময় প্রকৃতিলোকে। নিবিষ্ট পাঠক আরও অগ্রসর হয়ে কবির অন্তিমতম কবিতাবলীতে পৌঁছালে দেখবেন মানবীয় প্রেমের হৃদয়মূল্য এবং নৈসর্গিক প্রশান্তির সমাহারে এক নবজায়মান 'আলোপৃথিবী'র

৩২। যতদিন পৃথিবীতে/বে. অ.।

৩৩। অনেক নদীর জল/বে. অ.।

সংকল্পনা আন্তরিক প্রত্যয়ের শক্তিতে ও মন্ত্রকল্প ভাষার ধ্বনিময়তার প্রসাদে উজ্জ্বল বিগ্রহরূপ ধারণ করেছে। সে সবের পর্যালোচনার আগেই 'বেলা অবেলা'র চেতনা-গোধূলি উজ্জ্বল হয়েছে কবিমানসে প্রেমের ইতিহাসপ্রাণিত প্রেরণাপ্রবণ আবির্ভাবে। মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, 'বেলা অবেলা' বা তৎপরবর্তী কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত প্রেমের বিশ্বাসযোগ্যতার উত্তাপ অনুপস্থিত বা অস্বীকৃত হয়নি, তবে ব্যক্তিক উপলব্ধির খণ্ডিত সীমায় কবির প্রেমবোধ আবদ্ধ থাকেনি, আত্মস্থ হয়েছে ইতিহাসবেদী চিরমানব-চেতনার ঐতিহ্য। তাই 'এই পৃথিবীর সাটিনপরা দীর্ঘগড়ন' কোনো নারীকে দেখে কবির মনে হয়, 'সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভেঙে বৃহৎ সবিতা'র মতো সে আত্মপ্রকাশিত। অথবা অন্যত্র :

কোথাকার মহিলা সে? কবেকার? ভারতী নর্ডিক গ্রীক /
মুস্লিম ও মার্কিণ?

অথবা সময় তাকে সনাক্ত করে না আর, ('অবরোধ' / বে.অ.)
এভাবেই দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন চিরন্তনতায় ব্যক্তিগত প্রেমানভূতির তাৎক্ষণিক সীমারেখাগুলি অতিক্রান্ত হয়ে যায়, অনন্তকালের পটে অপরাহত আলোকবৃত্তের মধ্যে নারী এসে দাঁড়ান উদ্দীপ্তি ও প্রয়াণের বাণী বহন করে :

'নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে'।[৩৪]

'সাতটি তারার তিমির'-এর মুখবন্ধী কবিতাটিতে অপসৃয়মানা এক নারীর প্রতীকেই জীবনানন্দ আমাদের জানিয়েছিলেন সমরোত্তর নাগরিক পৃথিবীতে প্রেমের অবক্ষয় ও অধোগতির কথা। তবু 'ধৃষ্ট' স্বকালের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়েও তিনি ভুলতে পারেননি কুয়াশা ভেদ করে 'সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে' এগিয়ে যাওয়া এক অনন্যা

৩৪। সূর্য নক্ষত্র নারী / তিন / বেলা অবেলা।

নারীকে। সেই সূর্যপ্রতিভ প্রয়াগ-প্রেরণাময়ী নারীকে জীবনানন্দ বারবার আহ্বান জানিয়েছেন পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যে। 'বেলা-অবেলা' কবির প্রেমচেতনার সেই নবীন বিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করছে অজস্র কবিতায়। এই নবাঙ্কুরিত প্রেম 'ইতিহাসবেদে' আশ্রিত ও 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানে' শীলিত হয়েই দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করেছে এবং সে উৎক্রান্তি অবশ্যই ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির আন্তরিকতা আত্মস্থ করেই ঘটেছে। সময়াতীতের বোধে ও উত্তরব্যক্তিক অন্বিষ্টপ্রবণ অনৈহিকতার স্পর্শে ব্যক্তিগত প্রেমভাবনা থেকে জীবনানন্দ পাঠককে নিয়ে যান লোকোত্তর প্রেমচেতনায়। 'সকল প্রতীতি উৎসবের চেয়ে বড়' কোনো ভূমিকায় তিনি নারীকে চিনতে পারেন বলেই শুধুমাত্র 'মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে' প্রেয়সী নারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন না। অখণ্ড কাল ও মানবে-তিহাসের মহাবিশ্বপটে তিনি নারী তথা প্রেয়সী তথা প্রেমকে উপলব্ধি করেন আপন চেতনায় :

তুমি তো জাননা, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিল, নেই, বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায়, মানুষ অপরিজ্ঞাত সে অমায়, তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায়।[৩৫]

সেই অভিজ্ঞান সাময়িকতা ও ব্যক্তিক প্রয়োজনের দাবী-সীমারেখার বাইরে নিয়ে আসে কবিচেতনাকে :

অপার কালের স্রোতে না গেলে, কী করে তবু, নারি,
তুচ্ছ খণ্ড অল্পসময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে,[৩৬]

উদাহরণ বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। 'মাঘসংক্রান্তির রাতে,' 'তোমাকে', 'অনেক নদীর জল', 'সূর্য নক্ষত্রনারী', 'অবরোধ', 'উত্তর সাময়িকী',

৩৫। সূর্য নক্ষত্র নারী / এক / বেলা অবেলা।
৩৬। সূর্য নক্ষত্র নারী / দুই / বেলা অবেলা।

'নারীসবিতা' 'গভীর এরিয়েলে'—একটির পর একটি কবিতায় ইতিহাসবেদে অন্তর্দীপ্ত প্রেমের প্রয়াণোজ্জল কালাতীত ভূমিকাই উপজীব্য। প্রেম এক 'তিমির-বিদারী' অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির বিকীর্ণ শক্তিগুলির মত প্রেম এক অবিনাশী সত্তায় বিরাজমান। জীবনানন্দের কাব্যের অভিনিবিষ্ট পাঠকের কাছে এ বক্তব্য অপরিচিত নয়। কারণ, সেই 'বনলতাসেন' পর্যায় থেকেই জীবনানন্দ নারী ও নিসর্গকে শুধুমাত্র সংস্থানগত সামীপ্যের পরিবর্তে আন্তরমূল্যের একাত্মতায় উপলব্ধি করেছেন। বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ও উত্তরকালীন কাব্যরচনার কালে আপৎকালীন বিমূঢ়তায় অপসৃত হয়েছে নিসর্গের প্রশান্তি ও নারীর কল্যাণসুন্দর ধ্রুবতার আদর্শ। কিন্তু, এই অপসৃতি দীর্ঘ বা স্থায়ী হয়নি। নারী তাঁর সমুজ্জল মহিমায় প্রত্যাবর্তিত হয়েছেন :

> জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে দেখেছি
> শুনেছি বিরাট শ্বেত-পাখি সূর্যের
> ডানার উড্ডীন কলরোল
> আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠেছে।[৩৭]

এই সেই চিরদীপ্তিময়ী নারী যাকে ঘিরে 'অপার আলোকবর্ষ', 'তিমির-পিপাসী' অগ্নিপরিধির মধ্যে যাঁর দেবী সাক্ষাৎ একদা কবিকে জানিয়েছিল 'অমৃতসূর্যে'র আহ্বান'। 'বেলা অবেলা'য় এই শাশ্বতীর আবির্ভাব 'বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল প্রাণনে', এ কথা ঠিক। সংশয় হতাশা ও দিশাহীনতার যে তিমিরে সমাজ ও রাষ্ট্রের মত কবির চেতনাও উদভ্রান্ত ছিল 'সাতটি তারার তিমির' পর্বে, প্রেমের আলোকদেশি প্রত্যয়ের নবজাগরণেই তার থেকে উজ্জ্বল উদ্ধার যেন সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু, এর পাশাপাশি আরেকটি প্রসঙ্গও লক্ষণীয় : নিসর্গের নিঃশব্দ পুনরাধিষ্ঠান এ কালের রচনাতেই ঘটেছে। নারীকে জীবনানন্দ 'উজ্জ্বল পাখিনী', 'বনহংসী', 'সৃষ্টির মরালী'র চিত্রকল্পে অধিষ্ঠিত করেছেন, কখনও তাকে 'জলের উৎসারণের মতো,' কখনও

৩৭। সময়ের তীরে / বে. অ.।

'আভা আলো শিশিরের মতন' . নিসর্গের নানা অনুষঙ্গে চিনেছেন। 'মহাপ্রাণের বৃক্ষের ওপর অধিষ্ঠিত এক 'উজ্জ্বল পাখিনীর' মত এই নারীকে আরও পরিচ্ছন্ন প্রাণবন্ত রঙে জীবনানন্দের পাঠক চিত্রিত হতে দেখেন কবির কাব্যসৃষ্টির অন্তিমপর্বে এসে : 'একটি বৃক্ষে সময় মরুভূমি / লীন দেখেছে, গভীর পাখি গভীর বৃক্ষ তুমি'।[৩৮] অথবা 'মহাপ্রাণের বৃক্ষ ও তার পাখি তো বারবার ভস্ম হয়ে জাগছে হরিৎ-নবহরিৎ গাছে'।[৩৯] এ জাতীয় চিত্রকল্প অসংখ্যবার আবৃত্ত হয়েছে জীবনানন্দের শেষতম পর্যায়ের কাব্যরচনায়। এ সময় তাঁর চিত্রকল্পের ও প্রতীকের প্রিয় বিষয়গুলি ছিল নদী ও নীলিমা, সূর্য, বৃক্ষ ও পাখি ; অন্য অর্থে জল, আলো ও নিসর্গ-শ্যামলিমার এক উজ্জ্বল প্রেক্ষাপট। বিষয়গুলি সবই জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্যের পাঠকের কাছে পরিচিত ও প্রিয় ; শুধু অন্তিম পর্যায়ের কাব্যে সে সুরের নবীন সম্বন্ধের অর্থদ্যোতনাই কবির চেতনার সাম্প্রতিক উদ্বর্তনটিকে পরিস্ফুট করে। সেই অন্তিমতম চেতন-বিবর্তনে এক নবীন সূর্য করোজ্জ্বল 'আলো-পৃথিবীর' সংকল্পনাই অভিব্যক্ত এবং নারী ও তার প্রেমান্বেষী মানবপুরুষ আছেন এ পৃথিবীর জ্যোতির্বলয়কেন্দ্রে।

জীবনানন্দের কবিমানসে প্রকৃতিচেতনার বিবর্তন প্রবাহে আমরা দেখেছি যুদ্ধঅবলীন পৃথিবীর বিপন্নতা, উদ্‌ভ্রান্তি ও নৈরাশ্যর বোধকে অতিক্রম করে অন্তিম পর্যায়ের কাব্য পাঠককে আহ্বান জানিয়েছে নিসর্গের প্রশান্তি ও মানবহৃদয়ের চিরন্তন ভালোবাসায় লালিত এক সুচেতনা-ভাসিত আলো-পৃথিবীতে :

> আমাদের পৃথিবীর পাখলী ও নীলডানা নদী
> আমলকী জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
> করছে সমস্ত দিন : হৃদয়কে সেখানেও করে না অবহেলা
> বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি ; শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি

৩৮। সূর্য নিভে গেছে / একক, ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩৫৯।

নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে—
অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তাহলেও রবে ; তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নবনব জলধারা—উজ্জ্বল জগতে ।[৪০]

এই অনির্বচনীয় কবিস্বপ্নের জগতেই প্রেমচেতনার পর্যালোচনাও পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে আসে চিত্রকল্পের অপ্রতিরোধ্য ভাবানুষঙ্গে :

সে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরালো
অনুভব করে মানুষ তবুও
মৃত্তিকায় মূল রেখে লক্ষ্য রেখে আদি-নীলিমায়
শ্যামল গাছের থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে ?
অথবা নশ্বর প্রেম ভালবেসে বসবে ছায়ায় ।[৪১]

নিসর্গের অবিনাশী প্রাণ আর মানবিক প্রেমের আলোক উদ্বর্তনাই মানবকে দিতে পারে 'রক্তনদীর তীরে' এই ধ্বস্ত পৃথিবীতে ধ্রুবজীবনের দিশা। তাই জীবনানন্দকে মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্রতায় বলতে শুনি : 'মুখ থেকে রক্তের ফেনা / পায়ের নিচের থেকে ক্ষমতা যশের মরুভূমি / ফেলে দিয়ে হে হৃদয় কখন বসবে কয়েক / মুহূর্ত নীল শ্যামল বৃক্ষের নিচে তুমি' ।[৪২]

এই নিসর্গচ্ছায়ায় মানবচেতনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন জ্যোতিঃস্বরূপিনী সূর্যপ্রতিভ নারী যার কথা আমরা এ যাবৎ আলোচনা করেছি :

যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো
কবে যেন—আজকে হারিয়ে গেছে সব,[৪৩]

৪০। আলোপৃথিবী / দেশ, কার্তিক
৪১। বৃক্ষ / দেশ, কার্তিক
৪২। ঐ
৪৩। দু'দিকে ছড়ায়ে আছে / শ্রেষ্ঠ কবিতায় (নাভানা) প্রকাশিত।

সভ্যতার সঙ্কটে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মূল্যবোধবিপর্যয়ে, এই 'নারীসবিতা'কে কবি সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেললেও ইতিহাসবেদী চেতনার প্রসাদে মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে তাকে চিরভাস্বর স্বরূপে উপলব্ধি করেন :

মনে হয় যেন কোন হরিতের—নব হরিতের
সঙ্গীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাষা
এ জন্মের আরো দূর জন্ম-জন্মান্তের মুখোমুখি ফিরে এসে
অনাদি আলোর ভালবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নিচে
জ্বালিয়ে শ্যামলনীল ব্যথা হতে চায়।
আমি সেই মহাতরু লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্য নীলিমায়।[৪৪]

এই গম্ভীর মন্দ্র উচ্চারণে বোধনের পবিত্রতার সঙ্গে উপলব্ধির তীব্র আন্তরিকতা একাত্ম হয়েছে। কবির প্রেমভাবনা বৃক্ষের মত দিব্য নিলীমার অন্বেষায় উর্ধ্বমুখীন—লৌকিক প্রেমোপলব্ধির সত্যে সংযুক্ত হয়েছে বিশ্বজনীনতা ও লোকোত্তরতার ব্যঞ্জনা। বৃক্ষের প্রতীকটি এদিক থেকে সার্থক। মাটিকে আশ্রয় করে বৃক্ষের যে উর্ধ্বমুখী যাত্রা জীবনানন্দের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মৃত্তিকা ও নীলিমা, পার্থিব ও স্বর্গীয়, জৈব ও আত্মিক-এর সহজ অন্বয়ের প্রতীক-সূত্র। জীবনানন্দের আদ্যন্ত কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত পাঠকের কাছে এই বৃক্ষটি সুপরিচিত। 'সুদর্শনা' কবিতাটিতে শুনেছি 'কিন্নরকণ্ঠ দেবদারুগাছে' পঙক্তিটি যে দিব্যরমণীয়তার উদ্ভাস নিয়ে আসে পাঠকের মনে, 'লাবণ্যসাগর থেকে নিজে উঠে জাগানো মহাতরু'টি তারই আরও ব্যঞ্জনাগভীর বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। বৃক্ষের অনুষঙ্গে, 'শ্যামল নীল' বা 'নবহরিত'-এর মত শব্দের প্রয়োগে প্রকৃতি-লালিত জীবনচর্যার ইঙ্গিত; অন্যদিকে, পাখি, শ্বেতহংসী বা

৪৪। দু'দিকে ছড়ায়ে আছে / শ্রেষ্ঠ কবিতায (নাভানা) প্রকাশিত।

সৃষ্টির মরাল-এর চিত্রকল্পগুলি প্রয়াণ ও প্রাগ্রসরমানতার ভাববাহী। সূর্য, নক্ষত্র বা রৌদ্রস্বচ্ছল ভূখণ্ডের প্রতীকে আলোকিত এক নতুন পৃথিবীর অন্বিষ্টের ব্যঞ্জনা। এ সব কিছুর কেন্দ্রে বা এগুলির কোনও একটি আশ্রয় করে বা তাদের হার্দ্য সমন্বয়ে রূপায়িত হয়েছে চিরন্তন এক নারীপ্রতিমা—যার ভালোবাসার ঐশী প্রসাদে মানবচিত্তে অঙ্কুরিত শুভ-প্রয়াণের শক্তি ও প্রেরণা। এভাবেই শুভ ও সুন্দরের প্রেরণায মানবচেতনার যে দেশকালাতীত অন্বেষা তারই মহত্তর পরিসরে জীবনানন্দের প্রেমভাবনা শেষপর্যন্ত উত্তরিত হয়ে চির-মানবের যুগযুগধাবিত সৌরপ্রয়াণের অংশভাগ হয়ে উঠেছে। কবির ব্যক্তিক প্রেমোপলব্ধির অন্তঃসার লৌকিক ও লোকোত্তরের আততি ও অন্বয়ের মধ্য দিয়ে দিব্যপ্রেরণাস্বচ্ছল হয়েও মর্ত্য-বিমুখীন হতে দেয়নি কবির সৃষ্টিকে। মানুষের পৃথিবী তথা ঐহিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতা থেকেই বৃক্ষের মত উদ্বর্তিত, উর্ধ্বায়িত হয়েছে তাঁর কল্পনায় মানবের শুভ ও সুন্দরের সৌরচেতনা, যার অন্য নাম, জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে অন্তত, প্রেম।

ইতিহাসের অন্ধকারে প্রথম শিশু মানুষ জাগিয়ে
চলেছে আজো একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে,
হয়তো, মানুষ নিজেই স্বাধীন, অথবা তার
দায়ভাগিনী তুমি;
ওরা আসে, লীন হয়ে যায়, হে মহাপৃথিবী
সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম চেতনার ভূমি।[৪৫]

৪৫। সূর্যকরোজ্জ্বলা / মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৫৬।

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

যে মননঋদ্ধ আবেগ ও ভাবনা জীবনানন্দের কাব্যে স্বকীয় উদ্ভাস এনে দিয়েছে তার নিরবচ্ছিন্ন ও স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে কবির সুস্থিত ইতিহাসচেতনায়। কাব্যবিষয়ক নিবন্ধাবলীতে ও কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিঠিপত্রে জীবনানন্দ নিজেই বেশ কিছু আলোকদেশি নির্দেশ রেখে গেছেন এই ইতিহাসচেতনার স্বপক্ষে। সে সবের যথার্থ অনুধাবনই তাঁর নিজের কাব্যে ইতিহাসচেতনার সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দিতে পারে।

জীবনানন্দ নিজেকে 'লিরিক' কবি বলেই মানতেন ; 'কিন্তু আজো আমি লিরিক কবি'।[১] তিনি আরও জানতেন, 'লিরিক কবি ত্রিভুবনচারী'। প্রকৃতি, সমাজ ও সময়ানুধ্যান—এই তিন জগতে বিচরণ করেন যে 'কবি' তিনি যখন 'মানবসমাজকে চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে' কোন কিছুকে 'চরম' বলে গ্রহণ করেন, তাঁর মধ্যে আছে কবিজগৎ সৃষ্টির এক প্রয়াস, যেখানে 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরে' কবি বাস্তবকে 'ফলিয়ে দেখতে' চান। সেভাবেই গড়ে ওঠে তাঁর চেতনা ও সৃষ্টির নিজস্ব জগৎ কারও সৃষ্টিতে 'কোনো পরিনির্বাণের দিকে'. 'অল্লাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজপ্রয়াণের দিকে, অন্য কারু ধারণায়'।[২] জীবন ও সাহিত্যের তাগিদে জীবনানন্দ নিজেও কখনও কখনও 'চরম' বলে গ্রহণ করেছেন এমন কিছু যা তিনি 'শেষ সত্য'[৩] বলে মানতে পারেন নি, তবু যে তা মেনে নিয়েছেন তার কারণ তারই মধ্যে তিনি সাময়িকভাবে হলেও অনুভব করেছেন 'আধুনিক

(১) 'ময়ুখ'/জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, পত্র ২। (২) 'কবিতা প্রসঙ্গে' / কবিতার কথা।
(৩) 'ময়ুখ / ঐ ঐ ।

ইতিহাসের দিকনির্ণয় সত্তা'; অর্থাৎ, 'সময়-প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা' করেছেন।[৪] অন্তহীন সময়ের পটভূমিতে বহমান মানব-সমাজের ক্রমাগ্রগতির এই বোধ, পরিপূর্ণতার অন্বেষা ও শুভপ্রয়াণের ব্যগ্রতা, পৃথিবীর রণরক্তকোলাহলের অন্তর্লীন তাড়নার প্রকৃত তাৎপর্যের সচেতন অনুধাবন—এই সমস্ত কিছুই জীবনানন্দের কাব্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে এক বিবর্তমান ইতিহাসচেতনা। এই 'ইতিহাস বেদের' বিশদ বীক্ষা তাঁর কবিতাবলীর মূল্যায়নের সাহায্যেই সম্ভবপর। কিন্তু, সে আলোচনায় পৌঁছবার আগে আরো কিছু ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন।

লিরিক কবি হিসাবে জীবনানন্দ অন্তঃপ্রেরণার দাবী স্বীকার করেছেন বারবার। কবিমানসে অন্তঃপ্রেরণার প্রবল ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েও জীবনানন্দ জানিয়ে দেন, 'কিন্তু ভাব-প্রতিভাজাত এই অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়। তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ প্রতর্কের ইঙ্গিতে শুনতে হবে, এ জিনিস ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই।'[৫] সৎ কাব্যসৃষ্টির পক্ষে ইতিহাসমনস্কতা যে কত জরুরী জীবনানন্দ মনে করতেন, তার আরও পরিচয় রয়েছে বাঙলা কাব্য নিয়ে লেখা তাঁর দুটি নিবন্ধে, 'উত্তররৈবিক বাঙলা কাব্য' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতা'। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতা নিয়ে আলোচনায় তিনি আমাদের জানিয়ে দেন, 'সময় ও সীমা-প্রসৃতির ভিতর সাহিত্যের পটভূমি বিমুক্ত দেখতে' তিনি ভালোবাসেন: 'কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'। যেমন স্বকালের ও সহযাত্রী কবিকুলের রচনায় তিনি দেখতে চেয়েছেন ইতিহাস ও সময়-সম্পর্কিত সঠিক চেতনা, তেমনই অতীত ও অব্যবহিত অগ্রজ কালের

৪। 'কবিতার আত্মা ও শরীর' / ক. কথা।

৫। 'কবিতা প্রসঙ্গে' / কবিতার কথা।

কাব্যেও তিনি খুঁজেছেন সময়, সমাজ ও ইতিবৃত্তের যথার্থ প্রেক্ষিত : 'যে সময়ে সে কাল কাটাচ্ছে এবং যেখানে সে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে এবং যেখানে সে নেই—এই সকলের কাছেই সে (কবি) ঋণী।'[৬] কাব্যের অস্থিমজ্জার মধ্যে লালিত এই ইতিহাসচেতনাই কবিকে করে একই সঙ্গে যুগমানসের প্রবক্তা ও ক্রান্তদর্শী ; দান্তে, শেকস্‌পিয়ার ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে নানা উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ এ বিশ্বাস বারবার ব্যক্ত করেছেন।[৭] জীবনানন্দের রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনায় যে অপরিসীম বিস্ময় ও শ্রদ্ধার দ্যুতি ছড়িয়ে আছে তা কোনও মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটিতে তিনি যথার্থই বুঝেছেন রবীন্দ্রকাব্যে রয়েছে 'একটি বিস্তৃত যুগের প্রাণ-পরিসর এবং এমন অনেক কিছু যা সময়াতীত'। তবু তাঁর সচেতন বয়স্ক শ্রদ্ধা তাঁকে বিস্ময়ে বিহ্বল হতে দেয়নি এবং তিনি এও বুঝেছেন, 'তাঁর প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ ও ইতিহাস-চেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে'। এ জাতীয় উপলব্ধিসুলভ নয় এবং লভ্য হলেও যথার্থ সমালোচনার পরিমিতি নিয়ে কদাচ উচ্চারিত হয়। জীবনানন্দের পক্ষে রবীন্দ্র কাব্যলোকের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এরকম অনুত্তেজিত সদুক্তি সম্ভব হয়েছিল সৎ কাব্যের ইতিহাসচেতন চরিত্রে প্রগাঢ় আস্থা থেকেই। আসলে কবিতা রচনার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই জীবনানন্দ কয়েকটি সত্য উপলব্ধিতে আশ্বস্ত হতে পেরেছিলেন। কাব্যের নিজস্ব নিয়ামক সংহতি ('ইনটিগ্রিটি') ও অন্তপ্রেরণার দাবী স্বীকার করে নিয়েও জীবনানন্দ মহৎ ও সৎ কাব্যে কবির 'ব্যক্তি' ও 'উত্তরব্যক্তি' সত্তাকে একটি 'কৃতার্থ সংস্থানের'[৮] মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। কবির এই উত্তরব্যক্তি সত্তাই

৬। 'মাত্রাচেতনা' / ক. কথা।
৭। 'কি হিসেবে শাশ্বত' ও 'দেশ কাল কবিতা / ক. কথা।
৮। 'কবিতার আলোচনা' / ক. কথা।

কবিতাকে পৃথিবীর এই জীবনের যত নিকটে নিয়ে আসে আর কিছুই তত নয়। 'যেখানে যা কিছু ভালো সাহিত্য হচ্ছে সেটার স্থিরতা, ইতিহাসে যা হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, যা হয়নি সে সব দুঃসাধ্য স্বর্গ রচিত হতে পারে স্বীকার করেও; বিশ্বাসের মাত্রারক্ষা ও অভিনিবেশের ফলেই হচ্ছে'।[৯] যে কোন রচনাই সৎ, গভীর ও সার্থক হয়ে ওঠার জন্য স্রষ্টার চেতনায় ইতিহাসের প্রকৃত প্রেক্ষিতজ্ঞান যে কত আবশ্যিক সে সম্পর্কে জীবনানন্দের সমীক্ষায় ছিল না কোনও দ্বিধা। সমকালীন কাব্য আলোচনায় অগ্রসর হয়ে 'ইতিহাসচেতনা' শব্দটি সুচিন্তিতভাবে বারবার তিনি ব্যবহার করেছেন। এ সবই তাঁর মননপ্রবণতার এক বিশিষ্ট লক্ষণের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে —সেটি তাঁর ইতিহাসবোধ।

এখন এই ইতিহাসচেতনা বলতে স্বয়ং জীবনানন্দ তাঁর সচেতন জিজ্ঞাসায় কিম্বা অনুপ্রাণিত কাব্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন সে প্রশ্ন এসে পড়ে। জীবনানন্দের কাব্যলোকে ইতিহাসের উপস্থিতি একটি স্বীকৃত বিষয় হওয়া সত্ত্বেও সে চেতনার যথার্থ মূল্যায়নের অভাব আজও লক্ষণীয়। এক জাতীয় উচ্ছ্বাসপ্রবণ সদুক্তি, ভাসাভাসা পারম্পর্যহীন উল্লেখ বা উদ্ধৃতির মধ্যে তৃপ্ত থাকার ফলেই আধুনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য এই ক্রান্তদর্শী 'চেতয়িতা' হয়ে যান 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি'।[১০]

ইতিহাসচেতনার সংজ্ঞা নির্ণয়ে যে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সামনে আসে তা হল ইতিহাস বলতে আমরা কি বুঝি। সকল ঐতিহাসিকই জানেন ইতিহাসচর্চা এক জাতীয় গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ। সেভাবে দেখলে ইতিহাস বিজ্ঞানেরই অনুবর্তী; কারণ বিজ্ঞানের কর্তব্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কার। যা অজ্ঞাত তার অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞান। ইতিহাস বিজ্ঞানের স্বগোত্র, শুধু তার

৯। 'সত্য বিশ্বাস' ও কবিতা / ক. কথা।
১০। আধুনিক বাংলা কবিতা / দীপ্তি ত্রিপাঠী।

সন্ধিৎসার ক্ষেত্র ভিন্নতর। অতীতে সংঘটিত মানবিক কর্মকাণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজে বার করাই ইতিহাসের বিবেচনাধীন। ইতিহাস এ দায়িত্ব পালন করে তথ্য ও প্রমাণের, ব্যাখ্যা ও মীমাংসার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই 'অতীত-অনুসন্ধান ও মীমাংসার কাজ, যাকে আমরা ইতিহাস-চর্চা বলি, তার লক্ষ্য একটিই —মানবিক আত্মসমীক্ষা। ইতিহাস আমাদের জানায় মানবের এতকালের কর্ম ও তার ফলশ্রুতি; এবং সেভাবেই উন্মোচিত করে দেয়, আরও মহত্তর ও ব্যাপকতর অর্থে, মানবস্বভাব ও মানবেতিহাসের মর্মকথা। অনুসন্ধান ও মূল্যায়নজাত এই জ্ঞানমূল্যই ইতিহাসকে তাৎপর্যময় করে তোলে; মানবচেতনায় জন্ম দেয় ইতিহাসবোধের।

ইতিহাস যে বৃত্তান্ত মাত্র নয়, বিবরণ তার প্রধান কর্তব্য হলেও বিবরণী প্রণয়নই তার একমাত্র লক্ষ্য নয়—এ জাতীয় ভাবনা উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে মানবমনকে আলোড়িত করলেও প্রতীচ্যের আদি ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসও যেন এ বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের আদিতেই তিনি বলে নিয়েছেন যে গ্রীক ও অনার্যদের মধ্যে সংঘর্ষের স্মারক-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হলেও তাঁর উদ্দেশ্য হবে সে সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ নির্ণয়। এভাবেই ইতিহাসচর্চা উদ্দেশ্যমুখী হয়ে যায় একেবারে তার জন্মলগ্ন থেকেই। তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে কার্যকারণ সূত্র নির্দেশ আমাদের নিয়ে যায় ঘটনার মূল্যায়নে এবং সেভাবেই ইতিবৃত্তে তথ্যের একচ্ছত্র প্রাধান্য খণ্ডিত হতে থাকে। এ শতাব্দীর শুরুতে ইতিহাসজিজ্ঞাসার নতুন তাগিদ আসে ইতালী থেকে বেনেদেতে ক্রোচে-র ইতিহাস-দর্শনের নবীন ভাষ্যে। ক্রোচে আমাদের জানালেন, 'সব ইতিহাসই সমকালীন'। এই বিশ্রুত উক্তিটির প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা যাক: 'যে কোনও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে যে ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলি তাই ইতিহাসকে দেয় তার সমকালীন সত্তা, কেননা যত দূরবর্তী হোক না কেন বিবৃত

ঘটনাবলী, প্রকৃত ইতিহাস সব সময়েই বর্তমানের প্রতিবেশ ও প্রয়োজনের মধ্যেই অনুরণিত হতে থাকে'।[১১] ক্রোচে যা বলতে চেয়েছেন তা হয়ত এই যে ইতিহাস হল বর্তমানের চোখ দিয়ে অতীতকে দেখা, এবং ঐতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব মূল্যায়ন, পঞ্জীভুক্তিকরণমাত্র নয়। ক্রোচের প্রভাব ধীরে ধীরে হলেও সর্বত্র ইতিহাস-আলোচনায় অনুভূত হতে থাকে। বৃটিশ ইতিহাসবেত্তা কলিংউডের 'দি আইডিয়া অফ্ হিস্ট্রি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানেও ইতিহাসচর্চাকে শুধুমাত্র অতীত বা ঐতিহাসিকের অতীত-অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সমার্থক করে দেখা হয়নি; বরং অতীত ও ঐতিহাসিকের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ পারস্পরিক সাযুজ্যে অবস্থান করবে এটাই বলতে চাওয়া হয়েছে। অতীতের যে কোনও ঘটনা বা কীর্তি মৃত, নিরর্থক হয়ে যায় যদি ইতিহাসবেত্তা সে সবের পেছনে যে শক্তি বা ভাবনাগুলি কার্যকরী ছিল, সেগুলির অনুধাবনে নিরত থাকেন। সেই কারণেই কলিংউডের কাছে, 'ইতিহাস হল ঐতিহাসিকের মননে অতীত-ঘটনার পুনর্সংঘটন।[১২] এই সংঘটনা তো শুধু মৃত কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়; এর সঙ্গে জড়িত হয়ে যায় নির্বাচন ও মূল্যায়নের গোচর অগোচর এক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া আবার ঐতিহাসিকের মননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এভাবে বিচার করলে, ইতিবৃত্তকথায় শেষপর্যন্ত ইতিহাসবেত্তার মনন-অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটে।

এই বিচারে ইতিহাস যদিও ইতিবৃত্তকারের মননসঞ্জাত, তবু তথ্য ও ঘটনাই সেই মননসৌধের ভিত্তি। তথ্যের অভাব ইতিহাসকে করে তোলে অনিকেত, নিরালম্ব কল্পনামাত্র; আবার ঐতিহাসিকের মূল্যায়ন ছাড়া তথ্যগুলি হয়ে পড়ে মৃত ও অর্থহীন। জীবনানন্দ

১১। The Philosophy of History . B. Croce.

১২। 'History is the reenactment in the historian's mind of the thought whose history he is studying'. . Collingwood.

যাকে 'কল্পনামণীষা' বলেছেন, সেই 'ইমাজিনেশন' বা কল্পনাদৃষ্টি ইতিহাসবেত্তার পক্ষে জরুরী একটি প্রয়োজন যার ফলে তিনি অধীত অতীত, তার মানবযুথ, তাদের সমাজজীবন ও মনোভঙ্গিকে সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন। এই কল্পনাদৃষ্টির অনুপস্থিতি ইতিবৃত্তকে করে তোলে ভারী, অস্বচ্ছ, নিরর্থক এক ধারাভাষ্য। আবার কোনও ঐতিহাসিকই যেহেতু স্বকাল ও স্ব-সমাজের চেতনাভূমি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করে নিতে পারেন না, অধুনার কেন্দ্র-বিন্দুতে স্থিত থেকেই তিনি অতীতের প্রেক্ষিত হৃদয়ঙ্গম করে নিতে চান। তাই ইতিবৃত্তের অতীতে অধুনার সংশ্লেষ ঘটে যায়।[১৩] আবার নিটশের কথায়ও ভুল নেই : 'কেউ কেউ ইতিবৃত্তের সভ্যতা কি অতীত-স্মৃতি-চারণায় মুক্তি খুঁজে থাকেন'[১৪]। কিন্তু ঐতিহাসিকের কর্তব্য অতীতের মুগ্ধ প্রেম নয়, নয় কোনও অতীত অনীহাও। তাঁর দায়িত্ব অতীতকে, ইতিহাসের ঘটনা ও শক্তিগুলি ঠিকমত চিনে নেওয়া যাতে তিনি নিজের যুগ ও পৃথিবীকে সঠিক বুঝে নিতে পারেন। ইতিহাস তাই ঐতিহাসিকের মননলব্ধ চেতনার দান, অতীত ও অধুনার প্রাণবন্ত কথোপকথনের মিলনভূমি। ইতিহাসচেতনা বলতে জীবনানন্দও যে এই রকম একটি সম্বোধির কথা ভেবেছেন তা তাঁর অনেক নিবন্ধ থেকেই স্পষ্ট হয়। 'কবিতার আত্মা ও শরীর' নিবন্ধটিতে তিনি বলেন, 'মানুষের আবহমান পৃথিবীর শীর্ষে এই নতুন পৃথিবী এবং মানুষের অনেকদিনের চেনা সত্য-মিথ্যার কুয়াশা ভেদ করে আজকের নতুন মিথ্যা ও সত্যের শরীরে অংকিত বিজ্ঞানের স্বাক্ষর—এই সব নিয়েই আজকের কবির সৃষ্টিবলয়।' 'মাত্রাচেতনা' প্রবন্ধটিতে জীবনানন্দের নির্দ্বিধ প্রশ্ন, 'ইতিহাসধারার অনুগত কবি ইতিহাস ও সমাজ পরিচ্ছন্ন-

---

১৩। **Experience and its Modes ; M. Oakeshott ; 1933 ; P. 99. ; 'History is the historian's experience. It is made by nobody save the historian ; to write history is the only way of making it.'**

১৪। **Thoughts out of Season ; 1909 ; pp 65—6.**

ভাবে মর্মস্থ করতে পেরেছেন কি?' কোনও স্পষ্ট পলায়নপ্রবণ উত্তরে তিনি আস্থাবান নন। তাই যাঁরা বলেন, 'এ যুগের ইতিহাস অন্তঃসার হারিয়ে ফেলেছে এবং এ সবের আশ্রয়ী শিল্পও তাই এই রকম,' তা তিনি সদুত্তর বলে মানতে পারেন নি। তিনি জানেন সমাজ ও ইতিহাসকে মর্মস্থ করতে হলে 'মাত্রাচেতনায় পৌছান চাই', —যে চেতনার বলে 'জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের ওপিঠ ও এপিঠের অন্তিমবর্ণে নিজেকে মানবকে ফলিয়ে তুলে একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়'। কবির পক্ষে এই চেতনা সার্থক ইতিহাসবেত্তার কাছে যতখানি তার চেয়ে কম জরুরী নয়; কারণ, জীবনানন্দ চেয়েছিলেন: 'কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'; কারণ, উপলব্ধি ও মননের যে সমস্ত অনুকণা নিয়ে মানবতা ও কবিমানসের ঐতিহ্য তার 'পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার' পক্ষে ইতিবৃত্তধারা ও সময়বিস্তার সম্পর্কে কবিকে স্বচেতনায় প্রতিষ্ঠ হতেই হয়।[১৫] আর, সাহিত্য বা কবিতায় সেই ঐতিহ্য রূপায়িত করতে হলে প্রয়োজন ভাবপ্রতিভার—'যা প্রজ্ঞাকে স্বীকার করে নিয়ে নানা রকম ছন্দে অভিব্যক্ত হয়'। এই ভাবপ্রতিভা বা ইমাজিনেশনের কাজ হল 'কবিমানসে আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে আরো ঠিকভাবে বুঝবার সুযোগ করে দেওয়া'।[১৬] আবহমান কালের মানবসমাজ এবং তার ঐহিক ও আত্মিক ইতিহাসধারার ক্রমবিকাশী অনুবর্তনের এই বোধই জীবনানন্দের কাব্যে ইতিহাসচেতনারূপে উপস্থিত।

এই ব্যাপ্ত ইতিহাসবোধ জীবনানন্দের মননে একক ও অবিবর্ত কোনো উপাদান নয়। নিজের সমাজ ও স্বকালের সংশ্লেষ তাকে উপযুক্ত প্রেক্ষিত দিয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে।

১৫। 'উত্তররৈবিক বাঙলা কাব্য' / কবিতার কথা।

১৬। 'কবিতার আত্মা ও শরীর' / ঐ ।

জীবনানন্দ আবহমান কালের মানবেতিহাসকে কখনই স্বকাল ও যুগনিরপেক্ষ বিশেষত্ব হিসাবে গ্রহণ করেন নি। ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁর সকল সদুক্তির সঙ্গেই বিজড়িত হয়ে আছে 'সমাজ ও সময়-অনুধ্যানের' কথা। তিনি বলেন, 'ইতিহাস বেদের দরকার এবং সমাজ বেদের'; কিংবা বলেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার' এমন এক প্রসঙ্গে যখন 'কবিতার অস্থির ভিতরে' তিনি খুঁজছেন ইতিহাসচেতনা।[১৭] অনুরূপভাবেই দেখানো যায়, কাব্যস্রষ্টার ইতিহাসবেদকে তিনি পরিচ্ছন্ন সময়চেতনার নিকষেই যাচাই করে নিয়েছেন। যে অর্থে ক্রোচে বলেন, 'সব ইতিহাসই সমকালীন' প্রায় অনুরূপ অর্থেই বলা যায় জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা 'দেশ কালের সীমা-প্রসৃতির' মধ্য হতেই উদ্ভূত: 'গত এক হাজার বছরের দর্শন ও সাধন সংকল্পে অবিশ্বাস, নতুন বিজ্ঞান ও সংকল্পের ভূমিতে বিশ্বাস—কবিদের চেতনার দেশে এই দুরকম টানের মর্মান্তিক উপলব্ধি হবে বিপ্লবের দান ও কবিতার প্রেরণা।'[১৮] জীবনানন্দের কাব্যের ক্ষেত্রেও ইতিহাস-চেতনার এক পা এই আলোড়িত, বিপর্যস্ত অধুনায়, অপরটি মানব-ইতিহাসের অতীত ঐতিহ্যে; এবং এই দ্বিলোকচারী চেতনা মানব ভবিষ্যের পাথেয় আহরণ করে নেয় ইতিবৃত্তের ঘনঘটার অন্তরালবর্তী প্রাণশক্তি থেকে। ইতিহাসের ঘটনাবহুল বহিরঙ্গে জীবনানন্দের কল্পনা কদাচিৎ উচ্চকিত হয়েছে; তিনি প্রবেশ করেছেন তার আন্তর-রহস্যে এবং কল্পনামনীষার আলোকে খুঁজে নিয়েছেন মানবে-তিহাসের অপ্রতিরোধ্য ক্রমউত্তরণের প্রাণবর্তিকাটিকে।[১৯] তাই সমাজচেতনা ও সময়ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনাকে তার যথার্থ বিস্তারে তথা উদ্ভাসনে বোঝা যায় না।

কবি-আলোচক জীবনানন্দের কাছে যে ইতিহাসচেতনার গুরুত্ব

১৭। 'কবিতাপাঠ', এবং 'উত্তর-রৈবিক বাংলা কাব্য' / ক. কথা।

১৮ ও ১৯। 'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা' / ক. কথা।

এমনই অপরিসীম, তাঁর নিজের কবিতার জগতে সে চেতনার কি জাতীয় উদ্ভাস ঘটেছে তাই হবে আমাদের অনুসন্ধানের পরবর্তী বিষয়। তাঁর কাব্যের পূর্বাপর অনুশীলনে একটি ইতিহাসবোধ সক্রিয় দেখি। কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও বা খুবই স্পষ্টভাবে কাব্যঅবয়বকে অধিকার করে থাকা সেই বোধ তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনও আকস্মিক আবির্ভাবে চিহ্নিত নয়। আদিগ্রন্থ 'ঝরাপালক' থেকে শেষতম রচনাটি পর্য্যন্ত সর্বত্রই এ চেতনার আসা যাওয়া লক্ষ্য করা যায়। আবার সমাজবোধের সংশ্লেষে এই ইতিহাসচেতনার পরিণত ও উজ্জ্বলতর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 'সাতটি তারার তিমির ও তার পরবর্তী কালের কবিতাবলীতে। আমাদের এ পর্যালোচনায় জীবনানন্দের যে সব কবিতায় ইতিহাসবোধ স্পষ্টতর চেহারায় উদ্‌বর্তিতমাত্র সেগুলিই বিশ্লেষিত হবে। সেদিক থেকে তাঁর আদিতম গ্রন্থের 'পিরামিড' এবং কবির জীবৎকালে প্রকাশিত শেষতম গ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমিরে'র, 'মকর সংক্রান্তির রাতে' কবিতা দুটি জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনার উদ্ভব ও পরিণতির পথে দুটি দিশারী দিক্‌চিহ্নের মত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাঁর কাব্যের আলোচকদের অনেকেই এমন কিছু কবিতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন যেখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র বা স্থানের উল্লেখ রয়েছে এবং সেরকম ভাবেই শ্রাবস্তী-বিদিশা-সিংহলসমুদ্র কি কাঞ্চী-কুরুবর্ষের উল্লেখে তাঁরা ইতিহাসচেতনার অভিজ্ঞান পেয়ে যান। সবিনয়ে বলবো, এ জাতীয় স্থানকালপাত্রোল্লেখ যতটা ঐতিহাসিক প্রায় ততটাই ভৌগোলিক। জীবনানন্দ যখন বলেন, 'চীনে কুরুবর্ষে বেথলেহেমে' তখন সেই উল্লেখ মাত্রই তাঁর ইতিহাসচেতনার পরিচয় রাখে না। তাঁর নিজের সৃষ্টির পরিধিতে ইতিহাসচেতনা ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক উল্লেখমাত্রকে অতিক্রম করে মননের গভীরে লালিত এক উত্তরণপ্রয়াসী অন্বেষার বোধ। এ বিষয়ে জীবনানন্দ নিজেই লিখেছেন, 'সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে আমার কবিতা-চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরো বড়

চেতনায় উত্তরপ্রবেশ করেছে, কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি পেয়েছে যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে ? কিন্তু কোন কবি তার কবিতায় সেই অমোঘ বিজ্ঞানদৃষ্টির প্রভাবে সমাজ ও পৃথিবীকে নতুন পথ দেখিয়েছে—কবি লক্ষিত সেইপথ বেয়ে মানুষ তার প্রাণের আকাংক্ষিত সমাজ পেয়েছে ? প্রয়াণের প্রথম দিন থেকে সুরু করে আজো আমরা সে সমাজ পাইনি'।[২০] এই উচ্চারণের পর আর দ্বিধার অবকাশ থাকেনা, জীবনানন্দের কাছে ইতিহাসচেতনার অর্থ নিছক অতীত ইতিহাসের আবহ ও পরিমণ্ডল রচনা নয়, মানবেতিহাসের অন্তর্লীন প্রেরণা ও প্রয়াণের সুরটিকে চিনে নেওয়া ও চিনিয়ে দেওয়া। তাঁর সৃষ্টিতে ইতিহাসের এই ভাবসত্যের উপস্থাপনার পর্যালোচনাতেই আমাদের আগ্রহ।

'পিরামিড' কবির আদিতম গ্রন্থ 'ঝরাপালকে'র একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হলেও তখনও জীবনানন্দ তাঁর নিজের কাব্যভাষা খুঁজে পাননি। তবু সেই শিক্ষানবিশী যুগের অনতিসার্থক কবিতাটিতে স্ফুট হয়ে আছে কবির ইতিহাসবোধের প্রথম অঙ্কুরিত রূপ। কবিতাটি তার বিশিষ্ট মিশরীয় পরিমণ্ডল ও প্রাচীন লোকাচারের বিষয়বস্তুকে অধিগত করে ইতিহাসের একটি বিশেষ ভাবসত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতিহাসের মধ্যে আছে লুপ্তি ও বিনাশের মধ্য দিয়ে নব-জাগরণের ইঙ্গিত ; মৃত-দেহ অবিকৃত ও সংরক্ষিত রাখার যে মিশরীয় আচার তার মধ্যেও রয়েছে পুনরুত্থানের একটি প্রত্যাশা : 'খুলে যাবে কবে রুদ্ধ মায়ার দুয়ার / মুখরিত প্রাণের সঞ্চার / ধ্বনিত হইবে কবে কলহীন নীলার বেলায়— / বিচ্ছেদের নিশি জেগে আজও তাই বসে আছে পিরামিড হায়'। 'পিরামিড' জীবনানন্দের কাছে শুধুমাত্র 'অবিচল স্মৃতির মন্দির' নয়, তার অতীতের স্তব্ধ 'প্রেত-প্রাণে'র মধ্যেও রয়েছে একটি স্বপ্নময় প্রত্যাশা : 'মিশরঅলিন্দে কবে গরিমার দীপ যাবে জ্বলে'। এভাবেই পিরামিড হয়ে উঠেছে ইতিহাসের ভাবসত্যের প্রতীক, পুনরভ্যুদয়ের

২০। 'ময়ূখ' / জীবনানন্দ সংখ্যা : পত্র ৪।

ইঙ্গিতবহ। প্রায় অনুরূপ একটি বক্তব্য এ গ্রন্থের 'মিশর' কবিতাটিতেও ধরা পড়ে: 'শীতল পিরামিডের মাথা গীজের মূরতি / অংক-বিহীন যুগ-সমাধির মূক মমতা মথি' / আবার যেন তাকায় দূরে উদয়গিরির পানে / 'মেম্ননের' ঐ কণ্ঠ ভরে চারণ বীণার গানে।' 'ঝরাপালক'-এর 'নাবিক' ও 'সিন্ধু' কবিতাদুটিও প্রাসঙ্গিক উল্লেখের দাবী রাখে। আরও বড় চেতনার লোকে মানবসভ্যতার যে উত্তরপ্রবেশের কথা জীবনানন্দ শুনিয়েছেন, তার পরিণত কাব্যরূপ 'নাবিক' ও 'নাবিকী' এই দুটি কবিতায় 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থটিতে বিধৃত। নাবিকীর সেই চিত্রকল্প অপরিণত, প্রভাবিত কাব্যশৈলীর মধ্য দিয়েও 'ঝরাপালকে'র উল্লেখিত কবিতা দুটিতে আরব্ধ: 'কোন দূর দারুচিনি লবঙ্গের দ্বীপ লক্ষ্য করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয়মাস্তুল'।[২১] আবার, সমুদ্র তার 'উলঙ্গ নীল তরঙ্গের গানে / কালে কালে দেশে মানুষ-সন্তানে / শিখায়েছে দুর্মদ দুরাশা দুশ্চর তটের লাগি'।[২২] অভিযান ও প্রয়াণের যে ভাবনাগুলিকে আশ্রয় করে জীবনানন্দের ইতিহাসবোধ তাঁর পরিণত কাব্যসৃষ্টিতে সক্রিয়, তার অস্বচ্ছ, মণ্ডনহীন রূপ 'ঝরাপালকে'র কবিতাবলীতে। কাব্যের বহিরঙ্গ প্রসাধনেও জীবনানন্দ কখনও কখনও ইতিবৃত্তের উপাদান গ্রহণ করেছেন, যদিও অনেক সময়ই সে সব কবিতা রোমান্টিক প্রেম ও স্বপ্নের হর্ষবিষাদের চেয়ে বড় কোনও উচ্চারণ রাখেনি। 'অস্তচাঁদ' কবিতাটিতে কবি চিরকালীন প্রেমিকসত্তাকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন 'আসীরিয় সম্রাট', 'ক্রবাদুর' কবি, 'স্পেনীয় দস্যু' কি 'কিশোর কৃষ্ণের' বেশে। কিন্তু নিজস্ব কাব্য-ভাষার অভাবে এবং অনুভাবনার দুর্বলতায় এ জাতীয় রচনা শুধু কৌতূহলই উদ্রিক্ত করে, নান্দনিক তৃপ্তি আনেনা। পরিমিতি ও শিল্প-চেতনার অভাবে ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনার প্রয়াসও অপটু হয়ে পড়ে।

২১। 'নাবিক' / ঝরাপালক।

২২। 'সিন্ধু' / ঝরাপালক।

['ঝরাপালক' থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—প্রকাশকালের ব্যবধান মাত্র নটি বছর হলেও, রচনাকালের ব্যবধান বিস্তরতর বলেই মনে হয়।] বাঙলা কবিতার পক্ষে অভিনব, কিন্তু আপন অন্তর্মুখী ও ইন্দ্রিয়সংবেদী প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব কাব্যভাষা শেষোক্ত গ্রন্থে জীবনানন্দের করায়ত্ত; অধিগত সেই বিষয়বস্তুও যা তাঁর স্বকীয় উচ্চারণের পক্ষে যথার্থ, নিসর্গ ও তার প্রেক্ষাপটে প্রেম। কিন্তু যে পারিপার্শ্বিকচেতনার অন্তঃপ্রবেশে তাঁর কবিতা 'প্রৌঢ় পরিণতি' লাভ করেছে বলে জীবনানন্দ নিজেই মনে করেন [২৩] এবং যে পারিপার্শ্বিক অবশ্যই সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে, তার লক্ষণীয় অনুপস্থিতি এ কাব্য-গ্রন্থেও। যদিও 'হূণ' [২৪]-এর মত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, তা কোনও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল বা ইতিহাস-সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, নিছক শৈল্পিক প্রয়োজনে। জীবনানন্দের ইতিহাসস্পর্শী অনেক রচনাতেই যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যের অবিমৃষ্যকারিতা ও অসারতা ধ্বনিত; [২৫] রণরক্ত কোলাহলের ঊর্দ্ধে মানবাত্মার অবিনাশী প্রত্যয় ও শুভ অন্বিষ্টের কথাও তিনি বারবার শুনিয়েছেন তাঁর পরিণত রচনায়। সেই পরিণত মানবিক উচ্চারণের একটি প্রাথমিক প্রক্ষেপণ 'অবসরের গান' কবিতাটিকে সহসাই উদ্বেলিত করে :

'জানিতে চাইনা আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোনখানে;—
কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় ;
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং
দামামা থামায়ে ফেল—পেঁচার পাখার মত অন্ধকারে
ডুবে যাক্ রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ।'

তবু মনে রাখা ভাল, এখানে উচ্চারণ কোনও ইতিহাসচেতনাজাত

২৩। 'ময়ূখ' / জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা—পত্র ৪।

২৪। 'শকুন' / ধূসর পাণ্ডুলিপি।

২৫। 'চাঁদিনীতে' / ঝরাপালক।

প্রত্যয়ে সুদৃঢ় নয়, সংগ্রাম ও রণকোলাহলের উদ্দামতা থেকে কবি-মানস আশ্রয় খুঁজে নিতে চায় নিসর্গলোকের রূপ আর কামনার গানে'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' জীবনানন্দ প্রেম আর পিপাসার কবি; তিনি 'পৃথিবীর পথ' ছেড়ে দিয়ে 'মায়াবীর নদীর পারের দেশে' ছুটি পেতে চান। শুধু চকিত হতে হয় কখনও তাঁর উপলব্ধিতে ইতিহাস-সত্যের ক্ষণিক বিদ্যুৎ উদ্ভাসে: 'যোদ্ধা-জয়ী-বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে—পাশাপাশি জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি'। কবির ইতিহাসচেতনার এই আরেকটি মনোবীজ—ইতিহাসের যে ঘনঘটা, যে লিপ্সা ও রক্তাক্ততা যুগে যুগে সাম্রাজ্যের পতন উত্থানের কারয়িত্রী শক্তি সে সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন না: তবে বিপুল সময়ের পটে সে সবের অসারতা এবং মনুষ্যত্বের অন্তর্জাত প্রেরণার কথা তিনি আরও গভীরভাবে জেনেছিলেন বলেই পরবর্তী পর্যায়ে 'রূপসী বাংলা'য় পৌঁছে অভিনিবিষ্ট পাঠক এ'ধরনের 'মননজীবি ত'ার অনুবর্তন বার বার অনুভব করেন:

ক 'বেবিলোন কোথা হারায়ে গিয়েছে—মিশর অসুর' কুয়াশা কালো',
['চাঁদিনীতে' / ঝরাপালক]

খ 'এশিরিয়া ধূলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।'
['মুখপত্রিকা' / রূপসী বাংলা]

গ 'পিরামিড বেবিলন শেষ হল—ঝরে গেল কতবার প্রান্তরের ঘাস'
[সনেট / রূপসী বাংলা]।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। 'পিরামিডে' যে ইতিহাসচেতনার অঙ্কুরোদ্গম এবং পরিণত কাব্যসৃষ্টিতে যে চেতনা সমাজ ও সময়-ভাবনার সংশ্লেষে একটি প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অভিষিক্ত, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়বেদী অবগাহনে 'হৃষ্ট' জীবনানন্দের কবিমন সে চেতনার কোনও উজ্জ্বলতর অভিজ্ঞান রাখেনি।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কাব্যধারার অনুগত কিছু কবিতা মরণোত্তর

কালে প্রকাশিত 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থে সংকলিত, বাগ্‌রীতি ও বিষয়-সাযুজ্যে এগুলি পূর্বগ্রন্থের স্বগোত্র। এখানেও তিনি একদিকে যেমন নৈসর্গিক মাধুরীর তৃষিত রূপকার, অপরদিকে তেমনই মানবিক প্রেমের ব্যথা-বেদনা-আনন্দের ঘনিষ্ঠ আস্বাদনে ব্যগ্র। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শেষ কবিতাটিতে জীবনানন্দ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন 'পৃথিবীর পথ' থেকে। 'পৃথিবীর যতব্যথা-বিরোধ-বাস্তব' সে সবের থেকে কবি 'স্বপ্নের হাতে' নিজেকে সমর্পণ করেছেন, কারণ—

'পৃথিবীর পুরোনো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়।' ('স্বপ্নের হাতে'/ধূসর পাণ্ডুলিপি)

সমাজ ও ইতিহাসঘটিত যে 'পারিপার্শ্বিক চেতনা' জীবনানন্দের নিজেরই মতে তাঁর ইতিহাসচেতনার প্রধান উপাদান [২৬] 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগের কাব্যে তার অপস্মৃতি লক্ষণীয় হলেও নবীনতর ও সমৃদ্ধতররূপে সে 'ইতিহাসবেদ' পুনরাবির্ভূত 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে। সন্ধিপর্বে 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশী স্তবকবন্ধগুলির অবিরল স্রোতে ভাসমান থাকে তবু উপলব্ধি ও মননের এমন কিছু কণিকা যা তাঁর ইতিহাসবোধের পুনরুদবর্তনে সাহায্য করে। 'রূপসী বাংলার' হৃষ্টকবি এই পৃথিবীতে 'অবসর নিতে' এসেছেন; তাঁর সেই অবসরের জগৎ রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণচ্ছটায় মনোরম; স্বপ্নঘন; তবু তা একান্তই আঞ্চলিক। তিনি বাংলার রূপ, তার অপরাজিতার মত নীল আকাশ, তার 'নরম ধানের গন্ধ,' 'কলমীর ঘ্রাণ' 'হাঁসের পালক', সার-পুকুরের জল 'চাঁদা-সর-পুঁটিদের মৃদুঘ্রাণ', 'কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত'—এ সবের মধ্যে অনুভব করেছেন 'বাংলার প্রাণ'।

২৬। 'ময়ূখ'—চিঠিপত্র—৪।

কিন্তু 'পৃথিবীর পথ থেকে' বহুদূর ক্ষুদ্র এক ভৌগোলিকখণ্ডের অধিবাসী 'হৃষ্ট কবি' সময়ের বহতাধারার বৈনাশিকতার পটে সৌন্দর্যের নশ্বরতা অনুভব করেন যে তীব্র গাঢ় প্রেমে, তা'ই যুদ্ধ আর সাম্রাজ্য-বিস্তারের অসার তুচ্ছতা তাঁর চেতনায় প্রতিফলিত করে দেয়। বাংলার 'হৃষ্ট' কবির মন 'দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে'।[২৭] কবির চেতনাজগতের এই প্রসারণ, আঞ্চলিক সীমা-বিমুক্তির পটে ইতিহাস সত্যের নতুন উদ্ভাসনাই[২৮] তাঁকে মানুষের অক্লান্ত স্বপ্ন, তার রক্তাক্ত জটিল পথের রেখা চিনে নিতে বলে ঃ

'আমরা মিনার গড়ি-ভেঙে পড়ে দু-দিনেই-স্বপনের ডানা ছিঁড়ে ব্যথা রক্ত হয়ে ঝরে শুধু এইখানে-ক্ষুধা হয়ে ব্যথা দেয়-নীল নাভিশ্বাস ফেনায়ে তুলিছে শুধু পৃথিবীতে পিরামিড যুগ থেকে আজো বারোমাস ;'

কবি জেনেছেন, স্বপ্নে 'রক্তাক্ততা' আছে, তবু স্বপ্নই সত্য ঃ

'জানি আমাদের স্বপ্ন হতে অশ্রু ক্লান্তি রক্তের কণিকা
ঝরে শুধু, স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ-নিউসিডিয়ায় বসে দেখেনি মণিকা ?
স্বপ্ন কি দেখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লী,
বেবিলন ?'

মানুষের হৃদয়ের এই ক্লান্তিহীন স্বপ্নের উদ্যমই শেষপর্যায়ের কাব্যে 'পারিপার্শ্বিক-চেতনার সংশ্লেষে' 'প্রৌঢ়-পরিণতি' লাভ করে 'প্রয়াণের শুভ স্বপ্ন হয়ে ওঠে ; মানবেতিহাসের অন্তরালবর্তী অন্বেষা ও অগ্র-স্মৃতির চেতনাবহ কবির সে উপলব্ধি ঃ

'নচিকেতা জরাথুষ্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে' ?

['সময়ের কাছে' / 'সাতটি তারার তিমির']

মনে হয়, 'রূপসী বাংলা' যেন কবির নিজেরও পরিস্ফুট কামনার অগোচরে ধরে রেখেছে সময় ও ইতিহাসচেতনার কিছু কণিকা। পরবর্তী

২৭। রূপসী বাংলা (সি. সং/ পৃঃ ৫১)

২৮। 'নতুন আগ্রহে গন্ধে ভরে ওঠে পৃথিবীর শ্বাস' / 'রূপসী বাংলা', পৃঃ ৫৯।

কাব্যযুগের প্রতিনিধিত্ব করছে 'বনলতা সেন' গ্রন্থটি। জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টিতে এই গ্রন্থ একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। 'মহাপৃথিবী' প্রায় সমকালীন রচনার সংকলন হয়েও কবির সৃষ্টি-পরিসরে আর একটি সন্ধিপর্বের সূচনা করছে; কারণ, প্রায় সেই সময় থেকেই প্রকৃতিপ্রেমিক জীবনানন্দ নিজেকে আবিষ্কার করেছেন দুই মহাযুদ্ধে আলোড়িত পৃথিবীর তীব্র সচেতন যন্ত্রণাদীর্ণ আধুনিকের চেতনার প্রবক্তা হিসাবে। সেই অন্তিমপর্বের রচনায় জীবনানন্দর ইতিহাস-সচেতনতা 'কালজ্ঞানে'র পরিচ্ছন্নতায় সবচেয়ে স্পষ্ট ও পরিণত। সেখানে পৌঁছবার আগে 'বনলতা সেন' যুগেও কবির ইতিহাসবোধ সচেতন মননোদ্ভাসিত, যদিও তা' স্বকাল ও সমাজঅভিজ্ঞতার আশ্লেষে ততটা যন্ত্রণাদীর্ণ নয়, যেমন তাঁর সৃষ্টির শেষঅধ্যায়ে। 'বনলতা সেন' যুগে জীবনানন্দর কাব্যে প্রতীকায়নের শিল্পসিদ্ধ প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং কবিতাকে একটি পরাবাস্তব ব্যঞ্জনায় পৌঁছে দিতে তা কেমনভাবে সাহায্য করেছিল সে আলোচনা অন্যত্র করেছি।[২৯] এ পর্বের সৃষ্টিতে একটি সক্রিয় ইতিহাস-বোধ একদিকে যেমন কাব্যের পরিমণ্ডল রচনায় জীবনানন্দকে সাহায্য করেছে, যেমন 'বনলতা সেনে' খুবই স্পষ্টতার সঙ্গে, অন্যদিকে তেমনই ইতিহাসের নিগূঢ়তর ভাবসত্যে অভিষিক্ত করেছে কাব্যকে, যেমন 'সুচেতনা'য়।

'বনলতা সেন' নাম-কবিতাটি জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা প্রসঙ্গে প্রায়ই উল্লেখিত হয়। সে সব উল্লেখ অবশ্য কিছু বিকীর্ণ ইতিহাস-উপাদানের চয়নেই নিরস্ত হয়—'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ', 'বিদিশা' বা শ্রাবস্তীর' নামোল্লেখের মতন। কিন্তু ইতিবৃত্তস্পর্শী এ জাতীয় উল্লেখ একটি মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল রচনা ছাড়াও এ' কবিতার ভাববস্তুতে সঞ্চারিত করেছে ব্যাপ্তি ও গভীরতা। 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে কবি যখনই বলেন, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ

২৯। 'অন্যতর মূল্যায়নে'—প্রদ্যুম্ন মিত্র ; প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, ১৯৫৫।

হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে', তখনই কাব্যে কবির ব্যক্তি ও উত্তর-ব্যক্তি সত্তা একটি 'কৃতার্থ সংস্থানের' মধ্যে আশ্বস্ত হয় ; স্রষ্টা তখন নিজেকে আবহমান মানবাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে নেন। এই পথ হাঁটা, যা দেশ কালের সীমারেখা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত (বিম্বিসার অশোকের জগৎ থেকে সিংহলসমুদ্র কি মালয়সাগর পার হয়ে) কোনও 'দুশ্চর তটের' সন্ধানে, কোনও প্রার্থিতেরই অন্বেষায় স্বীকৃত। কবিতার রূপকল্পের গণ্ডীতে সেই অন্বিষ্ট 'বনলতা সেন' ; কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপ্ত পটভূমিতে তা মানবের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সমুদ্র ও নাবিকীর অনুষঙ্গ এই ব্যাকুল অথচ দিশাভ্রান্ত অন্বেষার ব্যঞ্জনা ঘনীভূত করেছে। কবির ইতিহাসচেতনা এখানে কবিতাটিকে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় মানবাত্মার ক্লান্তিহীন যাত্রা ও উত্তরণের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধতর করেছে। 'বনলতা সেন' শেষাবধি কবির ব্যক্তিসত্তার প্রেমার্ত নিবেদনকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেন মানবাত্মার চিরকালীন শ্রেয় ও প্রেয় অন্বিষ্টের প্রতীক এবং একটি প্রত্যয়ী ইতিহাসবোধের সংশ্লেষেই এই 'ইঙ্গিতের দিব্যতা'[৩০] সম্ভবপর হয়েছে।

মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে যুগপ্রতিবেশচিহ্নিত সমাজ এবং আনন্ত্যউৎসারী সময়চেতনার প্রেক্ষিতে ঠিকমত বুঝে নেওয়াই জীবনানন্দর কাছে ইতিহাসের সঠিক বোধ বলে মনে হয়েছিল। সে-ভাবে দেখলে, মানবেতিহাসের মধ্যে একটি ক্লান্তিহীন অন্বেষার স্বর এবং নবসভ্যতায় উদ্‌বর্তনের প্রাণনা তিনি গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন। 'বনলতা সেন' গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায়, চিত্রকল্পের ইঙ্গিতে এবং উচ্চারণের স্পষ্টতায়, এই চেতনা কাব্য-রূপায়িত। অন্বিষ্টের সন্ধানে মানবতার চিরযাত্রার ব্যঞ্জনাটি স্পষ্ট করতে কবিতায় তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন নাবিক ও নাবিকীর চিত্রকল্প ; অন্যদিকে প্রার্থিতকে চিহ্নিত করেছেন সৌরচেতনার হিরণ্ময় আলোকে যা হল 'অন্ধকার থেকে এসে নবসূর্যে জাগার মতন'। 'ভোরের

৩০। 'কবিতার কথা' ; পৃঃ ২১।

কল্লোল', 'অনন্ত সূর্যোদয়', 'অন্তিম প্রভাতে'-এর মত শব্দবন্ধনির্মাণ 'সিন্ধুরাত্রি মৃতদের রোল' কিংবা 'শাশ্বত রাত্রির' চিত্রের বিপরীতে বারবার যা' রাখা হয়েছে এ গ্রন্থে, তা' এই মানবাত্মার তিমিরাভিযান ও নবসভ্যতার তিমির-বিনাশী চেতনাকণিকাকে বহন করেছে। 'বনলতাসেন', 'সুচেতনা', 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'মিতভাষণ' এবং 'হাজার বছর শুধু খেলা করে'—এই কবিতাগুলির একত্রিত এবং অভিনিবিষ্ট পাঠে যে ধারণা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে তা হল : সময় একটি অবিরল বিশাল প্রবাহ ; মানব সেই কালস্রোতে ভাসমান 'নাবিক' এবং তার লক্ষ্য এক 'নবপৃথিবী'। কবি নিজেকে আবহমান কালের মানবাত্মার প্রতিভূরূপে দেখেছেন এবং সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় মানবের অক্লান্ত অন্বেষাকে প্রেমের রূপকে উপস্থিত করে তার চিরন্তন আর্তি ও অভীপ্সাকে পরিস্ফুট করেছেন :—

> 'সবিতা, মানুষ জন্ম আমরা পেয়েছি
> মনে হয় কোন এক বসন্তের রাতে
> ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি
> তাহাদের সাথে সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন',

আবার,

> 'অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা
> সিন্ধুর রাত্রির জল জানে
> আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে'[৩১]

কিম্বা অন্যত্র,

> যেন সব মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
> ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
> আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে,—[৩২]

'এই 'নবপৃথিবী' বা' 'নবসভ্যতা' বা 'বনলতা সেন' কবিতার 'দারুচিনি

৩১। 'সবিতা' / বনলতাসেন। ৩২। 'সুরঞ্জনা' / বনলতাসেন।

দ্বীপ', বা 'মিতভাষণ' কবিতার 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'—সব কটি চিত্রকল্পই একটি প্রার্থিত অন্বিষ্টের প্রতীক যার জন্য হাজার বছর ধরে কিম্বা 'হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর'[৩৩]ও মানুষ সংগ্রামরত।

মানবসভ্যতার জয়যাত্রার পথ যে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা' জীবনানন্দ তা' জানতেন। ফরাসী বিপ্লবের আলোচনা করতে গিয়ে কার্লাইল বিস্মিত হয়ে ভেবেছেন, একদা যা ছিল সুস্থিত, শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত সমাজ তা কি করে ভয়াবহ সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কার্লাইল জেনেছিলেন এই ধ্বংসের অনিবার্যতা : "Inevitable ; it is the breaking up of the word solecism, worn out at last."[৩৪] কবির অনুভবজারিত মননশীলতায় জীবনানন্দ জানান :

'মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে
বড় বড় নগরীর বুক ভরা ব্যথা',[৩৫]

যে শক্তি বা শৃঙ্খল, একটি যুগকে ধারণ করে রাখে অন্যযুগের পক্ষে প্রায়ই তা হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয় শৃঙ্খলের মত ; তখন ভাঙনের মধ্য দিয়েই আসে শৃঙ্খল-মুক্তি ও নবীন জাগরণ। 'গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন'[৩৬] এ'ভাবেই পুরানো পৃথিবী পুড়ে যায়। ইতিহাসচেতনার আলোকেই জীবনানন্দ এ সবই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বলতে পারেন,

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন,
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে'[৩৭]

এক অসুস্থ বিকল পৃথিবী'র ধ্বংস ও ভাঙনের শক্তিগুলিই পরোক্ষে কাজ করে যায় 'নবপৃথিবী'র উদ্বোধনের জন্য, এই সত্যই বারবার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

৩৩। পথহাঁটা / বনলতাসেন।
৩৪। The French Revolution, 1, ch. 4.
৩৫। 'সবিতা' / বনলতাসেন।
৩৬। মিতভাষণ / বনলতাসেন।
৩৭। সুচেতনা / ব.সেন।

আগেই বলেছি, 'বনলতা সেন' পর্বায়ে জীবনানন্দের কাব্য গভীর-ভাবে প্রতীকাশ্রিত। 'সুচেতনা' কবিতাটি ইতিহাসচেতনায় নিষিক্ত হয়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় 'সু-চৈতন্যে'র উদ্বোধন ঘোষণা করে। এই সুচৈতন্য ইতিহাসবেদেরই দান; কবিমানসে 'আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে' সে চেতনা মানবসভ্যতার শুভ ও কল্যাণবহ সম্পদগুলি চিনে নিতে সাহায্য করে। রণরক্ত কোলাহলে আলোড়িত ইতিহাসের ঘনঘটা যে মানবেতিহাসের শেষকথা নয় কবি তা জানেন। এই রক্তাক্ত কাজের আহ্বান, মারণপ্রবণতা আর অসার স্বর্ণলিপ্সার গ্লানি বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো সাধকদের প্রাণ হয়তো বিমূঢ় করে দিয়েছে বারবার—তবু এই সংঘর্ষ, মৃত্যু আর অন্তহীন অন্বেষার পথেই আছে মুক্তি :

'এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে,
সে অনেক শতাব্দীর মণীষীর কাজ,
এ বাতাস এক পরম সূর্যকরোজ্জ্বল,
প্রায় ততদূর ভালো মানব সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।'

ইতিহাসচেতনার এর চেয়ে কাব্যসুষমাময় উচ্চারণ জীবনানন্দের নিজের কাব্যে অন্য কোথাও, এমন কি সমগ্র বাংলা কাব্যেও, দুর্লভ। একটি সুস্থিত ইতিহাসচেতনার অনেকগুলিদিকই এখানে শৈল্পিক তৃপ্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটিয়েই উচ্চারিত হয়েছে। 'ক্রম মুক্তি' এবং 'অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ' শব্দপ্রয়োগগুলি লক্ষণীয়। মানব-চৈতন্যের বিস্তারে মনীষীদের যে অবদান, তার জন্যেই সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা তাৎপর্যমণ্ডিত। হেগেলের সেই অনবদ্য সদুক্তিটি উদ্ধৃত করার প্রলোভন রোধ করা গেল না :

'The great man of the age is the one who can put into words the will of his age, tell his age what its will

is and accomplish it. What he does is the heart and essence of his age ; he actualizes his age.[৩৮]

অতীতসমাজের সঠিক অনুধাবনের ফলে বর্তমান সমাজের শক্তিগুলির যথাযথ বিচার ও নিয়ন্ত্রণ, এই দ্বিবিধ দায়িত্বই ইতিহাসচর্চার দায়িত্ব। কোনো বিশেষ যুগের চিন্তা ও কর্মনায়কেরা সেই সব সামাজিক শক্তির উদ্‌বর্তনে সাহায্য করেন তাদের ভাবনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে, যেগুলি পৃথিবীর স্থায়ী চেহারাটা বারে বারেই পাল্টে দেয়। ইতিহাসের শক্তিগুলি যে মানবসভ্যতাকে নিয়ে চলেছে নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং ইতিহাস যে কোনও আকস্মিক ও প্রক্ষিপ্ত পরিবর্তনের বিস্ফোরণ ঘটায় না—এ সবকিছুই উদ্ধৃত পঙক্তিগুলিতে উচ্চারিত। কিন্তু শিল্পসৌকর্যের লেশতম ব্যত্যয় কবি সে উচ্চারণে ঘটতে দেননি। জীবনানন্দ এখানে সার্থকভাবেই স্বনির্দিষ্ট নিরীখের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আবেগ ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির নিটোল 'সুরসাম্যে' 'সুচেতনা' কবির ইতিহাসভাবনার আর একটি অনবদ্য শিল্পকর্ম।

'সুচেতনা' কবিতার ইতিহাসভাবনা সম্পর্কে আরও একটি কথা থেকে যায়। হেরোডোটাস, থুকিডিডিস প্রমুখ ধ্রুপদী ইতিহাসবিদরা মনে করতেন, যে সময়ের ইতিহাস তাঁরা লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন, তার আগে বা পরে তেমন অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ কোনও কিছু নেই। এই বিশ্বাসের প্রতিফলন লুক্রেশিয়াস-এর রচনায় :

'ভেবে দেখ অনন্তকালের অন্তর্গত অতীত যুগনিচয়, যা আমাদের জন্ম পূর্ববর্তী, কিভাবে আমাদের চিন্তা-বিবেচনার বাইরের বিষয়। এ থেকেই বোঝা যায় কিভাবে প্রকৃতি তুলে ধরে তার মুকুর সেই কালের দিকে যা. আমাদের মৃত্যুর পরবর্তী'।[৩৯] ধ্রুপদী কালের

৩৮। Hegel : Philosophy of History ; P. 295.

৩৯। Lucretius . De Rerum Natura ; iii

মানবযূথ অধুনার বাইরে অতীত কি ভবিষ্যৎপ্রমাণে নিজেদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেনি। সাহিত্য ও শিল্পকর্মে তাই উজ্জ্বল আগামীকালের কল্পনা প্রত্যাবর্তিত হয় কোনও অতীত স্বর্ণযুগের বোধনে। শুধু ভার্জিলিই তার ইনিডের চতুর্থ সর্গে এই ইতিহাসের চক্রাবর্ত গতিপথ থেকে কল্পনাকে মুহূর্তের জন্য মুক্তি দিয়ে বলেন: Imperium sine fine dedi. খ্রীষ্টীয় চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসকে দূরবীক্ষণী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার শুরু; আর তখনই ইতিহাস-চিন্তার মধ্যে ক্রমাগ্রগতির ধারণাটি প্রসার লাভ করে। ইতিহাস যখনই অগ্রগমনের প্রতীক তখনই মানব সমাজের অতীত কর্মকাণ্ডগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যমুখিনতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব—ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় শক্তিগুলি তখন সভ্যতা থেকে নব-সভ্যতার অর্থহীন চক্রাবর্তে মানব-সমাজকে পৌঁছে দেয় না, উত্তরিত করে দেয়, যেমন জীবনানন্দ বলেছেন; 'আরো বড় চেতনার লোকে, শুভ ও পরিচ্ছন্ন সমাজ প্রয়াণের দিকে'। 'সুচেতনা' কবিতায় জীবনানন্দ যখন সিদ্ধান্ত নেন:

'দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়।'

তখন ইতিহাসের চক্রাবর্ত তত্ত্বটিই বড় হয়ে ওঠে সে ভাষণে। তখন মনে হয়, কবি যদিও 'রণরক্ত কোলাহল শেষ সত্য' নয় বলে ঘোষণা করেছেন, যদিও 'ক্রম-মুক্তি'র বিশ্বাসে উদ্দীপিত, তবু যেন ইতিহাসের ঘনঘটার মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতার উত্তর-প্রয়াণের বিশ্বাস-দীপ্তি তেমন গভীর রেখাঙ্কিত নয় কবির মননে। সেই 'উদ্দীপ্তি' 'উত্তর-প্রবেশ' বা 'নবপ্রয়াণের' কথা শোনার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত যেখানে প্রতিবেশ-চেতনার আশ্রয়ে তাঁর ইতিহাস-বোধ উজ্জ্বলতর পরিণতি পেয়েছে।

'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে পৌঁছলে জীবনানন্দের কাব্যে পালা বদলের চেহারাটা স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ধরা পড়ে, এবং নিবিষ্ট

পঠনে প্রায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যভাবে অনুভব করা যায় এ গ্রন্থের প্রতীকী ইঙ্গিতময়তা। প্রতীকের সূক্ষ্মতার উন্মোচন ছাড়া 'সাতটি তারার তিমির' নামকরণটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। সাতটি তারা আমাদের মনে নিয়ে আসে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ভাবানুষঙ্গ, যে সপ্তর্ষি ধ্রুবতারার সাহচর্যে মানবের কাছে ইতিহাস-কাল হতে পথের দিশারী। কিন্তু এই দিশারী সপ্তর্ষির আলোকের কথা কবি বলেন নি, বলেছেন তার তিমিরময়তার কথা। সধ্রুবসপ্তর্ষিমণ্ডল শাশ্বতকালের দিশারী; তার আলোক দিক্‌দর্শিন, দিশাহীনতার দ্যোতক নয়। জীবনানন্দ এখানে সাতটি তারার তিমিরময়তার প্রতীকে বলতে চাইলেন সেইসব রীতি, নির্দেশ আর মূল্যবোধের অর্থহীনতার কথা যা এতকাল মানবকে তার সভ্যতা থেকে নবসভ্যতার উত্তরণের যাত্রায় পথ দেখিয়েছে। বিপন্ন অন্ধকারে বিক্ষুব্ধ কালস্রোতের কলরোলে মানুষ এতদিন নির্ভর করেছিল তার বিশ্বাসবোধ সংস্কার রীতির আলোকিত নির্দেশে। কিন্তু, 'এই বিশ শতকে এখন আলো অন্ধকারের আর এক রকম মানে।'[৪০] এবং 'আঁধার নেপথ্য সব চারিদিকে কূল থেকে অকূলের দিক নিরূপণে শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর—'[৪১]। প্রাচীন পথনির্দেশক সপ্তর্ষিমণ্ডল তথা মানবের বিশ্বাস ও মূল্যজ্ঞান আজ নির্দেশে পরাহত; তার আলো আজ মূল্যহীন, তাই তিমিরময়। যা আলোকদেশি তার অন্ধকারময় হয়ে যাওয়ার এই মানস-অভিজ্ঞতাটি এই পর্যায়ের কাব্যে নানাভাবেই ধরা পড়েছে, কখনও কবিতার নামকরণে ('সূর্যতামসী', 'অন্ধকার থেকে'), কখনও বা চিত্রকল্পের পৌনঃপুনিক আবির্ভাবে ('অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির' চিত্রকল্পটি একাধিক কবিতার ভারকেন্দ্রে রয়েছে—যেমন 'রিষ্টওয়াচ', 'সূর্যপ্রতিম' কবিতায়)। এসবের একটি কারণ, দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ও অব্যবহিত পরে রচিত 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের[৪২]

৪০। 'এইখানে সূর্যের' / শ্রেষ্ঠ কবিতা। ৪১। 'মানুষ যা চেয়েছিল' / বেলা অবেলা
৪২। 'বেলা অবলো' ও অগ্রন্থবদ্ধ কবিতাবলী।

রচনায় যে 'তুমুল জটিল' পৃথিবীতে আধুনিকের বাস, বিশ্বাস অবিশ্বাসের যে টানে' তার মানসসত্তা আলোড়িত, তার অবারিত প্রতিফলন ঘটেছে। ইতিহাসচেতনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ বারবার যে 'সমাজবোধ', 'প্রতিবেশ চেতনা' বা 'পারিপার্শ্বিক-চেতনা'র কথা বলেছেন তার সংশ্লেষেই উত্তর-পর্যায়ের কাব্য এমন আলোড়িত ও ভিন্ন মেরুবিন্দুতে আশ্রিত। কবিতাকে 'সমাজের মুখপত্রে'র মত দাঁড় না করিয়েও তাঁর কাব্য 'নতুন যুগের প্রয়োজনে নতুন ভাবে উপজাত' এবং 'সমাজের মর্মের ভিতরে' প্রবেশ করেছে।[৪৩] ফলে, একালের কাব্যে কোনও প্রয়াত স্বর্ণযুগে স্বপ্নপ্রয়াণের কথা নেই, নেই ইন্দ্রিয়সংবেদী কোনও নিসর্গ-নিমজ্জন, পরিবর্তে রয়েছে 'মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাস'[৪৪] যা 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে' জেগে উঠে দেখে 'বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে'।[৪৫] আবিশ্ব মূল্যবোধের বিপর্যয়ে অভিভূত এই পৃথিবী যেখানে 'পংকিল সময় স্রোতে',[৪৬] 'ক্ষমাহীন রক্তে-নিরুদ্দেশে', সেখানে 'সীমাহীন ভ্রান্তিবিলাসে ক্ষতবিক্ষত জীব'।[৪৭] 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবি দাঁড়িয়ে রয়েছেন সমকালের তীক্ষ্ণাগ্রমুখ অসিফলকের মত চেতনার ভূমিতে; তাঁর সংবেদনশীল মন ধারণ করেছে আপন চেতনালোকে এক সমাচ্ছন্ন আঁধারের প্রহার: 'চোখের ওপরে / রাত্রি ঝরে / যেদিকে তাকাই / কিছু নাই / রাত্রি ছাড়া'; 'কোথাও দিৎসা নেই', কোনো 'উদ্দীপ্তিও নেই'। মানুষের জীবনের উত্তরণ যেন মাঝপথে থেমে গেছে; মৃত্তিকার এই দিকে শুধু ঋণ রক্ত লোকসান ইতর খাতক—জীবনের মানে জীবনের নিকটে ব্যাহত। এই অবক্ষয়ের রলরোল 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কবিতাগুলিতেও ধ্বনিত। সেখানে কবি প্রত্যক্ষ করছেন, 'জনমানব-সভ্যতার এক

৪৩। রুচি বিচার ও অন্যান্য কথা / ক. কথা। ৪৪। 'মনোসরনি'।
৪৫। 'সোনালি সিংহেব গল্প'। ৪৬। 'কবিতা'। ৪৭। 'প্রতীতি'।

ভীষণ নিরুদ্দেশ যাত্রা'। 'ইতিহাসের গোলকধাঁধায়' বন্দী মরুভূমির বাসিন্দা যেন মানব—স্খলিত নিহত তার মনুষত্ব—'এক দুরপনেয় স্খলনের রক্তান্ধের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি', যেখানে 'হয়তো বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা, হয়তো বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক'। এই 'রক্তবণিক' পৃথিবীবাসের অভিজ্ঞতা যখন ইতিহাসবেদী চেতনায় অভিঘাত আনে, তখন জীবনানন্দকে লিখতে হয়ঃ চেঙ্গিস আজও 'করুণ রক্তের অভিযানে'—'খোঁড়া পায়ে' তৈমুর চলেছে আগ্রাসে। রাষ্ট্রসমাজ 'অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা', আর 'প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো'—ক্রমপরিণতির পথে মানব আজ শুধু 'লিঙ্গশরীরী' হয়ে গেছে।[৪৮]

উপরের উদ্ধৃতিবহুল অনুচ্ছেদটিতে শুধুমাত্র কবির স্বকীয় উচ্চারণের সাহায্যেই তাঁর শেষপর্যায়ের কাব্যের তীব্র সমাজসচেতন সংবেদ স্পষ্ট করতে চেয়েছি। চারিদিককার প্রতিবেশ-চেতনার আঘাতে পূর্ব পূর্ব পর্যায়ের অনেকটা গ্রন্থাবলিভুক ইতিহাসবোধ এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার অগ্নিপরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে শুদ্ধতাভিক্ষু। কিন্তু, আঘাত যেমন সচেতন করে তেমনই আকস্মিকতায় বিমূঢ়ও করে। সেই বিহ্বলতার প্রাথমিক জাড্য ও দ্বিধা এসময়কার বেশ কিছু কবিতার জিজ্ঞাসা-সংকুল চরণগুলিতে রেখাঙ্কিত। ইতিহাসের রণরক্ত কোলাহলে (যা কবির কাছে কখনই মনে হয়নি শেষ কথা) মহামানব-মনীষার নিরলস প্রয়াসে মানবভবিষ্যের যে ক্রমমুক্তির বাণী তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন 'সুচেতনা' কবিতায়, নাবিক-মানবাত্মার জন্য যে শ্রেয়তর বেলাভূমির আশ্বাসে নিশ্চিত ছিলেন তিনি 'বনলতা-সেন' বা 'মিতভাষণ'-এর মত রচনায়, তা যেন পরবর্তীকালে কখনও কখনও 'অনাথ ইতিহাসের কলরবে' দুরশ্রুত, 'অন্তহীন অবক্ষয়ে'

৪৮। 'গভীর এবিবেলে', 'সময়ের তীরে', 'মহাত্মা গান্ধী', 'তোমাকে', 'যতিহীন' / বেলা-অবেলা কালবেলা।

অবসিত, 'অলজ্ঘ্য অস্ত্যশীল অন্ধকারে' লক্ষ্যভ্রষ্ট।[৪৯] মানুষের সভ্যতার তিমিরাচ্ছন্নতার যে বোধ এ পর্বের সৃষ্টিতে প্রকট, তারই স্বাভাবিক অনুষঙ্গে এসেছে এই দ্বিধা ও দিশাভ্রান্তি। কোনও প্রাক্‌কল্পিত বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্যে হিরণ্ময় হয়ে উঠতে পারেন না অন্তঃপ্রেরণার কাছে বিশ্বস্ত জীবনানন্দের মত কবি। সমকাল ও স্বযুগের সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলি নিখাদ প্রতিফলিত হয় তাঁর কাব্যে। অনুভব ও আবেগের আদি আলোড়নের সঙ্গে ঐতিহ্যজ্ঞান ও প্রজ্ঞার মিলনে ঘনীভূত যে চেতনা মানবভবিষ্যে আস্থাশীল, প্রয়াণোন্মুখ এবং সৌর-করোজ্জ্বল ('কামানের ঊর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল' অর্থাৎ এক আলোকিত পৃথিবীর স্বপ্নে ভাস্বর,) জীবনানন্দের সেই ইতিহাসচেতনা আবহমান মানব-অভিজ্ঞতায় 'পরিদীক্ষিত'; অতীত, অধুনা ও অনাগতের যথার্থ অনুধাবন ও সুরসাম্যে সুস্থিত। ইতিহাসের নিরর্থক রক্তাক্ততার দিকেও তিনি যেমন অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন ('আত্তিলা চেঙ্গিস') তেমনই ইতিহাসের অন্তর্জাত মনীষার সংশ্লেষে সভ্যতার নিঃশব্দ প্রয়াণমুখী বিকাশের কথাও শোনাতে বিস্মৃত হননি ('বুদ্ধ কনফুশিয়স, জরাথ্রুষ্ট-এঞ্জেলো-রুশো লেলিনের মনের পৃথিবী')। এভাবেই তাঁর চেতনালোকে শেষপর্যন্ত তিনি শুনেছেন এক অবিনাশী আলোকদেশি গতির স্তব যা 'সৃষ্টির অমল মরাল' বা 'আকাশহংসী'র প্রতীকে বারবার ফিরে এসেছে তাঁর শেষপর্যায়ের কবিতাবলীতে। /গতিই যে ইতিহাসের অন্তিম সত্য জীবনানন্দ সেকথা ঘোষণা করতে ভোলেননি। ইতিহাসের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন দ্বন্দ্বের শক্তি। দ্বান্দ্বিক গতির ধারণায় আপন প্রজ্ঞা ও ইতিহাসবোধের দ্বারস্থ ছিলেন বলেই তিনি অনায়াসে উচ্চারণ করেছেন 'গতির গুণগান'।/ স্থিতির শান্তিতে মানব মুগ্ধ হতে চেয়েছে বারবার; কিন্তু, 'কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত

৪৯। 'হেমন্ত রাতে', 'দেশকালসন্ততি' / বেলা অবেলা।

ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই'। জীবনানন্দের উজ্জীবিত আহ্বান তাই বাঙ্ময় হয় চিরমানবের সম্মুখ-যাত্রার উৎসবে :

হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে, সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;

এই গতি কিন্তু ইতিহাসের চক্রাবর্তগতির ধারণা সঞ্জাত নয় ; এই নবীন গতিচেতনা প্রয়াণমুখী, প্রত্যাবর্তনপ্রবণ নয়। এক অতীত-মুখী ইতিহাসচারিতা জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির আদিপর্যায় থেকে 'বনলতা সেন' যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নিশ্চেতন আবিষ্ট ইতিহাসবোধ কবিকে ডেকে নিয়েছিল বারবার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সৌর্য ও সৌন্দর্যের জগতে, উদ্বোধিত করেছিল তাঁর কাব্যে অতীতগরিমার এক রোমান্টিক বিষাদঘন বোধন ('নগ্ননির্জন হাত' 'হাওয়ার রাত', 'সিন্ধু সারস,' 'শ্যামলী'); আবার, কখনও বা মানবেতিহাসের অন্তহীন বলয়িত আবেষ্টনে আবৃত্ত তাঁর আপতিক অভিজ্ঞতা বলে : 'দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়' বা 'আরেক গভীরতর শেষরূপ চেয়ে দেখেছে সে তোমার বলয়'।[৫০] জীবনানন্দের মননে ইতিহাসচেতনার স্ফুটনে ইতিহাসের বলয়িত গতির প্রত্নবোধই তাঁকে একদা মিশরের অতীত-গরিমার পুনর্জাগরণের প্রত্যাশী করেছিল ; তারই পরিণততর কাব্য উচ্চারণ 'বনলতা সেন' বা 'মহাপৃথিবীর' কবিতায় কবিতায় :

ভূপৃষ্ঠের এই দিকে জানি আমি আবার নতুন ব্যাবিলন
উঠেছে অনেক দূর—শোনা যায় কর্নিশে সিংহের গর্জন[৫১]

অথবা

আমাদের প্রভু বিরতি দিও না, লাখো লাখো যুগ
রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও : পিরামিড গড়ে—পিরামিড ভাঙে গড়ে।[৫২]

৫০। 'বিভিন্ন কোরাস' / সাতটি তারার তিমির। ৫১। 'পরিচায়ক' / মহাপৃথিবী।
৫২। 'প্রার্থনা' / মহাপৃথিবী।

বা

পৃথিবীর রাজ পথে—রক্ত পথে—অন্ধকার অববাহিকায়
এখনও মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মত বার হয়।[৫৩]

কবির পরিণত ইতিহাসবোধ কিন্তু দূরান্বিষ্টমুখী, ক্রমবিবর্তমান ও উত্তরণ-প্রয়াসী। কবি জেনেছেন, 'ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা' রোল / উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড় চেতনার লোকে'[৫৪]। ইতিহাসের সত্য হল, 'নব নব মানবের তরে / কেবলি অপেক্ষাতুর' পথ চিনে নিতে চাওয়া।[৫৫] তাই,'মানবহৃদয়' চলেছে এক 'নবপ্রস্থানের দিকে', যদিও তার কবি-সত্তা প্রাতবেশের বিরুদ্ধতা, সমাজ ও সময়ের অপশক্তিগুলি সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি জেনেছেন, মানুষের 'চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা'[৫৬] রয়েছে; 'মাঠের ফসলগুলো বারবার ঘরে তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে';[৫৭] দেখেছেন, 'অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকারে' মানব আজ দিশাহীন; মনে হয় সে যেন জেগে উঠেছে 'জীবাণুর থেকে' এক 'হেতুহীন সম্প্রসারণে'; এবং সবই তো,

নদীর ও নগরীর
মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত
নিরুপম সূর্যালোক জ্বলে গেছে তার
ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে—

তবুও অপেক্ষাতুর হৃদয়স্পন্দন আছে। আছে 'কোথাও সূর্যের ভোর', 'অলক্ষিতে কোনখানে জীবনের আশ্বাস', 'সূর্যালোকিত সব সিন্ধু পাখিদের শব্দ'।[৫৮] তাই, 'নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক'। কবির চেতনালোকে এই

৫৩। 'আবহমান' / মহাপৃথিবী।
৫৪। 'উত্তরপ্রবেশ' / সা. তা. তি.।
৫৫। 'সময়ের কাছে' / সা. তা. তি.।
৫৬। জনান্তিকে / সা. তা. তি.।
৫৭। 'সময়ের কাছে' / সা. তা. তি.।
৫৮। 'সূর্যপ্রতিম, সূর্যতামসী' / সা. তা. তি.।

প্রয়াণ-প্রতিজ্ঞা ইতিহাসবেদের গভীর সংশ্লেষে সৃষ্ট হয়েছে নাবিকী ও সৌরকরোজ্জ্বলতার ভাবনায় সমৃদ্ধ দুটি মৌল চিত্রকল্প যা তাঁর শেষ পর্বের কবিতাগুলিতে পুনরাবৃত্ত। আবহমানের নাবিকমানবাত্মার যাত্রা তিমিরসমুদ্র থেকে এক সূর্যালোকিত সৈকতের দিকে, সৌর-চেতনাময় ভোরের প্রয়াণে ঃ

'হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা
সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু?'

'বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে/অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চলে যাও—দুপুর বেলায়, /বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ায়/মোমের আলোকগুলো রয়েছে পেছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো,/তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর দিকচক্রবাল হৃদয়ে পাবার/প্রয়োজন রয়ে গেছে—যতদিন স্ফটিক পাখনা মেলে বোলতার ভিড়/উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে ; /এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস/নীলিমাকে খুলে ফেলে যতদিন ; ভুলের বিনুনি থেকে আপনাকে মানব হৃদয় ; / উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি-নাবিক-অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।'[৫৯]

আমরা আগেই বলেছি, জীবনানন্দের ইতিহাসবোধে নাবিকী-চেতনা একটি মনোবীজের মত তাঁর কাব্যসৃষ্টির জন্মলগ্নেই উপ্ত হয়েছিল। পরিণত কাব্যপ্রয়াসে সে চেতনার নানা নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে কাব্যের ভাববস্তু ও চিত্রকল্পের নতুন নতুন বিস্তারে। 'বনলতাসেন', 'সবিতা', 'শ্যামলী', বা 'সুচেতনা'র মতো রোমান্টিক আবেগে স্ফূর্ত কবিতা-বলীতেও নাবিক ও তার অবিরত অন্বেষার ভাবনাটি বারবার এসেছে। কিন্তু শেষপর্যায়ের কবিতায় যেখানে শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও গ্লানিতে প্রেম ও প্রিয়তার ব্যঞ্জনাময় কাব্যপ্রয়াস অন্তর্হিতই বলা চলে, সেখানেও মানবেতিহাসের অন্তরালবর্তী মৃত্যুহীন শুভ শক্তিগুলির নিরন্তর

৫৯। নাবিক / সাতটি তারার তিমির।

সংগ্রাম ও অন্বিষ্টসন্ধানের উদ্যমকে জীবনানন্দ নাবিক ও নাবিকীর চিত্রকল্পে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিমূর্ত করেছেন। এ সবই কিন্তু অতর্কাতীত করে মানবভবিষ্যে কবির প্রগাঢ় আস্থা। সমকাল ও স্বযুগের গ্লানিদীন রক্তাক্ত মানবঅভিজ্ঞতাকে তিনি কাব্যে ধারণ করেছেন, সে অভিজ্ঞতার কাছে সৎ ও আন্তরিক থাকার প্রয়োজনে। আধুনিক মানবের যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, বিপন্নতা ও বিশ্বাসহীনতার বোধ তাঁর কবিতায় এমন তীব্র আপোষহীন উচ্চারণে ধরা পড়েছে যে কেবলমাত্র শেষপর্যায়ের রচনাপাঠে কোনও পাঠকেরই মনে হবে না এই জীবনানন্দ একদা ইন্দ্রিয়সংবেদনাঘন নিসর্গ-মাধুরী অথবা প্রয়াত সৌন্দর্যের 'হৃষ্ট' রূপকার ছিলেন :

একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে,
উঠে ভেঙে গেছে। ··
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসেনাকো।[৬০]

বা

স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো,
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী।[৬১]

এই সর্বায়ত হতাশা ও নৈরাজ্যের সমাজমনস্ক উপলব্ধি 'সাতটি তারার তিমির' ও সমসাময়িক কাব্যে প্রতিবেশচেতনার শক্তিতে এত প্রবলভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়েছে যে এমন কি ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় প্রয়াণ-প্রেরণায় জীবনানন্দ কখনও কখনও আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হতে পারে :

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে

৬০। রাত্রির কোরাস / সা. তা. তি.। ৬১। গভীর এরিয়েলে / বেলা অবেলা।

হয়তো বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চলে যাওয়া—, গোলক ধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে।[৬২]

কিন্তু, যে নিগূঢ় ইতিহাস-সত্যে তিনি আস্থাশীল, যা তাঁকে সিন্ধুসারসের গানে একদা শুনিয়েছিল হতাশ্বাস রাত্রির অবসান-সঙ্গীত, যার অমেয় প্রেরণায় কোনও অন্তিম সূর্যকরোজ্জ্বল মানবসমাজের স্বপ্নরচনা করেছেন, সেই প্রত্যয়ের শক্তিতেই তিনি আবার বলতে পারেন :

'ইতিহাসে মাঝেমাঝে এ রকম শীতঅসারতা/নেমে আসে, চারিদিকে জীবনের শুভ অর্থ রয়ে গেছে তবু'।[৬৩] ধ্বংস ও মূল্য-বিপর্যয়ের শ্মশানে দাঁড়িয়ে কবি দেখেছিলেন যেমন 'চকিত রৌদ্রে জেগে উঠেছে শালিধান', তেমনই 'ইতিহাস-ধুলো-বিষ' থেকে উৎসারিত হয়ে যায় 'নব নবতর' মানুষের প্রাণ।[৬৪] সমকালীন ইতিহাস যখন 'ব্যাপক অবসাদে' অসাড়, তখনও 'নরনারীর ভিড়' 'ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে' 'নতুন অমল পৃথিবীর আলো'।[৬৫] তাই, গভীর আস্থায় তিনি উচ্চারণ করেন :

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে—[৬৬]

সে চেতনার যথার্থ স্বরূপটিও জীবনানন্দ চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন অভিনিবিষ্ট পাঠককে। সে চেতনা নিরন্তর প্রয়াসের ও প্রয়াণের, নব উত্তরণের : 'অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয় সে সময়/দীপংকর

৬২। যতদিন পৃথিবীতে / বেলা অবেলা।
৬৩। পৃথিবী-সূর্যকে ঘিরে/বেলা অবেলা।
৬৪। পটভূমির অন্ধকার থেকে/বেলা অবেলা।
৬৫। প্রাচীন পটভূমির / বেলা অবেলা।
৬৬। মানুষের মৃত্যু হলে/শ্রেষ্ঠ কবিতা।

শ্রীজ্ঞানের,/চলেছে চলেছে।' এই অগ্রস্থৃতির চেতনাকে তিনি 'ইতিহাসের গোলকধাঁধা' বা 'অন্ধবলয়' থেকে উত্তীর্ণ করে নিয়েছেন অম্বিষ্টমুখী প্রয়াণে। এ কোন 'অলীক প্রয়াণ' নয় যা 'ইতিহাস অর্ধ-সত্যে কামাচ্ছন্ন কালের কিনারায়' এই ধারণায় মানবকে করে তোলে 'তিমির বিলাসী', যখন মনে হয় 'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর ; / যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল' ; / কিম্বা যখন সমস্ত 'পদচিহ্নময় পথ', মনে হয়, 'দিকচিহ্নহীন'। কোনও নিরর্থক বলয়িত গতি, কোনও নিরুদ্দেশ অগ্রস্থৃতি জীবনানন্দের ইতিহাস-বেদের মর্মে নেই ঃ

সকল রৌদ্রের মতো ব্যাপ্ত আশা যদি
গোলকধাঁধায় ঘুরে আবার প্রথম স্থানে ফিরে আসে
শ্রীজ্ঞান কী তবে চেয়েছিলো ?

অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সভ্যতার উত্তরণ-প্রয়াসী ধাবমানতার যথার্থ অনুধাবনই জীবনানন্দের মানসিকতাকে দীক্ষিত করে ঃ

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনায়
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।

এই প্রয়াণপ্রবণ অগ্রস্থৃতির বোধ এবং মানবভবিষ্যে আস্থাশীলতা কবির পরিণত ইতিহাসবেদের কুললক্ষণ। নাবিকীচেতনা ইতিহাসের অগ্রসরমান, প্রয়াণমুখী চরিত্রটি বিশেষিত, বস্তুরূপময় করতে সাহায্য করেছে অন্ধকার সমুদ্র, তিমিররাত্রির যাত্রী, ঢেউ, ঝঞ্ঝা, ব্যাত্যা-বিক্ষুব্ধ জলরাশি সৈকত, দিকচক্রবাল, দিকনির্ণয়ক কম্পাস প্রভৃতি চিত্রকল্পের সুপ্রযুক্ত ব্যবহারে। মানবের শাশ্বত শুভচেতনার স্পর্শে ইতিহাসের প্রস্থৃতির শক্তি একটি কাম্য অম্বিষ্টমুখী ঃ 'মানুষের মন/জানে জীবনের

মানে : সকলের ভালো করে জীবনযাপন'।[৬৭] মানুষ চেয়েছে 'এক সাহসী পৃথিবী / সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ'। তাই, 'মানব সমাজের শেষ- পরিণতি', জীবনানন্দের কাছে, 'গ্লানি নয় / হয়তো বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে শান্তি আছে মানুষের অগ্রসর আছে'।[৬৮] এই বিশ্বাসের দ্বিধাবিমুক্ত প্রতিভাস 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে ক্বচিৎ ও পরবর্তী অগ্রন্থবদ্ধ অজস্র কবিতায় অবিরল। এককথায়, অগ্রস্মৃতি ও শুভ-প্রয়াণের প্রজ্ঞায় চিহ্নিত এই ইতিহাসবেদের অনুধার্বন ছাড়া তাঁর পরিণত কাব্যসৃষ্টির যে কোনও আলোচনা অর্থহীন। আবার, এই চেতনার আলোকেই উজ্জীবিত সময়, প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মননের অন্তিম বিকাশ।

'সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতাদোষে দুষ্ট হলেও কবিতা ও সাহিত্য তার ভিতরে লালিত হয়েও যদি তাকে প্রয়োগ প্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যে কোনো না কোনো একরকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা না দিতে পারে তাহলে তা শ্লেষ বা ধ্বংস বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না'। এই স্বকৃত নিরীখের মানদণ্ডেই জীবনানন্দের শেষজীবনের কবিতা 'ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ ও সুরকে অন্তর্গ্রথিত করে' 'চেতনার গভীর অন্তর্যামী আলোয়' আবহমান মানব-অভিজ্ঞতাকে চিনে নিতে চেয়েছে। অন্যত্র আবার লিখেছেন 'বিশশতকে জন্মগ্রহণ করেছে ও কাজ করেছে বলে উনিশশতককে কৃপার পাত্র, বা কোনো অনেক আগের সুন্দর অতীতকে একমাত্র সাধ ও শ্রদ্ধার জিনিষ মনে করার তাগিদ অতিক্রম করে এসব কবিতা রামমোহন যখন ছিলেন বাঙলা দেশে বা বাঙলার পট যখন তৈরি হয়েছিল অথবা দীপংকর শ্রীজ্ঞান যখন আলোড়িত হয়ে ফিরছিলেন, আজকের দিল্লী, ক্রেমলিন ও ন্যুইয়র্কের পরিণতি,

৬৭। এইখানে সূর্যের / শ্রেষ্ঠ কবিতা। ৬৮। মহাত্মা গান্ধী / বেলা অবেলা।

কাল যারা জন্ম নেবে—সব মানুষেরই নাড়ীকম্পন অনুভব করেছে যেন, আজকের সূর্য জল ও নক্ষত্রদের দেখতে দেখতে অনেককালের প্রকৃতিকে, বিফলতা দুঃখ ও আশাকে ;······এসব কবিতায় বৃত্তান্ত, আজকের স্বভাবী বা নিদারুণ বৃত্তান্তও প্রধান নয়, যা হয়ে গেছে যা হতে পারে সবের ভিতরে খতিয়ে আজকের বিশেষ উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করে রাখবার চেষ্টাই আসল'।[৬৯]

একদিকে এইসব উক্তি-প্রত্যুক্তির নির্দেশ অন্যদিকে তাঁর নিজের কাব্যসৃষ্টির মধ্যে প্রত্যাশিত যে পরিপার্শ্ব-চেতনা উভয়ই জীবনানন্দের ইতিহাসবোধকে মণ্ডিত করেছে গভীর তাৎপর্যে। এক অব্যয় গতি ও আস্থাকরোজ্জ্বল ভবিষ্যতে-প্রয়াণের দুর্মর আশাবাদ জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনার চারিত্র্য নির্ধারণ করেছে। ইতিহাসের উত্থান-পতনের ঘনঘটা মানবকে দিয়েছে 'বহির্মুখ চেতনার দান'[৭০] যার আলোকে এখন 'আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়'। এই অন্তর্দীপ্ত আশাবাদিতার সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে কবিতার পর কবিতায়, সূর্যরশ্মিচ্ছটা লক্ষ্য করে উড্ডীন 'সৃষ্টির বন-হংসী' বা 'আকাশহংসীর' বা 'অমল মরালে' র চিত্রকল্পে। অজস্র উল্লেখের মধ্যে আমরা একটি দুটি মাত্র তুলে ধরতে পারি যা সার্থকতরভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে শেষপর্যায়ের কবিতাবলীর অন্তর্গ্রথিত ভাবনার। কবির নিজের মতে, 'মকরসংক্রান্তির রাতে' সেই রকমই একটি কবিতা,[৭১] যার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমরা অগ্রসর হবো।

'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই কবিতাটিতে জীবনানন্দ মানবমনের আবহমান ইতিহাসচেতনাকে একটি পাখির রূপকে অধিষ্ঠিত করেছেন—কবিতার উপশিরোনামটি লক্ষণীয়। প্রথম স্তবকে এই ইতিহাসচেতনারূপ পাখিকে কবি সম্বোধন করেছেন কিছুটা

৬৯। 'কবিতাপাঠ' / কবিতার কথা। ৭০। 'মহাত্মা গান্ধী' / বেলা অবেলা।
৭১। চিঠিপত্র নং ২, 'ময়ূখ' / জীবনানন্দস্মৃতি সংখ্যা।

বিস্মিত জিজ্ঞাসায়ঃ সে কোন্ পাখি সূর্য থেকে নবসূর্যে, যুগ থেকে যুগান্তরে বারবার পৃথিবীতে এনেছে আলোড়ন? সে আলোড়ন অবশ্যই সৃজনের—তারপর অন্তহীন কালের গভীরে সে আলোড়ন বিসর্জন দিয়ে নবনব বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে। 'কি এক গভীর সুসময়'—বারবার তারই সন্ধানে যেন মানবেরা অগ্রসর সৃষ্টি এবং আরও নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায়। মানুষের ইতিহাসচেতনাই মানবকে দিয়েছে অবিরাম যাত্রার নির্দেশ, এমন একটি বক্তব্যকে আভাসিত করে কবি বললেন:

মকরক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন:
—তবুও তা পৃথিবীর নয়;
এখন গভীররাত হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

এ পঙ্‌ক্তিগুলি আপাতদুর্বোধ্য। মকরসংক্রান্তির রাত পৃথিবীর নয়, গভীর রাত পৃথিবীর, এ' বক্তব্যকে কারও কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, সংক্রান্তি অর্থে সম্যকরূপে অতিক্রম; সূর্যাদির এক রাশি থেকে অন্যরাশিতে গমন প্রসঙ্গেই কথাটি ব্যবহৃত। 'মকরসংক্রান্তি' সূর্যের দক্ষিণায়ন বৃত্ত অতিক্রম করার দিন; সেই অর্থে পদবন্ধটি উত্তরণের দ্যোতক। এই উত্তরণ সূর্যনক্ষত্রাদির গতিপথে আজও স্পষ্ট; মকরক্রান্তির রাত'অন্তহীন তারায় নবীন'। তাই সূর্যপরিক্রমার পথে এই উত্তরণ যেন নবীন সব নক্ষত্রে শোভিত করে দেয় রাত্রির আকাশ। কিন্তু এই রাত, এই উত্তরণের রাত পৃথিবীর নয়। মানুষের পৃথিবীতে সব উত্তরণ আজ স্তব্ধ, জড়ীভূত। তাই পৃথিবীতে 'এখন গভীর রাত'—গভীর অন্ধকারের রাত, যে রাত নতুন তারার আলোয় নবীন নয়। মানুষের জীবনের উত্তরণ অভিভূত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কবিতার শেষ স্তবকেও উচ্চারিত। তিমিরাচ্ছন্নতার এই প্রাথমিক পটভূমি রচনার পর কবিতার দ্বিতীয় স্তবক আমাদের নিয়ে যায় সেই তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রির সঠিক চেহারাটি চিনিয়ে দিতে। যে অন্ধকারময়

নৈশপৃথিবীর আমরা অধিবাসী 'সেখানে এক গভীর অন্ধকারের রাত বিরাজমান, এক নক্ষত্রহীন নিরালোক। রাত্রি আনে বিশ্রাম ও নিদ্রা ; যে নিদ্রা সেকস্‌পীরিয় উচ্চারণে, আমরা জানি, মানবের এক পরম কাম্য। কিন্তু আজকের মানব 'ঘুমাবার মতন হৃদয় হারিয়ে ফেলেছে'। আধুনিক মানব এক নৈশতায়, তন্দ্রাহীনতায় পীড়িত ; তার রাত বিচিত্র অভিজ্ঞতার রাত যা উদ্বেগে কণ্টকিত। মানুষের জীবনে রাত এখন নিদ্রা নয়, উদ্বেগের কথা বলে। শত্রু কি শহর ঘিরেছে, নগরীর প্রতিরোধ কি চূর্ণ হোলো ; না কি আক্রান্ত নাগরিকেরাই বিজয়ী ? এই আক্রান্ত অবরুদ্ধ নগরীর চিত্রকল্প এনে মানুষের চেতনার বন্দীত্ব, তার আজকের নিদ্রাহীনতা ও জীবনসঙ্কটই কবি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তবু, ঐ সমস্ত আঘাতে মানবিক পৃথিবী যখন বিপর্যস্ত, তখনও মানবের ইতিহাসচেতনা সৌরমণ্ডলের নক্ষত্রের মতনই অমর হয়ে আছে :

> মানুষের মৃত্যু ক্ষয় প্রেম বিপ্লবের ঢের নদীর নগরে
> এই পাখি আর এই নক্ষত্রেরা ছিল মনে পড়ে,

এই ইতিহাসচেতনা কেবলই যাত্রা আর উত্তরণের কথা বলে। শেষ স্তবকে এই পাখি তথা ইতিহাসচেতনাকে সম্বোধন করে কবি এই বিপন্ন সভ্যতা নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করতে আহ্বান জানান। মানুষের আধুনিক কালের অভিজ্ঞতা দেখেছে যুদ্ধ আর অবক্ষয়ে দীর্ণ এই পৃথিবী কখনও 'ভঙ্গুর হয়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায়' ; আবার কখনও বা 'প্রতিভা হয়ে আকাশের মত শুভ্রতায়' যেতে চায়। এই দুই ভিন্ন, বিপরীতমুখী, 'বিষমানুপাতিক' টানে মানুষের জীবনের উত্তরণ যেন 'অভিভূত হয়ে মাঝপথে থেমে' গেছে 'মহান তৃতীয় অঙ্কে'। 'তৃতীয় অঙ্ক' নাটকের সংকটকালকে চিহ্নিত করে। মানুষের সভ্যতার সমাধি এই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সংকট সংশয়ের মধ্যেই রচিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। তবুও এই 'তৃতীয় অঙ্কই' 'মহান'—তা 'আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়' এক অগ্নিপরীক্ষার অঙ্ক, যে অগ্নিপরিধির মধ্য হতে নাটক উত্তরিত হয় তার চূড়ান্ত বক্তব্যের সার্থকতায়। কিন্তু, প্রাণশক্তি

যে অভিভূত ; তাই উত্তরণও স্তব্ধ। একমাত্র ইতিহাসচেতনাই পারে বেগের আবেগ সঞ্চারিত করে দিতে মানবসভ্যতার এই সঙ্কটগভীর তৃতীয় অঙ্কে। তাই, কবি ইতিহাসচেতনারূপ পাখিকে আহ্বান জানান ; সে চেতনা অগ্রসরমানতার দ্যোতক এবং সেকারণেই সঞ্জীবনী :

'সূর্যে আরো নবসূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণদাও, প্রাণদাও পাখি।'

শেষপর্যায়ের কাব্যের প্রতিবস্তুরূপে 'নাবিক' ও 'পাখির' চিত্রকল্প দুটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে সভ্যতার অন্তর্লীন অন্বেষা ও প্রয়াণের আহবান পরিস্ফুটনের প্রয়োজনে একথা আমরা পূর্বেই জানিয়েছি। পাখির অনুষঙ্গে এসেছে ভোরের কাকলি, 'পুনরুদয়ের ভোর' বা সূর্যোদয়ের ছবি যা' বিকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর কাব্যে। এভাবেই ইতিহাসবোধে দীপ্ত এক নবীন প্রত্যূষের আস্থাবাণী বারবার ঘোষিত হয়েছে তাঁর অন্তিমপর্যায়ের রচনায়।[৭২] যে প্রবল আস্তিক্যবোধ শেষপর্যন্ত তাঁর পরিণত রচনাগুলিকে উত্তীর্ণ করেছে সকল তিমিরাচ্ছন্নতার ঊর্ধ্বে তিমিরবিদারী সৌরকরোজ্জ্বলতায় তা' কবির গভীর ইতিহাসচেতনা থেকেই উৎসারিত। এই এক আস্থাপ্রোজ্জ্বল গতিরাগের গানই জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনাকে অর্থবহ করে দেয়। তেমনই দুটি উল্লেখে আমরা এ আলোচনার ছেদ টানতে পারি :

ক   নবনব মৃত্যু শব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে
                    মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে, তবু প্রতিটি ব্যক্তির
                    ষাট বসন্তের তরে
সেইসব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে'
                    এই বোধের ভিতরে

৭২। সে ধরনের কিছু কবিতার নাম : 'ইতিহাসযান', 'পৃথিবীসূর্যকে ঘিরে', 'মহাত্মা গান্ধী', 'সময়ের কাছে', 'রাত্রির কোরাস', 'একটি কবিতা'।

চলেছে নক্ষত্ররাত্রি সিন্ধুরীতি মানুষের বিষয় হৃদয়
জয় অস্তসূর্য জয়, অলখ্ অরুণোদয় জয়।

['সময়ের কাছে' / সাতটি তারার তিমির]

খ ইতিহাস সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানবজীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায় চলা যায় সময়ের পথে
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয়, জানি ; তবু জ্ঞানের বিষণ্ণলোকী
আলো
অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সকল মানব প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে।
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।

['অন্ধকার থেকে' / বেলা অবেলা]

তাই, জীবনানন্দ শেষপর্যন্ত বলতে পারেন :
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শতশত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।[৭৩]

৭৩। হে হৃদয় / বেলা অবেলা।

চতুর্থ অধ্যায়

সময়

জীবনানন্দের কবিতার আদিপর্যায়ে সময়চেতনার পরিস্ফুটন কোনো সচেতন মনন বা মনীষার আলোকে পরিশীলিত হয়ে ওঠেনি। অথচ তাঁর নিজেরই কথায় 'মহাবিশ্বলোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময়চেতনা' তাঁর কাব্যে 'সঙ্গতিসাধক অপরিহার্যের' মত কাজ করেছে। কবিতা রচনার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ সত্য তাঁর কাছে ধরা পড়েছে এবং তাঁর নিজের কাছে 'এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই'। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে 'সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে'[১]। এই মূল্যবান স্বীকারোক্তির কথা মনে রেখে তাঁর কাব্যসৃষ্টির গোটা পরিধির দিকে তাকালে দেখা যাবে কালস্রোতের অপরিজ্ঞাত উৎস, অপরিমেয়তা ও প্রবহমানতার ধারণা নিরন্তর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর রচনায়, সেই 'ঝরাপালক'-যুগ থেকেই। তবে এ কথাও মানতে হয় সময় সম্পর্কিত ধারণা উপমা-রূপক-চিত্রীকরণের আবয়বিক প্রয়োজন অতিক্রম করে প্রথমদিকে সুবলয়িত হয়ে ওঠেনি কোনও নির্দিষ্ট ধারণায়। কাব্যরচনার মধ্য-পর্যায়, অর্থাৎ 'ঝরাপালক-ধূসর পাণ্ডুলিপি-রূপসীবাংলা' পেরিয়ে এসে পাঠক প্রথম অনুভব করেন জীবনানন্দের মননে কালচেতনা একটি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছে এবং কাব্যশরীরে এই নবজায়মান চেতনা সঞ্চারিত করছে অর্থ-গভীরতা। তাই তখনই অনায়াসেই তিনি বলতে পেরেছেন, 'সময়-প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থালাভ করতে চেষ্টা করেছি'।

১। 'ময়ূখ' / জীবনানন্দ সংখ্যা, চিঠিপত্র ২।

'সময় ও পৃথিবী অভিজ্ঞতার আধার। কবিও সঞ্চয়ী।'[২] একথা বলে জীবনানন্দের মননশীল চেতনা কাব্যের সৃষ্টি-সার্থকতা খুঁজেছে মানব-অভিজ্ঞতার দুই উৎসমুখে—সময় তথা আবহমান-কাল ও তৎসঞ্জাত ইতিহাসবেদে, এবং পৃথিবী অর্থাৎ আপেক্ষিককাল, এই বর্তমান, দেশকালসন্ততির সীমারেখায় বাঁধা সমাজ-জীবনে। উদ্ধৃতি-নির্ভর না হয়েই একটি কথা পাঠককে স্মরণ করতে বলি। জীবনানন্দ যখনই কোনো নিবন্ধে সময়প্রসঙ্গে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তখনই ইতিহাস ও সমাজকে সে আলোচনায় নিয়ে এসেছেন গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিতে। এভাবেই উচ্চারিত হয়েছে 'কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা', 'ইতিহাসবেদের দরকার—এবং সমাজবেদের', বা এ জাতীয় অন্যান্য সদুক্তিগুলি, এবং এইসব বেদের সংশ্লেষেই পরিশোধিত হয়ে উঠেছে তাঁর নিজের 'কালজ্ঞান'। 'অঙ্কহারা কাল' ও 'গণনাকাল' জীবনানন্দের স্বকৃত পারিভাষিক উদ্ভাবন এই শব্দ দুটিও কবিতার মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে নির্দেশিত করছে মানবচেতনার দুই উৎস : একদিকে 'সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষ,' 'অপারসময়' ;[৩] অন্যদিকে 'কতশত যুগজন্মবাহী ইতিবৃত্তকাল'।[৪] এই অনন্ত ও অব্যবহিতের বিষমানুপাতিক টানে দীর্ণ যে চিরন্তন মানবচেতনা তা কিন্তু 'বিভিন্ন কালসন্ধির নতুন নতুন নির্ণীত সত্যের স্পর্শে কিছু পরিবর্তিত বেশি আলোকিত হয়ে' 'সময়ের সেতু পার হতে চায় শতাব্দী ও জীবনের প্রয়োজনে স্থিরতর আধুনিকের অপরিহার্য স্পষ্টতর সব সম্বন্ধ-শৃংখলের পথে।' ইতিহাসকে জীবনানন্দ সময়ভাবনা বা পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান থেকে পৃথক করে দেখেছেন—এই দেখার পেছনে তাঁর মনে কি ধরনের যুক্তিচিন্তা কাজ করেছে তার হদিশ তাঁর গদ্যরচনায় তেমন নেই। তবে 'মহাবিশ্বলোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময়চেতনা' বলতে যে

২। মাত্রাচেতনা / কবিতার কথা। ৩। অংকবিহীন যুগ, পিরামিড / ঝরাপালক।
৪। আলেয়া / ঝরাপালক।

কবি আনন্ত্য বা অসীমকালকে বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট। অন্যদিকে ইতিহাসবেদ বলতে যে মানবসভ্যতার ধারা-ধারণাই তাঁর উদ্দিষ্ট, সে কথা নানা আলোচনায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সে কথা মনে রেখে যদি আমরা অতীতের অবদান ও ঐতিহ্যকে জীবনানন্দের কাছে ইতিহাস-বেদের মুখ্যতম উপাদান বলে জেনে থাকি, তবে এও ঠিক যে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক সংঘাত ও গতির কাব্যাত্মক প্রয়োগে তাঁর সৃষ্টিতে ইতিহাসের মর্মকথা হয়ে উঠেছে অগ্রগতি ও ভবিষ্য-প্রয়াণ। অতএব যা অবশিষ্ট থাকে, তা এই বর্তমান, খণ্ডকালের সীমানায় বাঁধা মানুষের দেশকাল-সাপেক্ষ অভিজ্ঞতা· যা তাঁর রচনায় 'সময়' নামে অভিব্যক্ত। 'কি হিসেবে শাশ্বত' নিবন্ধটিতে অভিব্যক্ত এই মনোভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় কিভাবে পরিণত জীবনানন্দীয় মননে সময়ভাবনা ইতিহাস-বোধ ও সমাজ-চেতনায় সংহত হয়েছে। একদিকে অতীত ও ইতিবৃত্তের শিক্ষা অন্যদিকে অধুনার গ্লানি ও যন্ত্রণার সংবেদী বীক্ষার মধ্য দিয়েই কবি জেনেছেন মানুষের মৃত্যুহীন অন্বেষা ও অগ্রসরণের সত্যগুলি। এভাবেই, সময়চেতনার গর্ভ হতেই উদ্বর্তিত হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের ইতিহাসবোধ; এভাবেই মহাভারতের মহাপ্রস্থানের কাহিনী প্রতীকের আবরণ ভেঙে ফেলে তাঁর কাছে উদ্ভাসিত করেছে, 'সুসীম আস্তিক্যে'র এমন এক 'প্রশান্তিপর্ব' যা মানবসভ্যতার চিরন্তন অন্বিষ্ট। শেষপর্যায়ের কবিতাবলীতে যে গভীর আস্তিক্যের সুর ধ্বনিত তা মানবভবিষ্যে কবির আস্থাশীলতাই ঘোষণা করছে। আবহমান কাল ও মানুষের ইতিহাসের সত্যে পৌঁছানোর পরই মানব-ভবিষ্যে আস্থাশীলতার শুভবোধে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে। কবিমানসে এই উত্তরণটি সুসংহত করছে সময়চেতনা; যেমন জীবনানন্দ নিজেই লিখেছেন, সময়ভাবনা 'তাঁর কাব্যে' 'সঙ্গতিসাধক অপরিহার্যের মত' কাজ করেছে।

'সময়' নিয়ে জীবনানন্দের পরিণত মন কিছু কিছু ভাবনা-অনুভাবনায় মগ্ন হয়েছিল ঠিকই, তবে সে সব কিছুই যে কোনও

যথার্থ সুগ্রথিত দার্শনিক চিন্তায় আশ্রিত হয়েছিল একথা বলা যায়না। জীবনানন্দ কবি, দার্শনিক বা চিন্তাবিদ ছিলেন না; তিনি এমন একজন কবি যিনি অন্তঃপ্রেরণার উৎসারণে এই বৈজ্ঞানিক যুগেও আস্থাবান। সেই কল্পনাপ্রতিভাজ অন্তপ্রেরণার বলে তিনি নিট্‌শের জরাথ্রুষ্টেরই মত জেনেছিলেন যে মুহূর্ততোরণের নিচে দণ্ডায়মান এই দেশকালবদ্ধ মানব—তার দুদিকে প্রসারিত দুই অনন্তব্যাপ্ত অন্ধকার পথ, যে পথ সে পিছনে ফেলে এসেছে এবং যা তার সামনে প্রসারিত। 'যা হয়েছে ঃ হতেছে ;—সেই পৃথিবীকে অন্ধকারে পিছন দিকে ফেলে / মানববিমূঢ়তাকে লাল দেশলাইয়েতে জ্বেলে/ এসেছে সে আরেক ভোরের পটভূমির দিকে।'[৫] নিট্‌শে হয়তো বুঝেছিলেন এই দুই পথ কখনও মেলেনা ; কিন্তু কল্পনা-সংক্ষুব্ধ মননশীলতায় কবি জীবনানন্দ চেয়েছিলেন এই দুই অপার দুর্জ্ঞেয় তমসাকে ইতিহাসবোধির আলোকে একটি 'সুবলয়িত' 'শঙ্খরেখা'য় মিলিয়ে দেখতে ; 'এ বেদ ছেড়ে ভালো জীবনবেদে—অন্যআলোর স্পন্দনে/চলে যাবার অপার সেতু আছে মানবমনে'। অতীত, অধুনা ও আগামীকাল এভাবেই গ্রথিত হয়েছে তাঁর কাব্যে একটি আস্থাকরোজ্জ্বল চেতনাভূমিতে।

তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রথমযুগে এই কালজ্ঞান ইতিহাসবোধদীপ্ত আস্তিক্যে অনুপস্থিত। সময়ের সংহারকরূপটিই তখনকার কাব্যে প্রবলতররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরবর্তী কালের কাব্যে দেখি কালের এই বৈনাশিকসত্তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েও জীবনানন্দ অনুভব করেছেন তাঁর সংহারক ভূমিকার একটি ইতিবাচক তাৎপর্য। যা লুপ্তি ও বিনাশের যোগ্য সময় তাকে হরণ করে নেয়, এবং সেভাবেই উদবর্তিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে যা শাশ্বত, চিরন্তন, অনশ্বর। বৈনাশিককাল 'সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে কেটে চলেছে যা 'পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি' বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো'।

৫। কুজ্‌ঝটিকার আকাশ / ক্রান্তি, কার্তিক

জীবনানন্দের পরিণত কবিচেতনার অনেক অস্ফুট মনোবীজ 'ঝরাপালকে'র প্রভাবিত ভূখণ্ডেই সর্বপ্রথম উপ্ত হয়েছিল। তাঁর কাব্যসৃষ্টির অন্যান্য দিকগুলি আলোচনার সময় এ বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি। সময়ভাবনার ক্ষেত্রেও এই স্বভাবের কোনও ব্যতিক্রম নেই। কালের অপরিমেয়তায় বোধ ও একটি অমেয় প্রবাহের রূপকল্পে সেটিকে কাব্যভাষা দেবার প্রয়াস প্রথমাবধিই তাঁর কাব্যে দেখা যায়। পরিণত রচনায় ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হয়ে এই বোধ প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। প্রবহমান মানবেতিহাসের মধ্য দিয়ে ভ্রাম্যমান মানবতার যাত্রিকসত্তার ধারণাটি কিছুটা দুর্বল ও অসংলগ্নভাবে হলেও আত্মপ্রকাশ করেছে, 'ঝরাপালকে'র অনেকগুলি কবিতায়।

'অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার,—পায়নাকো পথের সন্ধান,'

চিরন্তন মানব-অন্বেষার এ' জাতীয় ভাবগৌরবে মণ্ডিত হয়েই 'নাবিক', 'জলবেদিয়া', 'মরুপ্রান্তরের বন্ধনহারা যাত্রী', 'রাত্রির নির্জনযাত্রী' বা যুগযুগান্তের অভিসারিক-প্রেমিকের চিত্রকল্পগুলির পৌনঃপুনিক আগমন ভারাক্রান্ত করেছে 'ঝরাপালকে'র শিথিল অশৈল্পিক কাব্য-প্রয়াস। সময়চেতনার যে 'মেধাবী সমাহিতি' ইতিহাসবোধে পরিশীলিত,[৬] তা একালের কাব্যে অনুপস্থিত হলেও কবিমানসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত-সন্ধানের প্রবণতাটি লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

স্মরণীয়, 'ঝরাপালক' থেকে মাত্র তিনটি কবিতা সংযুক্ত হয়েছিল 'শ্রেষ্ঠকবিতা'য়—সে গ্রন্থটি আমরা জানি জীবনানন্দের 'প্রখর অভিভাবকতা'য় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেখানে কবিতার নির্বাচনে কবি 'বিশেষ শুদ্ধতার' পরিচয় পেয়েছিলেন। সেই তিনটি কবিতা—

৬। 'আজকাল সব সময়েই একটা একই রঙ রয়েছে নানা রঙের ভিতর বিম্বিত হয়ে—সব সময়কে একই সময়গ্রন্থির ভিতর নিবিষ্ট করে রেখে।' : 'রুচি. বিচার ও অন্যান্য কথা'/ কবিতার কথা।

'পিরামিড' 'নীলিমা' ও 'সেদিন এ ধরণীর'—জীবনানন্দের আদি মনন-ভূমির তিনটি স্মরণযোগ্য দিক তুলে ধরছে। 'পিরামিড' কবির ইতিহাস-চেতনার অনতিস্ফুট মনোবীজ ধারণ করছে, সে আমরা লক্ষ্য করেছি। অন্যদিকে, যে রোমান্টিক কল্পনাপ্রতিভা স্বসৃষ্ট কবিজগতের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নেয় বলে জীবনানন্দ জানিয়েছেন, 'ঝরাপালক' যুগে কবির কাছে 'নীলিমা' সেই দিব্যস্বপ্নলোকের[৭] প্রতীক, 'দূরঅতন্দ্র স্বপ্নলোক যা 'বাস্তবের রক্ততট' থেকে মানবকে ডেকে নেয় 'স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে', / 'শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে শুক্লাকাশে, নক্ষত্রের রাতে'। তেমনই, 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতাটিতে কবিমানসের আর একটি দৃষ্টিকোণ ধরা পড়েছে : দেশকালবদ্ধ মানবের সঙ্গে অনন্ত বা অসীমের একটি চকিত সাক্ষাৎ ও জৈব চেতনার মৃন্ময় জঠরে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের ভাববস্তু এই কবিতাটিকে জীবনানন্দের সময়চেতনার একটি উৎস-মুখের সঙ্গে যুক্ত করেছে যা কবির স্বকৃত পরিভাষায় কখনও 'অপার-সময়', কখনও 'অনন্তকাল', কখনও বা 'মহাকাল' বলে উল্লিখিত হয়েছে বিভিন্ন রচনায়। কবিকল্পনার এক আকস্মিক উদ্দীপনে 'সেদিন এ ধরণীর', নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে কবিসত্তা ছুটে গেছে, 'অনন্তের শুক্ল অন্তঃপুরে / অসীমের আঁচলের তলে'। ঐহিক বন্ধনসূত্রগুলি তখনই যথার্থ কালপ্রেক্ষিত পেয়ে কবির ছিন্নবাধ চেতনায় হেনেছে আঘাত :

> কত পূর্ব জাতকের পিতামহ পিতা
> সর্বনাশ—ব্যসন-বাসনা,
> কত মৃত গোক্ষুরার ফণা,
> কততিথি—কত যে অতিথি
> কতশত যোনিচক্রস্মৃতি···

হয়তো তাই অনন্তের এই অবগাহন 'নিঃসহায় মানুষের শিশুকে' পরিতৃপ্তি দেয়নি ; কারণ, অসীমকালের শূন্যতার পটেই সে জেনেছে

৭। 'কবিতা প্রসঙ্গে' / কবিতার কথা।

নতুন করে যে পৃথিবীতে আছে 'নবনব ঋতুরাগ', আছে মৃত্তিকার মাতৃ-আহ্বান, আছে 'মশলাদরাজ এই মাটিটার ঝাঁঝ'। তখন নীলিমার দিব্যলোক অপসৃত হয়ে যায় এবং সদ্যপ্রসূতির মত বসুন্ধরার অন্ধকার কবির চেতনাকে গ্রাস করে।

আমরা যেমন জানি, 'ঝরাপালক'-এর দুর্বল রচনাগুলির পঠন-পাঠনে কোনও নান্দনিক তৃপ্তি নেই, ঠিক তেমনই কিছু কবিতার স্ফুট-অস্ফুট ভাষণে, অন্যত্র চিত্রীকরণের বিক্ষিপ্ত উপাদানে সময় বা 'ইতিহাসের ধারা-ধারণা'র কিছু উদ্ভাস দেখা দিলেও কোনও প্রজ্ঞালোকিত 'কালজ্ঞান' বা ইতিহাসবোধের অন্তঃপ্রবেশ সেখানে নেই। আসলে, সময়চেতনার কোনও পরিণত উদ্ভাস, যা কবির ভাষায়, পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াতে সাহায্য করে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগেও তাঁর কাব্যে সুলভ নয়। কালের বৈনাশিক রূপটিই সে সব কবিতায় প্রধান ; পরিণামে এসেছে বিপন্ন সৌন্দর্যবোধ ও বিষণ্ণ অতীতচারিতা বা নষ্ট লুপ্ত সৌন্দর্যের ব্যর্থ সন্ধানের দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভার।

'ধূসর পাণ্ডুলিপির' মুগ্ধ নিসর্গ-আবিষ্টতার মধ্যে 'সময়' আবির্ভূত সংহারকের ভূমিকায়। যা প্রিয় ও সুন্দর সময়ের হাতে তার অনিবার্য বিনাশের বেদনা কবিচিত্তকে বেদনাহত করেছে। এই বিষাদ ও বিলয়ের পটে জীবনানন্দ উপলব্ধি করেছেন বাস্তব ও স্বপ্ন, পার্থিব ও দিব্য অস্তিত্বের ব্যবধান। তবু সৃষ্টির চিরন্তন ও বিচিত্র উদ্ভাসের সত্য ও সৌন্দর্য বাণীরূপ পেয়েছে তাঁর এ সময়কার রচনায়। মৃত্যুর যে গাঢ়চ্ছায়া 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নৈসর্গিক ভুবনে পড়েছে তারই পাশাপাশি রয়েছে প্রেম ও সৃষ্টির নশ্বর তবু অবিনাশী কালজয়ী মহিমা। 'জীবন' কবিতাটির প্রথম স্তবকেই ধ্বনিত হয়েছে সময়-ভাবনাঋদ্ধ এক জীবন-বেদ :

> সে কোন প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
> অঙ্কুরের মত আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে।

আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ,
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে।

ব্যক্তি ও উত্তরব্যক্তি সত্তার মিলন জীবনানন্দের কাছে সৎ কবিতার আদর্শ নিরীখ বলে মনে হয়েছিল ; তারই একটি অনতিপরিণত প্রকাশ ঘটেছে উদ্ধৃত চরণগুলিতে। যে সিন্ধুর ফেনার গন্ধ মেখে কবির চিত্ত জেগে উঠেছে 'নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের রাতে', সে সিন্ধু যে 'কালসমুদ্র' তার আভাস এই কবিতারই অজস্র চিত্রকল্পে ও বর্ণনায়, 'সময় সিন্ধুর মত' উচ্চারণে, পরিস্ফুট। আবার :

ক : রাত্রিদিন আমাদের মন
বর্তমান অতীতের গুহা ধরে একাএকা ফিরিছে এমন।
খ : জীবন ডাকিতে আসে—হয় নাই—গিয়েছে যা হয়ে—
মৃত্যুরেও ডাক তুমি সেই স্মৃতি আকাঙ্খার অস্থিরতা লয়ে।
গ : তুমি রয়ে যাবে,—তবু—অপেক্ষায় রয় না সময় কোনদিন
ঘ : এই বর্তমান,—তার দুপায়ের দাগে
মুছে যায় পৃথিবীর পর
একদিন হয়েছে যা—তার রেখা—ধূলার অক্ষর।

এ জাতীয় বিক্ষিপ্ত উল্লেখগুলি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কালপ্রবাহের অপ্রতিরোধ্য গতি যা সকল প্রিয় বা কাম্য গ্রাস করে, সে সম্পর্কে কবিচেতনা একালেও স্পর্শকাতর ছিল। প্রেম যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবির কাছে 'সৃষ্টির অন্তরতম শক্তি' বলে মনে হয়েছিল, তাকেও তিনি দেখেছেন এই বৈনাশিক কালের পটভূমিতে রেখে :

তবুও সিন্ধুর জল সিন্ধুর ঢেউয়ের মত বয়ে
তুমি চলে যাও প্রেম, একবার বর্তমান হয়ে,
তারপর, আমাদের ফেলে যাও পিছনে—অতীতে—
স্মৃতির হাড়ের মাঠে,—কার্তিকের শীতে।

লক্ষ্য না করে উপায় নেই 'কয়েকটি লাইন' কবিতাটির 'সময় সিন্ধুর' উপমাটি এখানেও প্রযুক্ত। এভাবেই এক বিশাল অকূল

অন্ধকার সমুদ্রের ব্যাপ্ত জলরাশি প্রবাহের রূপকে জীবনানন্দ তাঁর আদিপর্বের কাব্যে কালের আবহমানতা ও চিরধাবমানতা ব্যঞ্জিত করেছেন। এই ব্যাপ্ত, বৈনাশিক কালপ্রেক্ষাপটেই স্থাপিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগের অপরূপ নিসর্গজগৎ। ঋতুর দিক থেকে হেমন্ত, লগ্ন হিসাবে সন্ধ্যা বা রাত্রি আর এক কুয়াশামলিন আবহ বেছে নিয়ে জীবনানন্দ নিসর্গের সময়াহত মাধুরিমা স্পষ্ট করতে চেয়েছেন : 'বিয়োগের মরণের মুখে এসে পড়ে সব'। এই নৈসর্গিক মাধুর্যের কেন্দ্রে বসে আছে যে নায়ক সে তার আবিষ্ট সংবেদনায় নিঃসঙ্গ, বেদনাহত আপন প্রেমের ক্ষণজীবি উল্লাসে, নিসর্গমাধুরীর আসন্ন বিনাশমুখিতায়।

সময় এখানে বৈনাশিক হলেও সময়ের যে সংহারসত্তা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়ায় তা কিন্তু এ পর্যায়ের কাব্যে অনুপস্থিত। কালবিজয়ী সৌন্দর্যের চেতনা তবু কখনও কখনও জীবনানন্দের কবিমন স্পর্শ করেছিল। সে রকম একটি উজ্জ্বল উদাহরণ অনুল্লেখিত রাখা যায় না : 'সময় মুছিয়া ফেলে সব/সময়ের হাত/সৌন্দর্যেরে করে না আঘাত / মানুষের মনে যে সৌন্দর্য জন্ম লয় / —শুকনো পাতার মত ঝরেনাক বনে'।[৮]

আর, ঠিক এই কারণেই জীবনানন্দ বাস্তব থেকে সরে এসে মনোজগতে 'স্বপ্নের হাতে' আত্মসমর্পণ করলেন।

পৃথিবীর দেয়ালের পরে আঁকাবাঁকা অক্ষরে মানুষের ব্যর্থতার, রূপের নশ্বরতার যে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কবি রচনা করেন, সে সবই নিরর্থক হয়ে যায়, কারণ 'সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব'। আর সব,—'কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ/চিরদিনরয়'। লক্ষ্য না করে উপায় নেই, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শেষতম কবিতাটিতে স্বপ্নের যে জয়গান কবিকে আশ্বস্ত করেছে বৈনাশিক কালের আগ্রাসী সংহারের সম্মুখে,

৮। ময়ূখ / জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যায় মরণোত্তর প্রকাশনা।

'রূপসীবাংলা'র সার্বিকবোধে একশরীরী[১] চতুর্দশপদীগুচ্ছের প্রারম্ভেই রয়েছে সেই একই স্বপ্নপ্রশস্তি : 'সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে'। স্রষ্টার প্রখর অভিভাবকতা পেলে এ কাব্যগ্রন্থের কী ধরনের রূপান্তর ঘটতো তা অনুমানসাধ্য নয়। তবে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মানসপরিমণ্ডলে লালিত 'রূপসীবাংলা'র সনেটগুচ্ছে নিসর্গের রূপ ও রূপাবিষ্টতার একইরকম চিত্র। শুধু সে রূপ এখানে আরও আঞ্চলিক, আরও অতীতচারী, আরও প্রবলভাবে রোমান্টিক, স্মৃতিভারাতুরতায় আচ্ছন্ন। সেই নিসর্গবলয়িত লোককাহিনীর ইতিবৃত্তস্পর্শী জগতে সৌন্দর্য ও গরিমার এক স্বপ্নরূপ খুঁজে বেড়িয়েছেন আমাদের কবি। তাঁর এই স্বপ্নপ্রয়াণ—আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা ভালবাসার ব্যর্থতা নিয়ে যে আপেক্ষিক কাল বা বর্তমান তা' থেকে মুক্তির আকুতিজনিত : 'সময়ের হাত থেকে ছুটি পেয়ে স্বপনের গোধূলিতে নামি'। এভাবে, জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে কালের বৈনাশিক রূপটিই বড়, কখনও স্পষ্ট উচ্চারণে কখনও পরোক্ষ আভাসে ; অতীত গরিমার উদ্বোধনে কি স্বপ্নজগতে প্রয়াণের মধ্য দিয়ে কবি-সত্তার উপর আপেক্ষিক কালের প্রহারের তীব্রতাটুকু অনুভব করা যায়। কিন্তু শুধু সেইটুকুই মাত্র, আর কোনও বড়ো চেতনার দীপ্তি কবির সময়-ভাবনাকে উজ্জ্বলতর চেহারায় উপস্থিত করেনি তখনও।

কাব্যসৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে 'বনলতা সেন' যুগে মননশীলতা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতার স্পর্শে জীবনানন্দের কবিতা অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এসময়ে তাঁর কাব্যে কালের বৈনাশিক রূপটির পাশাপাশি অন্যতর চেতনার দীপ্তি ভাস্বরতর। অন্বেষাক্লান্ত যাত্রিকের চিত্রকল্পটি বর্জিত হয়নি, বরং নবমূল্যায়িত হয়েছে। সময়ের প্রবহমানতার বোধের সঙ্গে ইতিহাসচেতনার ভাবসম্মিলনে তার উজ্জ্বলতম প্রকাশ 'বনলতা

৯। 'রূপসীবাংলা' গ্রন্থের অশোকানন্দ দাশ সংযোজিত ভূমিকায় উদ্ধৃত কবিবচন।

সেন' কাবতার প্রথম স্তবকে। সময়চেতনার যথার্থ উদ্ভাস ঘটে ইতিহাসবোধে। সেদিক থেকে 'বনলতা সেন' গ্রন্থের 'হাওয়ার রাত', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'পথহাঁটা' এবং নাম-কবিতাটি স্বয়ং অল্লাধিক শিল্প-সাফল্যে ব্যক্তি ও উত্তরব্যক্তিসত্তার মেল বন্ধন ঘটিয়েছে। আবহমান-কালব্যাপী মানবসভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসে মানবাত্মার যে সম্মুখযাত্রা রেখাংকিত তার সঙ্গে কবিসত্তা যুক্ত হতে পেরেছে ইতিহাস-চেতনার আলোয়, যা আবার জীবনানন্দের কাছে 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। অন্যদিক থেকে দেখলে, সাময়িক ও সময়াতীতের যে সমন্বিত দৃষ্টিকোণ সার্থক ইতিহাসবোধের জাগরণ ঘটায় 'বনলতা সেন' কবিতাটির অনন্যপর শিল্পরূপায়ণ তা প্রচ্ছন্ন রেখেছে। একদিকে 'বনলতা সেন' যিনি প্রিয় ও প্রার্থিত, কিন্তু দেশকালের গণ্ডীবদ্ধ, যিনি বিশিষ্টভাবে নাটোরের; অপরদিকে যুগযুগান্তব্যাপ্ত মানব-অন্বেষার ঐতিহাসিক কালপ্রেক্ষিত—হাজার বছরের পথহাঁটা, ইতিবৃত্তের ধূসরজগত, নিশীথ সমুদ্র এবং দিশাভ্রান্ত নাবিক। অতীত ও অধুনা, এই দ্বিমাত্রিক আয়তনের সন্ধিচিহ্নহীন সমন্বয়ে কবিতাটি যথার্থই ঐতিহ্যাশ্রয়ী, ঠিক যে অর্থে এলিয়ট লিখেছেন :

"........the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existense and composes a simultaneous order."

পরবর্তীকালে রচিত 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় সময়ের বৈনাশিকরূপ আবার প্রবল; তখন দ্বারকা কি এশিরিয়ার মৃত-সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের পটভূমিতে 'বনলতা সেন' পুনরাবিষ্কৃত হন—সে কি সময়ের ওপরে যা প্রেয় তার জয় ঘোষণার জন্য ?

সময়ের বিলয়ধর্মিতার দিকটি 'দুজন' বা 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতার

নিসর্গভুবন অনেকটাই ফিরিয়ে নিয়েছে সেই 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি'র, হলুদপাতা-হেমন্ত-শিশির-কুয়াশাময় ধূসর-প্রান্তরে যেখানে 'চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে' সমস্ত কিছুই 'ঝরিছে মরিছে'—'বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের বলে'; শুধু মৃত্যু-আহত নিসর্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রেমিক অনুভব করেছে ভালবাসার অনশ্বরতা। বৈনাশিক কালের হাতে প্রিয় নারীরও পরিত্রাণ নেই; তবু তাঁকে বলতে শুনি:

> সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশাচেতনার কণা
> ধরে আছে বলে সেও সনাতন, কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
> সরিয়ে মেয়েটি তাঁর আঁচলের চোর কাঁটা বেছে
> প্রান্তর নক্ষত্রনদী আকাশের থেকে সরে গেছে
> যেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে—তাই-ই ঠিক··· [১০]

লক্ষ্য না করে উপায় নেই, অপার, অংকবিহীন, গণনাতীত সময় প্রেম, আশা বা মানবচেতনার অন্যতর উদ্ভাসনে মুহূর্তবদ্ধ বা যুগবদ্ধ জীবন-অস্তিত্বকে কালোত্তীর্ণ বা সনাতন করে তোলে এমন একটি বিশ্বাস কবি ব্যক্ত করেও পেছিয়ে এসেছেন ভালবাসার তাৎক্ষণিক হতাশার অভিঘাত নিয়ে। কিন্তু 'বনলতা সেন' পর্যায়ে সময়চেতনার যে চারিত্র্য পরিস্ফুটতর তা এই বিনাশপ্রবণ পলাতক অথবা চিরধাবমান কালের চিত্রকল্পেই সীমাবদ্ধ নয়। এক অনন্ত প্রবহমান কালস্রোতের উদ্‌বর্তন থেকে মানবপথিকের নবসভ্যতায় উৎক্রান্তির প্রসঙ্গটি ক্রমশই উজ্জ্বলতর তাৎপর্যে কাব্যরূপায়িত হয়েছে। সে আলোচনায় পৌঁছাবার আগে 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের বর্তমান পরিসরে বিধৃত কবিতাবলীর দিকে চোখ ফেরানো প্রয়োজন। কারণ, এ সব কবিতায় জীবনানন্দের সময়ভাবনা বিমূর্তায়ন পরিত্যাগ করে ক্রমশই স্বচ্ছলভাবে যুগপ্রতিবেশচিহ্নিত হয়ে উঠেছে

১০। সময় / মহাপৃথিবী।

যার পাশাপাশি প্রয়াণ ও উত্তরণের চিরন্তন মানব-আকাঙ্ক্ষার জীবনানন্দীয় কাব্যউচ্চারণ তার মৌন আস্তিক্যে উন্মোচিত।

'মহাপৃথিবী' গ্রন্থটির নামকরণেই রয়েছে কবির চেতনালোকের পরিধি বিস্তারের ইঙ্গিত। চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের সীমারেখায় বাঁধা শান্ত নিসর্গজগতের পরিধি ছেড়ে কবি চলে এসেছেন মহাপৃথিবীর বৃহদায়তন ভূখণ্ডে যেখানে নিসর্গের নির্জন বিস্তারের পাশেই রয়েছে এক সংক্ষুব্ধ মানবিক পৃথিবী: জামিরের ঘন বনের পাশেই জেগে উঠেছে ইস্পাতের নগরী এবং বধির ইস্পাত খড়্গে জামির বনের জ্যোৎস্না নিহত। 'মহাপৃথিবী'র অনেক কবিতাই যে পৃথিবীলোকের ছবি এঁকেছে সেখানে 'দূরে কাছে কেবলই নগর ঘর ভাঙে' আর বিপন্ন মানবকে এসে দাঁড়াতে হয় এক শূন্যতাবিলীন সময়ের পারে।

প্রায় বিশবছরের ছড়ানো পরিসরে লেখা কবিতাবলীর সংকলন এই গ্রন্থে কবিতার ভাববস্তু ও প্রকাশরীতির নানা বিষমতা বড় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, এই বিস্তৃত কালপরিসরে কবিমানসে সময়চেতনার এমন কোনও লক্ষণীয় বিবর্তন স্পষ্ট নয় যা পূর্বগ্রন্থ আদি 'বনলতা সেন'-এর কবিতাবলীর চেয়ে পরিণততর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। অবশ্যই পাঠককে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে আদি সংস্করণ 'মহাপৃথিবী'র একটা বড় অংশই নৈসর্গিক প্রশান্তিলোক থেকে স্খলিত এবং রূঢ় সমাজ-বাস্তবতার দ্বারা অধিকৃত। কিন্তু নাগরিক জীবনের নৈকট্য কিম্বা যুগ-প্রতিবেশের সংস্পর্শ কবিকে স্বকাল-সচেতন করলেও তাঁর সময়ভাবনাকে কোনও 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানে' উত্তীর্ণ করে দিতে সমর্থ হয়নি। বরং অন্বেষাপ্রাণিত উত্তরণপ্রবণ ইতিহাসবেদী সংকল্পনা, যার কিছুটা আভাসিত 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে, তা 'মহাপৃথিবী'র অধিকাংশ কবিতায় আপেক্ষিক কালের আপৎকালীন সংক্ষোভে বিস্মৃতপ্রায়।

'মহাপৃথিবী'তে সময় সাময়িকতা-চিহ্নিত। 'সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ' বা 'মানুষের বংশ এসে সময়ের কিনারে

থেমেছে'[১১] এ জাতীয় উচ্চারণে মহাসময় বা কোনও অখণ্ড অনন্ত কালপ্রবাহ নয়, খণ্ডসময় বা আপেক্ষিককালের অভিঘাতটুকুই অভিব্যক্ত। 'মহাপৃথিবী'র কবিতার পর কবিতায় সময়ের যে ভাবচ্ছবিটি পরিস্ফুট তা কোনো বহতা ব্যাপ্তি বা নিয়ত প্রাগ্রসর প্রবহমানতার ব্যঞ্জনা বহন করে না। কবিতার মধ্যে 'আধুনিক' কালের প্রাণের কথার অভিব্যাক্ত খুঁজতে গিয়ে জীবনানন্দ একদা লেখেন, যথার্থ যা কবিতা তা' তথাকথিত আপেক্ষিক কালের প্রতীকের মতো সমাজ ও জীবনের আধুনিক বন্দিদশার সীমা লঙ্ঘন করে অমেয়তার অন্তঃকরণে ছড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে।[১২] 'মহাপৃথিবী'র কবিতায় সমাজ ও জীবনের এই আধুনিক বন্দিদশার কথা জোরালো ভাবেই ভাষা পেয়েছে, যেমনটি পেয়েছে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের অনেক কবিতাতেও; কিন্তু সময়োত্তীর্ণ কোনও অমেয়তার আভাস সেখানে নেই। 'মহাপৃথিবী'র কবি করালকালের স্রোতে অন্ধকার প্রাসাদের ভগ্ন অবশেষটুকুর প্রতিচ্ছবিই দেখেছেন; কিন্তু সেই কালপ্রবাহের চিত্রকল্প নাবিক, সৈকত বা কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য-মুখিনতার অনুবর্তী অনুষঙ্গগুলির সমাবেশে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠেনি। বরং যুগপ্রতিবেশবদ্ধ সময়কে চিনতে ও চেনাতে জীবনানন্দের অন্তর্দৃষ্টি ও ইতিহাসবোধ সক্রিয় দেখা যায়ঃ

> আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
> একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে ;
> আরেকটি পৃথিবীর দাবী স্থির করে নিতে হলে লাগে
> সকালের আকাশের মতন বয়স ;
> সে সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।[১৩]

১১। পৃথিবীলোক / ম. পৃ.। ১২। কবিতার আত্মা ও শরীর / ক. কথা।
১৩। বিভিন্ন কোরাস / ম. পৃ.।

এই মধ্যমপথে 'মানবসমাজের সকল প্রগতি ও ক্রান্তি যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। কারণ, কবি জানেন, 'ক্লান্ত ইতিহাস / শাণিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস'।[১৪] উদ্ধৃত কবিতাংশটিতে কবি যে ঘোর অমারাত্রির বোধন চেয়েছেন একটি নতুন সকালকে প্রত্যাসন্ন করার জন্য, সে রাত্রিও যেন সমাগত: 'সেই রাত্রি এসে গেছে, সন্ততিরা জড়ায়ে গিয়েছে / জ্ঞাতকুলশীল আর অজ্ঞাত ঋণে'।[১৫] এই সমাসন্ন রাত্রি ও করাল-কালের স্রোতকে মিলিয়ে নিয়ে কবির সংকল্পনা ও প্রজ্ঞা মানুষের কাছে প্রত্যাশা করেছে অনন্যব্রতী বেহুলার ভূমিকা, 'পারাবত পক্ষধ্বনি সায়াহ্নের, সকালের নয়, / মাঝে এই বেহুলা ও কালরাত্রি বিনে'। কিন্তু, পরিবর্তে এসেছে নিরর্থক অস্তিত্বের গ্লানি, বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রাবল্য ('আমরা অনেক লোক মিলে তবু এখন একাকী'), আর মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত বিমূঢ়তা, উদ্‌ভ্রান্তি ('হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস')। তাই 'মহাপৃথিবী'র অন্তিম কাব্য-উচ্চারণে দেশকালের গণ্ডীতে বাঁধা অগ্নিগর্ভ সময়কে জীবনানন্দ এক বিরাট 'দহ' কি নিরাশার খাতে'র রূপকে এঁকেছেন।[১৬] সময়-সিন্ধুর আহ্বান মানবকে কোনও প্রেরণাদীপ্ত প্রয়াণে উদ্বুদ্ধ করেনি; 'সময়ের একান্ত সৈকতে' দাঁড়িয়ে সে ভেবেছে: 'এই দুরত্যয় সিন্ধু কি পার হবার?' এভাবে 'মহাপৃথিবী'র কবির চেতনা শেষপর্যন্ত 'সময় দেশের আপেক্ষিকতা' অথবা 'দেশকালের সীমা-প্রস্থিতি'র মধ্যেই ঘূর্ণিত হতে থাকে, কোনও 'নবসূর্যনীলমাক্রান্তির' এষণায় চিহ্নিত হয় না। আধুনিক কবিতার সপ্রাণতার প্রসঙ্গে জীবনানন্দ নিজেই বলেছেন, আধুনিক কাল ও সমাজ সম্পর্কে জাগ্রত চেতনা বজায় রেখে 'আরো দীর্ঘতর সময়ানুভূতির ভিতরে' সে কবিতাকে সার্থক হয়ে উঠতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন, সমসাময়িক কালকে অতীত ও

১৪। পরিচায়ক / ম. পৃ.।
১৫। বিভিন্ন কোরাস / ম. পৃ.।
১৬। প্রেম অপ্রেমের কবিতা / ম. পৃ.।

আনন্ত্যের সঙ্গে অন্বিত করে ঈষৎ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখার ক্ষমতা।[১৭] কিন্তু 'মহাপৃথিবী'র কবিতায় ব্যক্তি-চৈতন্য এক বিপন্ন বিস্ময়ের দ্বারা অধিকৃত; সমাজজীবনেও 'পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নষ্ট হয়ে খসে যায় চারিদিকে আমিষতিমিরে'। পরিণামে কবির সময়ভাবনা খণ্ডকালের বিনাশী স্বরূপটিকেই তুলে ধরেছে, কোনও মহনীয় তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়নি।

'মহাপৃথিবী'তে পরিস্ফুট সময়ের এই ভাবচ্ছবিটির পাশাপাশি আমরা যদি সিগনেট সংস্করণ 'বনলতাসেন' গ্রন্থটির নবসংযোজিত কবিতাবলীর সময়ভাবনাকে রাখি, কবিমানসে সময়চেতনার এক নতুন মূল্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। সময়কে একটি অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন স্রোত-প্রবাহরূপে কল্পনা জীবনানন্দের কাব্যরচনার আদিপর্ব থেকেই ক্রমস্পষ্টতায় আভাসিত। তারই একটি সার্থক শিল্পশোভন বাণীরূপ পাঠক পেয়ে যান 'বনলতাসেন'নামক কবিতাটির প্রথমস্তবকে। চিরন্তন মানব-অন্বেষা ও সময়স্রোতপ্রবাহে নাবিকী এষণার সেই ভাববস্তু পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত 'শ্যামলী, 'সবিতা', 'সুরঞ্জনা' বা 'মিতভাষণ'-এর মতো কবিতায়ও পুনরাবৃত্ত। এসব কবিতায় ইতিহাসের মানবকে আমরা পাই এক 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'র অক্লান্ত সন্ধানে ব্যাপৃত নাবিকের প্রতীকে, তার সেই দুর্মর এষণাই বারবার নবসভ্যতায় 'উত্তরপ্রবেশ' সম্ভব করে। সমুদ্রতরঙ্গ, সৈকত ও নাবিক হয়ে ওঠে অশান্ত কালপ্রবাহ, শ্রেয় অন্বিষ্ট ও মানব-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কিন্তু, আদি 'বনলতাসেন' (পৌষ, ১৩৪৯) গ্রন্থটির নবসংযোজিত কবিতাবলীতে (শ্রাবণ, ১৩৫৯) কালের চক্রানুবৃত্তির ধারণাটি প্রথম স্পষ্টভাবে কাব্যরূপায়িত হতে দেখেন জীবনানন্দের পাঠক। জীবনানন্দ যাকে বলেছেন ইতিহাসের 'ধারা-ধারণা', সেই ইতিহাসচেতনা থেকেই উদবর্তিত হয়েছে কালচক্র বা গতিশীল সময়ের ক্রমিক প্রসৃতি ও

১৭। কবিতার কথা, পৃঃ ৩১।

আবর্ত-অনুবৃত্তির ভাবনা। একজন দীক্ষিত কবির প্রজ্ঞায় জীবনানন্দকে বলতে শোনা যায়: 'সুচেতনা' এইপথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে / সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।' এর পাশাপাশি, কাছাকাছি সময়ে লেখা 'মিতভাষণ' কবিতার 'যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে' বা 'শ্যামলী' কবিতার 'কাল কিছু হয়েছিল, হবে কি শাশ্বতকাল পরে' প্রভৃতি উচ্চারণগুলিও লক্ষণীয়। কারণ, এ জাতীয় কাব্যভাষণের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দের মনে 'সময়চেতনায় নতুন মূল্য' সংযোজিত হবার আভাস পাওয়া যায়। অতীত ও ভবিষ্যৎকে একটি বিন্দু বা যুগপ্রতিবেশবদ্ধ সময়চিহ্নে যেন মিলিত হতে দেখেছেন কবি, সেই বিন্দু বা যুগচিহ্ন হল 'এই বর্তমান' 'যা, কবি জেনেছেন, 'হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—'। পশ্চিমী কবিতার কোনও পাঠক এইসব সদুক্তির সঙ্গে 'বর্ণট নর্টন'-এর টি. এস. এলিয়টের মনোধর্মের সাদৃশ্য দেখাতে পারেন:

'Time past and time future
what might have been and what has been
point to one end, which is always present.'

কিন্তু অভিব্যক্তিগত বহিরাশ্রয়ী সাদৃশ্যের বাইরে কোনও অন্তর্গভীর চেতনাসাযুজ্য এই দুই ভিন্ন মানসজগতের কবির মধ্যে খোঁজা উচিত হবে না। বরং জীবনানন্দের নিজের রচনার অন্তর্সাক্ষ্যে আস্থা রেখেই পাঠকের পক্ষে তার সময়চেতনার পরিমণ্ডল ও চারিত্র্যটি বোঝার চেষ্টা করা সঙ্গত। 'মহাপৃথিবী'র জীবনানন্দ যখন সিন্ধুসারসের উদ্দেশে বলেন:

'জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেণার সন্তান
তুমি পিছে চাহনিকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,'[১৮]

অথবা, 'স্বপ্ন তুমি ছাখোনি তো'—,

১৮। সিন্ধুসারস / ম. পৃ.।

তখন 'সিন্ধুসারস'কে এক উল্লাসসম্পৃক্ত মুহূর্তবদ্ধ বর্তমানের সন্তান বলে জেনে নিয়েও কবি নিসর্গজীবনের অন্ধ প্রাণেষণার প্রতীক এই বিহঙ্গের জীবন থেকে মানবঅস্তিত্বের মৌল ব্যবধানের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করেছেন। মানুষও বর্তমানের নিগড়ে বাঁধা ; কিন্তু সেই বর্তমান 'আনন্দের অন্তরালে' প্রশ্ন আর চিন্তায় সংক্ষুব্ধ, তাই 'বিরস'। আর, মানুষ বর্তমানে পা রেখে একই সঙ্গে অতীতচারী ও ভবিষ্যস্বাপ্নিক। মানুষ তার চেতনার জগতে তাই কালগত বিচারেও 'ত্রিভুবনচারী'। নিসর্গের নিরবচ্ছিন্ন নির্মনন প্রাণরঙ্গপ্রবাহের মধ্যে যে নিরবশেষ নিমজ্জনের বার্তা জীবনানন্দ আমাদের শুনিয়েছিলেন 'ঘাস', 'অন্ধকার' বা 'আমি যদি হতাম'-এর মত কবিতায়, তার থেকে আরো বড়ো চেতনালোকে 'উত্তরপ্রবেশ' সম্ভব হয়েছে সময়চেতনার প্রসার ও পরিণতির মধ্য দিয়েই। 'সিন্ধুসারস' কবিতাটিতে নিসর্গের বেদনাহীন প্রাণোচ্ছলতার প্রবল আকর্ষণ সত্বেও কবির চেতনা তার মননচারিত্র্যের শক্তিতে নিসর্গজীবন ও মানবজীবনচর্যার মৌল ব্যবধানটুকু চিনতে ভুল করেনি, এবং সেই চেনার ওপর পড়েছে কবির কালজ্ঞানের আলোক। অতএব সময়সম্পর্কিত অনুভাবনায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হবার পরই জীবনানন্দের বিবর্তমান কাব্যসৃষ্টিতে নতুন সংবেদ লক্ষ্য করা যায়, এমন কথা বলা চলে।

প্রসঙ্গটি বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ রাখে। 'ঝরাপালক' এবং 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের কবিতাবলীর রচনাকালে জীবনানন্দের কল্পনাদৃষ্টিতে 'সময়' ছিল এক অপরিজ্ঞেয় ও অপরিমেয় স্রোত-প্রবাহ যার উৎস অজানিত এবং ধাবমানতা নিত্য, কিন্তু নির্লক্ষ্য। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। 'ঝরাপালকে'র 'সিন্ধু' কবিতাটিতে সমুদ্রের সদাবহমান জলরাশি অপার কালের স্রোতের রূপক ধারণ করেও কোনও প্রয়াণের বাণী বহন করেনা। সমুদ্রের 'উলঙ্গনীল তরঙ্গের গান' কালে কালে দেশে দেশে মানুষসন্তানে দুর্মদ দুরাশায় তাড়িত করলেও সে তাড়না শুধুমাত্র—

সুদূরের তরে
রহস্যের মায়াসৌধ বক্ষের উপরে
ধরেছে দুস্তর কাল—

এখানে স্পষ্টতই অনির্দেশ রোমান্টিক তাড়নার ভাবটিই প্রবল। যা সুদূর এবং রহস্যময় তার আহ্বানেই দেশে দেশে কালে কালে মানব সন্তানেরা চঞ্চল; কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হলনা শুভ বা সুন্দরের অন্বিষ্ট। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমকালীন সৃষ্টিতেও এই 'দুস্তর কাল' উপস্থিত প্রবলভাবে তার বৈনাশিক চেহারায়। 'ঝরাপালকে'র কবিতাবলীর সঙ্গে সে সব রচনার চেতনার পার্থক্য একটিই: দুস্তর বা অপরিমেয় 'সময়ে'র ও বিলয়ের শক্তিগুলিকে জীবনের সৌন্দর্য ও আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে রেখেছেন কবি। বৈনাশিক কালের হাতে নিসর্গ ও মানবের অসহায় নশ্বরতার উপলব্ধি থেকেই একালের কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে অন্য এক ধরনের আততি। অন্যদিকে, সময়ের হাত থেকে ছুটি নিয়ে পৃথিবীর ধূলিমলিন পথ ছেড়ে দিয়ে স্বপ্নের হাতে আত্মসমর্পণের কথাও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ পেয়েছে।[১৯] 'রূপসীবাংলা'র 'সৃষ্টকবি'ও জানেন, 'এশিরিয়া ধূলো আজ-বেবিলন ছাই হয়ে আছে'; তবু 'সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে'।[২০] জীবনানন্দের কাব্যভাষার, বাগরীতির সঙ্গে পরিচিত পাঠক বোঝেন, সময়ের হাত থেকে ছুটি নিয়ে স্বপ্নের আশ্রয়ে যাবার যে ঘোষণা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি করেন, সেই 'সময়' কিন্তু আপেক্ষিক কাল; জীবনানন্দীয় পরিভাষায় তা' দেশকালসন্ততির সীমানায় বাঁধা, যাকে আমরা চিনি 'পৃথিবীর যত ব্যথা, বিরোধ, বাস্তব' দিয়ে। অন্যদিকে, সময়ের অমেয়তা তথা 'মহাসময়ের' ধারণাটি কবির চেতনায় তার যথার্থ ইতিহাসবেদী স্বরূপে প্রতিফলিত না হলেও, সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল না। 'মহাসময়ের' প্রসঙ্গটিও কিন্তু এ কালের কবিতায় তার ব্যাপ্তি ও ক্রমপ্রসৃতির তাৎপর্য নিয়ে পরিস্ফুট হয়নি,

১৯। স্বপ্নের হাতে / ধূ. পা.। ২০। মুখপত্রিকা / রূপসী বাংলা।

বারবার আবির্ভূত হয়েছে এক বৈনাশিক চেহারায়। 'সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব' বা 'অপেক্ষায় রয় না সময় কোনোদিন,' —এ জাতীয় উচ্চারণ সেই উপলব্ধিরই অভিব্যক্তি। তাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—'রূপসীবাংলা' পর্যায়ে জীবনানন্দের চেতনায় সময়ের দুর্জ্ঞেয়তা, অপরিমেয়তা ও ধাবমানতা ব্যতীত অন্য কোনও গূঢ়তর উপলব্ধির প্রকাশ নেই। অর্থাৎ, কবি হিসাবে যদিও জীবনানন্দ এ'দুটি গ্রন্থেই স্বকীয়রীতি ও উচ্চারণে প্রতিষ্ঠিত, সময়ভাবনার দিক থেকে বিচারে তখনও তিনি 'ঝরাপালক' যুগেই অবস্থান করছেন। 'বনলতাসেন' এবং 'মহাপৃথিবী' এ'দুটি সম্পূরক কাব্যগ্রন্থেই জীবনানন্দের চেতনালোকের স্বকীয় বিস্তার ঘটে এবং অনুভূতি ও সংবেদনার অনন্যপূর্ব স্বকীয়তার পাশাপাশি এক ধরনের মনোজ্জ্বলতা তাঁর এ পর্যায়ের কাব্যসৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। স্বাভাবিকভাবেই তাই এ সময়কার রচনাতেই কবির সময়চেতনার শুধুমাত্র প্রসার নয় স্বকীয় চারিত্র্যও পরিস্ফুট হয়েছে।

সেই নবার্জিত চারিত্র্যটি বোঝবার চেষ্টা করে আমরা আগেও কিছু কথা ব্যয় করেছি। দেখা গেছে, সময়ের নিত্যবহমানতার ধারণাটি বিবর্জিত হয়নি, ইতিহাসবোধের উন্মেষে তা' নূতন মহিমা পেয়েছে। ধাবমান কালের সহযাত্রীরূপে কবি আবিষ্কার করেছেন ইতিহাসপথিক চিরমানবসত্তাকে—যে মানব চলেছে 'সময়সিন্ধুর' পথে, 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'র অন্বেষায়। দুস্তর কাল ও দুর্বার অনির্দেশ ধাবমানতার জীর্ণ রোমান্টিক অনুষঙ্গগুলি অতিক্রম করে জীবনানন্দের সময়ভাবনা ক্রমশই ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হয়েছে। হয়তো কবি এই পরিণতিশীল উপলব্ধিকেই 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন। সেই কালজ্ঞানের দ্বিবিধ প্রকাশ দেখি 'বনলতাসেন' দ্বিতীয় সংস্করণের নবসংযোজিত কবিতাবলীতে, যেগুলির রচনাকাল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের কিছু আগে পরে হওয়াই স্বাভাবিক। এইসব রচনায় কালের নিত্য ধাবমানতার প্রাচীন ধারণাটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে শাশ্বত

মানব-অভীপ্সার তারণশক্তি। ধাবমান কালের মতো মানবও চিরযাত্রী; কিন্তু সেই যাত্রা কোনও 'সুদূর রহস্যের লাগি' নয়, এক 'নবপৃথিবী'র জন্যে প্রয়াণ। সাগর, সমুদ্রযাত্রা ও নাবিক—সবকটি প্রতীকই পুনরাবৃত্ত হয়েছে নতুন অর্থের মাত্রা নিয়ে, নৈকটের লক্ষ্যে স্থিত হয়ে। দ্বিতীয়ত, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগের স্বপ্নপ্রয়াণের আকাঙ্ক্ষা, যা ছিলো নিতান্ত ব্যক্তিগত আশ্বস্তির দ্যোতক, তা ইতিহাসচেতনায় সঞ্জীবিত হয়ে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় নিরন্তর মানবপ্রয়াণের সৃষ্টিশীল গভীরতার ভাববহ হয়ে উঠেছে। কবি জেনেছেন, 'মানুষকে স্থির স্থিরতর হতে দেবেনা সময়'; কিন্তু সে কিছু চেয়েছে বলেই তো 'এত রক্তনদী'। কালের অস্থির ধাবমানতা বিনাশপ্রবণতা বা সংহারসত্তার আভাস বহন করলেও চূড়ান্ত সত্য নয়। কারণ, 'অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়ে দূর সাগরের শব্দ—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে'।

কালের ধাবমান ও বিনাশী সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মানুষের আপন যুগ-প্রতিবেশসম্ভূত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার ঐতিহাসিক সত্য। খণ্ড সময়ের পটে এক একটি মানবসভ্যতাযুগের উত্থান ও পতন; সেই ধ্বংস ও বিনাশের মধ্য দিয়েই কিন্তু নিত্যজাগরুক থেকেছে শুভ ও সুন্দরের অন্বেষায় মানবের প্রয়াণ-আকাঙ্ক্ষা। যদিও আমি বলেছি শুভ ও সুন্দরের অন্বিষ্টের কথা, সেই স্থির কল্যাণবাহী উদ্দেশ্যমুখিনতায় জীবনানন্দের সময়ভাবনা পৌঁছেছে অনেক রক্তাক্ত মানব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তাই কবি 'প্রেরণা'র আগে 'অন্ধকার' শব্দটি প্রয়োগ করে যেন বোঝাতে চান উত্তরণের প্রাণনা সত্ত্বেও তার অন্বিষ্ট অনেক ইতিহাসযুগ ধরেই ছিল অনির্দিষ্ট। তৃতীয়ত, 'খণ্ডকাল' ও 'মহাসময়ের' ধারণাগুলি ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের স্পষ্টতর উপলব্ধি 'বনলতাসেন-মহাপৃথিবী' পর্যায়ের কাব্যসৃষ্টিতেই সুবলয়িত হয়ে উঠেছে। তার পূর্ববর্তী পর্যায়ে 'সময়' বলতে শুধু এক অমেয় এবং ধাবমান কালপ্রবাহের বিমূর্ত ছবিই পাঠকের কল্পনায় ধরা পড়ে।

কিন্তু, 'মিতভাষণ', 'সবিতা', 'সুরঞ্জনা' বা 'সুচেতনা' প্রমুখ কবিতায় জীবনানন্দ যাকে 'সময়গ্রন্থি' বলেছেন, তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। 'আজকাল সব সময়েরই একটা রঙ রয়েছে নানা রঙের ভিতর বিম্বিত হয়ে—সব সময়কে একই সময়গ্রন্থির ভিতর নিবিষ্ট রেখে। আজকের অনুভূতি ও ধারণা অনেক আধার বদল করে এসেছে অনেক আধার এবং দরকার হলে আরেও বদল করে দূর ভবিষ্যতের পরিণতিতে গিয়ে দাঁড়াবে।'[২১] 'সময়গ্রন্থি'র এই জাতীয় ধারণার আলোকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই অভিন্ন কালসূত্রে সুগ্রথিত বলে প্রতিভাত হয়। যে অধুনাকে নিয়ে মানবের অতৃপ্তি ও সংগ্রাম, তা' অতীতের গর্ভজাত এবং আগামী-প্রসবা—এই চেতনার উজ্জ্বল কাব্য-অভিব্যক্তি 'বনলতাসেন' গ্রন্থের অনেক ক'টি নূতন সংযোজিত কবিতায় দেখা যায়। 'সবিতা'র নায়ক বলেন ঃ

> তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা
> সিন্ধুর রাত্রির জল জানে—
> আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে,

অন্যদিকে আবার, 'মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায় যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে। যে বর্তমান 'হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে'. তার মধ্যেই অমেয় কালপ্রবাহে ভাসমান মানবের ভবিষ্যপ্রয়াণ এবং অতীত অভিজ্ঞান, এই উভয়বিধ সংবেদের ইঙ্গিত দেখি। আমরা জানি, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনক্ষেত্রে 'এই বর্তমান'। 'মিতভাষণ' কবিতাটিতে 'সময়ের শতকের মৃত্যু'র উল্লেখ কিম্বা 'সবিতা' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকবন্ধে মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপ গ্রীসের 'উজ্জ্বল খৃষ্টান' হবার কাহিনী মহাসময়ের অমেয় পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ডকালকে চিহ্নিত করে দেয় এবং মানব সভ্যতার নিরন্তর নবপ্রসূতির সত্যটিকেই প্রকাশ করে।

২১। কবিতার কথা, পৃ. ৯৩।

'সময়'কে একটি অমেয় বহমান স্রোতরূপে কল্পনা জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির আদিপর্যায় থেকে লক্ষণীয়; কিন্তু কালের চক্রানুবৃত্তির ধারণাটি 'সুচেতনা' কবিতাটিতেই প্রথম অভিব্যক্ত। 'সুচেতনা এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'—এ বাণী দ্বান্দ্বিক ইতিহাসবোধে উদ্দীপ্ত; অথচ 'দেখেছি যা হল, হবে, মানুষের যা হবার নয়'—এ উচ্চারণ যেন একধরনের নৈরাশ্যমণ্ডিত নির্বেদের কথাই বলে, যদিও সেরকম কোনও বোধের উন্মেষ ইতিহাসবেদী ভাবনায় জারিত হতে বাধা নেই। 'সুচেতনা' কবিতাটির অন্তিম চরণের চিররাত্রি ও চিরসূর্যোদয়ের চিত্রকল্পটি কিম্বা 'সুরঞ্জনা' ও' 'সবিতা' কবিতাদুটিতে অতীতের মৃতসভ্যতা থেকে নব-সভ্যতার আবর্তনের চিত্র, অথবা 'সুদর্শনা' কবিতার 'তবুও সময় স্থির নয়, আরেক গভীরতর শেষরূপ চেয়ে দেখেছে সে তোমার বলয়' পঙক্তিগুলি কালের চক্রানুবৃত্তি বা জীবনানন্দ যাকে 'সময়গ্রন্থি' বলেন, যেন সেই ধারণারই একটি বিস্তার।

সময়বৃত্তের এই রূপকটি কবির ইতিহাসচেতনা ও মননশীলতা সঞ্জাত। কাব্যসৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে তা' বিবর্জিত হয়নি, তবে 'বনলতাসেন' গ্রন্থের কবিতাবলীতে যতটা সান্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত তা' সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকেনি 'সাতটি তারার তিমির' বা তার সমসাময়িক সৃষ্টিতে। এর একটি কারণ জীবনানন্দের পাঠক জানেন 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের রচনাকালের মধ্যেই নিহিত। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ও উত্তরসামরিকী যুগের এ সব কবিতায় ধ্বংস ও বিপর্যয়ে অবক্ষয়িত সমাজজীবনের এক শোকাবহ ছবি ফুটেছে, যেখানে প্রত্যয়হীনতার অন্ধকারে প্রয়াণের সকল শক্তি অবসন্ন, মহৎ রীতি বা সত্যের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সব আলোকবর্তিকা নিষ্প্রভ, তাদের নির্দেশ পরাহত। 'মহাপৃথিবী'র আপৎকালীন নাগরিক পৃথিবীর সমীপবর্তী হয়েই জীবনানন্দ আমাদের জানিয়েছিলেন 'ঘোর স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে' কোনও 'পুনরুদয়ে'র ভোর আসন্ন হতে পারে না। তাঁর

কাব্যের বিবর্তনশীল চেতনা-প্রবাহে—'সাতটি তারার তিমির' সেই ঘোর অমানিশারই প্রতিভাস এনেছে।

আমরা এ পর্যালোচনার প্রারম্ভেই বলেছি জীবনানন্দের সময়-চেতনার একটি উৎস পৃথিবী তথা আপেক্ষিক কাল, দেশসম্ভূতি সময়ের নিগড়ে বাঁধা মানবের যুগপ্রতিবেশ চিহ্নিত জীবন, অপরটি রয়েছে মহাবিশ্বলোকের ঈশারায় উৎসাবিত আবহমান কালের সংকল্পনায় যা 'অনন্তকাল' তথা সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষ থেকে সুরু হয়ে অতীত, অধুনা ও আগামীকে একটি ঘূর্ণ্যমান আবর্তে চিহ্নিত করতে চায়। সেই চক্রাবর্ত কালের পটভূমিতে 'সাতটি তারার তিমির' এমন কি 'বেলা অবেলা কালবেলা'ও বিপর্যস্ত বর্তমানের দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংশয়ের ভাবচ্ছবি তুলে ধরে। 'মহাপৃথিবী'তে জীবনানন্দ আমাদের জানিয়েছিলেন আমরা 'মধ্যম পথে' রয়েছি যখন একটি পৃথিবীর অবসানের পর আরেকটি পৃথিবীর জন্ম প্রত্যাসন্ন বলে মনে হয়না। এই 'মধ্যম পথ' তথা দুই পৃথিবীর উল্লেখ অতীত ও অনাগতের পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করছে। 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবি এক তিমির-বিলাসী যুগ-উদভ্রান্তির মধ্যে দাঁড়িয়েও 'সময়গ্রন্থি' বা সময়বৃত্তের বলয়ধর্মিতার যথাযথ স্বরূপটি সম্পর্কে অবহিত। 'সময়সিন্ধু'র আদি প্রতীকটিকে ব্যবহার করেই তিনি পাঠককে জানিয়ে দেন: 'পেছনের ঢেউগুলো প্রতারণা করে ভেসে গেছে, সামনের অভিভূত অন্তহীন সমুদ্রের মতন এসেছে'। ইতিহাসবেদী জ্ঞানের আলোকে তিনি সমকালের উদ্‌ভ্রান্তি, বিমূঢ়তা ও দিৎসাহীনতাকে একদিকে অতীতের বিচ্যুতির সঙ্গে, অন্যদিকে, প্রয়াণবিমুখ সামাজিক অবক্ষয়ের শক্তি-গুলির সঙ্গে অন্বিত দেখেছেন। কিন্তু 'শতাব্দীর রাক্ষসীবেলা' বা 'ইতিহাসের গোলকধাঁধায় বন্দী মরুভূমি'র মত চিত্রকল্পের সাহায্যে স্বকাল ও স্বদেশের ভগ্ন অবক্ষয়ী জীবনকে 'সময়ের আস্ফোট' বলে বর্ণনা করলেও, সমাজোৎসারিত মননের শক্তিতে জীবনানন্দ জানেন খৃষ্ট শতাব্দীর অবসানে এই উদ্‌ভ্রান্তি ও বিমূঢ়তা স্বাভাবিকভাবেই

মানবসমাজে নেমে আসে, 'যখন সকলই সুবিধা হতে চেয়ে শুধু প্রধূমায়মান' : 'শতাব্দীর শেষ হলে এরকম আবিষ্ট নিয়ম'।

একটি পরিণত সময়চেতনার উদ্‌বর্তনে নিজের যুগের দ্বান্দ্বিক পরিপার্শ্বকে সঠিকভাবে বোঝার ক্ষমতা সৎ ও সচেতন কবিকে সাহায্য করে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি বলেই তিনি লিখতে পারেন : 'আমরা যে সময়ে বাস করছি দু-দুটো যুদ্ধ ও নানারকম বড় অনর্থ অত্যাচারে তা ভেঙে ধ্বসে যেতে থাকলেও, জীবনের সব কাজই যুক্তি ও সফলতায় দাঁড় করাতে হলে যে ধরনের সমাজনমনীয়তার প্রয়োজন—সৎ শক্তির শান্ত বা অশান্ত প্রয়োগে—সে রকম বিপ্লব পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গায় ঘটে থাকলেও……। আমরা এখনো কোনো বিপ্লবের যুগে বাস করছি না। আমাদের সন্ততিরা করবে বলে মনে করছি।' যুদ্ধ-অবলীন পৃথিবীর মূল্যবোধ-বিপর্যয়ের একটি ফলশ্রুতি তাঁর চেতনার[২২] জগতে এনেছে খণ্ড আপতিক কালের উদ্‌ভ্রান্তি ও নিরালোক নির্দেশহীনতার ছবি, অন্যটি উপজাত করেছে মানবেতিহাসের সংকটলগ্নের যথার্থ বোধ ও তার মধ্য হতে উদবর্তিত প্রত্যয় :

> অন্ধকার পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
> আরো বড়ো বিষয়ের হাতে
> সে-সময় মুছে ফেলে দিয়ে
> কি এক গভীর সুসময়।[২৩]

বর্তমানের সংকট হতে উপজাত আগামী সুসময়ের প্রত্যয় 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায় উদ্বোধিত। 'মকর সংক্রান্তির রাতে' কবিতাটির 'তৃতীয় অংক' ঘটিত চিত্রকল্পটিও এই প্রত্যয়েরই দ্যোতক। পঞ্চাংক নাট্যরীতিতে তৃতীয় অংক নাট্য-সংঘাতের তুঙ্গমুহূর্তটি চিহ্নিত করে এবং অন্তিম পরিণামের গ্রন্থিমোচন

২২। সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা / ক.কথা। ২৩। মকরসংক্রান্তির রাতে / সা. তা. তি.।

করে দেয়। তেমনই যুদ্ধধ্বস্ত পৃথিবীর সমাজ-সংকটের মধ্যে জীবনানন্দ প্রত্যক্ষ করেন নবসংক্রান্তির সম্ভাবনা। তাই, ইতিহাস-চেতনারূপ পাখিকে (যা প্রয়াণের প্রতীক) সম্বোধন করে বলেছেন: 'সূর্যে আরো নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি'। 'তৃতীয় অংক' চিত্রকল্পটির পুনরাবৃত্তিও কবির প্রত্যয়দৃঢ়তা ও মৌল আস্তিকতা বোধের পরিচায়ক:

ক অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অংকে

খ এখন তৃতীয় অংক অতএব আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়,

গ মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে যা শেখেনি
সেই-মহাশ্মশানের গর্ভাংকে ধূপের মতো জ্বলে
জাগেনা কি হে জীবন—[২৪]

উদ্ধৃতিগুলি স্বয়ংটীক। তৃতীয় অংক কবির কাছে 'মহান', কারণ তা 'আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়'। সেই অগ্নিপরিধির মধ্যে দাঁড়িয়েই 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'[২৫] অবলীন হতে গিয়ে মানব শুনেছে কিন্নর কণ্ঠের সংগীত, দেখেছে অমৃতসূর্যের আলোক। মহাভারত প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে জীবনানন্দ একদা মহাভারত-উত্তর বর্তমানকালের যুগজীবনকে সমাজ ও সময়নাট্যের বিষম তৃতীয় অংক[২৬] বলে অভিহিত করেছিলেন। মহাভারত পৃথিবীর ইতিহাসের একটি প্রশস্ত কালপর্যায়কে প্রকাশ করেছে। জীবনানন্দের মতে, 'আমাদের স্ত্রী পুরুষ অন্ধকার দুর্ঘটনা আশা সংকল্প দিয়ে যে মহাভারত সৃষ্টি হচ্ছে, পুরোনো মহাভারতের বিরাটত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সে যাচাই করে নিচ্ছে। কিন্তু মহাভারতের মহাপ্রস্থান-পর্ব আজকের মানবকে কোনও পথ দেখায় না। 'মহাপ্রস্থান আমরাও চাই চাই যদিও (এই পৃথিবীতেই

২৪। সুগতামসী / সা. ভা. তি.। ২৫। সুদর্শনা / ব. সেন।
২৬। কি হিসেবে শাশ্বত / ক. কথা।

নবপ্রস্থান হিসাবে)—'[২৭] এই সদুক্তিগুলির আলোকে সমকালীন যুগকে 'তৃতীয় অংক' বলে অভিহিত করে এবং তার মধ্যে আগুন ও আলোক দুয়েরই উপস্থিতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জীবনানন্দের পরিণত কালচেতনা উত্তরণের অনিবার্য আসন্নতার প্রত্যয়টিকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছে :

ক ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তর প্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার লোকে,

খ নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে

গ নবপৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে

এ জাতীয় প্রত্যয়সিদ্ধ উচ্চারণ নবসূর্য বা অনুসূর্যেব প্রতীক, সংক্রান্তি, ভোর পাখি প্রভৃতির অজস্র উল্লেখ 'সাতটি তারার তিমির'-এর পরিব্যাপ্ত তিমিরাচ্ছন্নতাকেই কবির চেতনায় মানবসভ্যতার অন্তিমপর্ব বলে মেনে নিতে দেয়না। একটি আগামী পৃথিবীর সংকল্পনাকে ঘিরেই ভোর, পাখি অথবা বসন্তকালের অনুষঙ্গ গুঞ্জরিত ; অন্যদিকে সমুদ্র যাত্রা ও সৈকত-অন্বেষার প্রিয় জীবনানন্দীয় প্রসঙ্গ ও তার প্রতীকী ব্যবহারের বহুল দৃষ্টান্ত প্রয়াণ ও উত্তরণের ব্যঞ্জনাবহ। স্মরণ করা যেতে পারে, 'সময়-সিন্ধু'র রূপক 'ঝরাপালকের যুগ থেকেই জীবনানন্দের রচনায় সমুদ্রনাবিকের অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছে ; কিন্তু নিছক ভ্রাম্যমানতা বা কোনও সুদূর রহস্যের টানে অনির্দেশ রোমান্টিক তাড়নার প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির উত্তর-পর্যায়ে অনুপস্থিত। পরিবর্তে এসেছে এক নিষ্কলুষ মানবসমাজের অন্বেষায় সভ্যতা থেকে নবসভ্যতার মধ্য দিয়ে মানবের ক্লান্তিহীন প্রয়াণের মহত্তর ব্যঞ্জনা। 'ঝরাপালকে'র 'জলবেদিয়া' আর 'সাতটি তারার তিমির'-এর 'নাবিক' বা 'নাবিকী' জাতীয় কবিতার মধ্যে তাই কবিচেতনার সাদৃশ্যের চেয়ে ব্যবধানই বড় হয়ে দেখা দেয়। এই যে ব্যবধান তা চেতনার কোনও নঙর্থক বিবর্তন নয়, সমাজচেতন

২৭। কবিতার কথা, পৃঃ ৪৭। কবিতার কথা, পৃঃ ৪৯।

অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসবেদী মননের শক্তিতেই তার উদবর্তন। জীবনানন্দের সময়চেতনার একদিকে রয়েছে ইতিহাসের সত্য, অন্যপ্রান্তে সমকালের যথার্থ অনুধাবনের প্রজ্ঞা। তিনি জেনেছেন, নচিকেতা, জরাথ্রুষ্ট্র, লাওৎসে, এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী'র খোঁজে

মানুষরা বরাবর পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে
নবনব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে,

আবার, অন্যদিকে—

কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই/
হে কালপুরুষ তারা আনন্দ দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—
সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে।

আঘাত, দ্বন্দ্ব ও প্রগতির এই উদ্দীপ্ত উল্লেখ কোনও অনুসন্ধানী পাঠককে যদি জীবনানন্দের সময়-চেতনার মধ্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মনোবীজ খুঁজতে আগ্রহী করে, সে প্রয়াস অযথার্থ বলার মতো যথেষ্ট যুক্তি আমাদের হাতে নেই। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন, সৎ কবিতার পক্ষে ইতিহাসবেদ এবং সমাজবেদের আশ্রয় জরুরী জেনেও জীবনানন্দ কবিতাকে 'সমাজের মুখপাত্রের' মতো দাঁড় করানোর বিরোধী ছিলেন।[২৮] তিনি চেয়েছিলেন কবিতার ভিতরে এইসব বেদের সুস্থিতি বা 'একান্ত মর্মজ্ঞান'—'যা হয়ে গেছে যা হতে পারে সবের ভিতরে খতিয়ে আজকের বিশেষ উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করে রাখার চেষ্টাটাই আসল'।[২৯] এই মূল্যায়নের মননসিদ্ধ প্রচেষ্টা থেকেই কবির চেতনালোকে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানের আবির্ভাব। জীবনানন্দের নিজের ক্ষেত্রে ধাবমান কাল, তার বৈনাশিক সত্তা, দুর্জ্ঞেয়তার রহস্যময়তার প্রথাসিদ্ধ ধারাগুলি ইতিহাসের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে যখন মহাসময়ের

২৮। কবিতার কথা, পৃঃ ৩৯। ২৯। কবিতা পাঠ, পৃঃ ৬৩।

অমেয়ত্ব ও খণ্ডকালের দৌরাত্ম্য একই সময়গ্রন্থির মধ্যে সমন্বিত করে দেখতে সমর্থ হয়েছে, তখনই তাঁর কবিতা যথার্থ সুরসাম্যে সুস্থিত। তখনই জীবনানন্দ যাকে বলেছেন, 'মানুষের অবহমান পৃথিবীর শীর্ষে এই নতুন পৃথিবী এবং মানুষের অনেক দিনের চেনা সত্য মিথ্যার কুয়াশা ভেদ করে আজকের নতুন মিথ্যা ও সত্যের শরীরে বিজ্ঞানের স্বাক্ষর'—[৩০] এইসব, অর্থাৎ আবহমান কাল ও দেশকালের দ্বান্দ্বিক অন্বয়ের মধ্য দিয়েই কবির চেতনা উত্তীর্ণ হয়েছে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানে', তথা যথার্থ ও সত্য সময়-চেতনায়। যে উদ্ধৃত কবিতাংশ-দুটির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনানন্দের সময়চেতনার মনোবীজ। 'পৃথিবীর আয়ুতে' মানবজন্মের উল্লেখ ও 'নব-নব-ইতিহাস' সৈকত-স্পর্শের কাহিনী অনন্তকাল ও ঐতিহাসিককালের ভাববাহী; অন্যদিকে, 'নব নব' শব্দটি নিরন্তর প্রয়াণের ইঙ্গিত দেয়। এই প্রয়াণের সম্ভাবনা আঘাত, বা অন্যত্র জীবনানন্দ যাকে বলেছেন, মানব-সমাজের ঘনঘটা তার মধ্য দিয়েই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব তথা বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের সমাজজীবনে সমাবেশ ও পরিণামী সংঘর্ষের বৈজ্ঞানিক সত্যটিও এখানে আভাসিত। এই দ্বন্দ্বকে 'অনন্ত' বলেছেন কবি তাঁর ইতিহাসবেদী প্রজ্ঞায়, এবং তার বোধনও চেয়েছেন। কারণ, কোথাও আঘাত ছাড়া অগ্রসরতা নেই, নেই সূর্যালোক তথা সূর্যকরোজ্জ্বল নবীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। জীবনানন্দের শেষপর্যায়ের রচনায় এই সূর্যকরোজ্জ্বল আলো-পৃথিবীর প্রতীতি আরও মহনীয় ও অবিনাশী বর্ণনায় প্রতিষ্ঠিত।

'মহাপৃথিবী'র জীবনানন্দ সৃষ্টির নাড়ীর পরে হাত রেখে অনুভব করেছিলেন মানব-অস্তিত্বের দুই মৌলসত্য—' 'অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে আছে অমোঘ আমোদ।' মানব-অস্তিত্বের সেই বেদনা ও গ্লানির দিকটি কবির যুগ-প্রতিবেশসম্ভূত সময়ের বোধে কাব্যভাষা

৩০। কবিতাপাঠ / ক. কথা, পৃঃ ৩৮।

পেয়েছে, 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা' পর্যায়ের রচনায়। অন্যদিকে, রয়েছে নবসৃষ্টির আনন্দ যা মানবকে নিরন্তর উত্তীর্ণ করছে ইতিহাসের নতুন সৈকতে, নবসভ্যতার আলোকোজ্জ্বল ভোরে। 'সময়প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থালাভ করতে চেষ্টা করেছি'—এই বিনয়ানত উচ্চারণই জীবনানন্দের সময়চেতনা সম্পর্কে শেষকথা।[৩১]

তবু, কথা থেকে যায়। প্রশ্ন জাগে, মানবভবিষ্য সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত কোনো আস্থাশীলতায় কবি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন কিনা এবং হয়ে থাকলে, কতটাই বা তা কবির সময়চেতনার ফলশ্রুতি। যদিও অকালমৃত্যুর আকস্মিকতা জীবনানন্দের বিষয় ও রীতির শেষ পরিসর-গভীরতা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিন্ত হতে দেয়না, তবু মৃত্যুর কিছুকাল আগে লেখা অনেক কবিতাতেই এক গভীর আশাপ্রোজ্জ্বলতার মন্ত্র ধ্বনিত হতে শুনি। কবির সময়-অনুধ্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে তার চারিত্র্য ও নতুন মূল্য বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। তাঁর কাব্যসৃষ্টির অন্তিমতম পর্যায়ের কিছুটা সংকলিত ও ঢের অগ্রন্থিত রচনায় বিকীর্ণ হয়ে আছে মননের এমন এক গভীর অন্তর্বানী আলোক যা সময়কে শুধুমাত্র তার অমেয়তা ও বিনাশসত্তায়, ধাবমানতা ও ক্লান্তিহীন ক্রমোত্তরণের লক্ষ্যে চিহ্নিত করেনি। জীবনানন্দ নিজে যাকে বলেছেন 'মহা-ইতিহাস' ও 'মহাপ্রাণ', তারই মৌল আস্তিক ভাবসত্যে উদ্ভাসিত করেছে। কবির সময়ভাবনাকে ঘিরে এই নবোৎসারিত আস্তিকতার উৎস রয়েছে মানব-অস্তিত্বের মৃত্যুহীনতার বোধে:

> মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
> থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
> প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।[৩২]

এই চেতনার পরিমাপই তো ইতিহাসবোধ। কিন্তু কবি জানেন,

৩১। কবিতার কথা, পৃঃ ৪০। ৩২। মানুষের মৃত্যু হলে; শ্রেঃ কবিতা।

'ইতিহাস অর্থসত্যে কামাচ্ছন্ন' এখনো কালের কিনারায়; তাই 'পটভূমির থেকে বিলীন হয় পটভূমির স্থান' আর 'মানবজাতির দু'মুহূর্তের সময় পরিসর' 'পায়না ধ্রুবজীবনের আলো'। কিন্তু তিনি আরও দেখতে পান, 'আগুন নিয়ে বিষম তবু অক্ষত স্থির জীবনে আলোকিত'। অতএব কবি ফেরেন এক 'মহাজিজ্ঞাসা'য় ঃ

আজকাল অনন্ত সময়
সেকেণ্ডে-মিনিটে পলে বারবার ক্ষয়
পেয়েছেও তবুও এই সময়ের অহরহ গতি
থাকিলেও পৃথিবীতে স্থির কিছু এনেছে কি
যে স্থিরতা বারবার দিয়ে যায় রাত্রির নিয়তি,
পৃথিবীর দিন যে দহন দেয়,—সেই সব ছাড়া
আরো বড় যানে এক—মহাপ্রাণসাগরের সাড়া ?
নিরন্তর বহমান সময়ের থেকে খসে গিয়ে
সময়ের জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি,
যদ্দূর যেতে চাই—এই পটভূমি ছেড়ে দিয়ে—
চিহ্নিত সাগর ছেড়ে অন্য এক সমুদ্রের পানে
ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসহীনতার দিকে—[৩৩]

ইতিহাসহীনতার এই বোধ কোনও নঙর্থক অজ্ঞানতা বা অন্ধতা নয়; এ হল সেই মহাইতিহাসবোধ যা 'মানবসমাজের ঘনঘটা'র বৃত্তান্ত-পরিধি পেরিয়ে ইতিহাসকে মুক্তি ও স্থিতি দেয় মানবের স্বভাবী নিত্যতায় যেখানে 'মানুষের কাহিনীর পথে ভাস্বরতা এসে পড়ে', যেখানে 'মহানিশীথের স্তন্যপায়ী মানুষ'কে 'তবুও শিশুসূর্যের সন্তান' বলে চেনা যায়।

জীবনানন্দের চেতনায় সময়-অনুধ্যানের সঙ্গে ইতিহাসবোধের নিকট সম্পর্কের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। কিন্তু বৃত্তান্তপ্রবণ

৩৩। মহাজিজ্ঞাসা / আনন্দবাজার, শারদীয় ;

ইতিহাসের বিনাশ ও নির্মাণের যুগপরিক্রমায় 'ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস' হয়ে দাঁড়ায় 'যদিনা মানব এসে তিনফুট জাগতিক কাহিনীতে হৃদয়ের নীলাভ আকাশ বিছিয়ে অসীম করে রেখে দিয়ে যায়ঃ 'অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।' ইতিহাসের প্রাণসত্য অতএব, জীবনানন্দীয় ব্যাখ্যায়, মানবস্বভাব, আর তারই স্থিতিকেন্দ্রে উত্তীর্ণ কবির চেতনায় উদ্ভাসিত হয় মানুষের মহাইতিহাস ঃ

> সেই মহাইতিহাস এখনো আসেনি, তার কাছে
> কাহিনীর অন্যঅর্থ, সমুদ্রের অন্যস্বর, অন্য আলোড়ন।[৩৪]

মানুষের এই অন্য দীপ্তমনই আনে সময়চেতনার নবপ্রসূতি, তাকে নতুন বোধির শক্তিতে যুগপ্রতিবেশ ও রাষ্ট্রবিবর্তনের পরিধি পেরিয়ে অগ্রসরমান করে ঃ

> সময় যা আচ্ছন্ন করেছিলো তাকে সময় সংক্রান্তির পারে
> মৃত্যু যা নিশ্চিত করেছিলো তাকে উজ্জ্বল বস্তু-পুঞ্জে
> জাগিয়ে তুলবার জন্যে দেখ
> সচেতন হয়ে জেগে ওঠে মানব ঃ[৩৫]

জাগিয়ে তুলবার জন্যে জেগে ওঠা এই মানবই মানবভবিষ্যে জীবনানন্দের চূড়ান্ত আস্থার প্রতীক। তারই বলে বলীয়ান কবির চেতনা 'সময়ের মরুভূমির—মধ্যে মানবকে আবিষ্কার করে'। সে মানব 'একটি বৃক্ষের মতো যেন যুক্তিহীন'; এবং কবি জানিয়ে দেন তাঁর পাঠককে এই 'মহাপ্রাণের বৃক্ষ বারবার জেগে ওঠে'—'নবহরিৎ গাছে'।[৩৬] তাই, সময়-চেতনার শেষতম বিস্তারে কবির কাছে মনে হয় ঃ

> 'সময় নিজেই তবু সবচেয়ে গভীর বিপ্লবী'।[৩৭]

৩৪। মহাইতিহাস / ক্রান্তি, আশ্বিন,

৩৫। আশা, অনুমিতি / একক, ১০ম বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৩৫৮।

৩৬। মহাগ্রহণ / চতুরঙ্গ, বৈশাখ, ১৩৫৮।

৩৭। যাত্রী / কবিতা, চৈত্র, ১৩৫৯।

অর্থাৎ, কালের বৈনাশিকতার পাশাপাশি তার সৃষ্টিমুখিন স্বপ্নোজ্জ্বলতার প্রত্যয়ে তিনি অভিসিঞ্চিত করে দেন তাঁর কাব্যবাণী ; কারণ, বিপ্লবের মধ্যে যেমন স্থিতাবস্থার, ক্লিন্ন্ অনড়তার বিরুদ্ধে ভাঙনের জেহাদ তেমনই তার পশ্চাতের প্রাণনা হল নবীন ও শুদ্ধতর অন্য জীবনের স্বপ্ন। এক ব্যাপ্ত বৈনাশিকতার পটভূমিতে অগ্রসরমান নবীন প্রাণের চেতনা-উন্মেষেই জীবনানন্দের সময়ভাবনা আধুনিক বাঙলা কবিতার মনন-পরিসরে বিশিষ্ট হয়ে আছে :

নিজেকে নিয়মে ক্ষয় করে ফেলে রোজই
চলেছে সময় ;
তবুও স্থিরতা এক রয়ে গেছে
সময় ক্ষয়ের মতো নয়।

সময় যে শুধুই ক্ষয়ের মতো নয়, জীবনানন্দের কবিতার মানব কিন্তু এ সত্যে জেগেছে নিজেরই চেতনার দানে :

মনে হয় কোথাও চিহ্নিত এই রৌদ্র ছিল কবে ;
মানুষ সার্থক নয়—তবুও সার্থকতর হবে :

এই সার্থকতর হওয়া সম্ভব হয় 'মননের তীর থেকে আরো দূর তীরতটে' গিয়ে ; সেই প্রাণনার থেকে উদ্‌বর্তিত চেতনা তাই সময়েরই দান, যে সময়

সেদিনের হৃদয়ের উষ্ণতা উত্তেজ স্থির
করে ফেলে অন্য নব কলেবরে গড়েছে শরীর।[৩৮]

৩৮। যাত্রী / কবিতা, চৈত্র, ১৩৫৯।

উপসংহার

অস্তিত্ববাদ ও আস্তিক্যবোধ

'নেই-নেই'—মনে হয়েছিল কবে—চারিদিকে উঁচু উঁচু গাছে
বাতাস ? না সময় বলেছে ; 'আছে—আছে'।

জীবনানন্দের চেতনাজগতের চার মুখ্য বিস্তারের মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়ে অনেকটা আবিষ্কারের আনন্দে, এবং কখনও বা স্পষ্ট পরিগৃহীত হবার বাসনায়, কিছুটা পুনরাবৃত্ত হতে হতে এতগুলি পৃষ্ঠা পার হয়ে এসেছি। প্রতিটি পদক্ষেপেই তবু জীবনানন্দের নির্জনতার ও অস্পৃহার আপাত অভিপ্রায়ের অন্তরালবর্তী মানবিক কল্যাণকৃৎ চেতনাকেন্দ্রিন এবং তার মধ্য হতে উপজাত আস্থাকরোজ্জ্বল এক ভবিষ্য-পৃথিবীর শুভস্বপ্নের দিকে পাঠকের চোখ ফেরাতে চেয়েছি। আনন্ত্যকে খণ্ড সময়ের দেশে ভেঙে নিয়ে .'মাটি-পৃথিবীর ঘরে' ক্ষয়, বিলয় ও মৃত্যুর আধিপত্য দেখে পীড়িত হতে হতে বিষাদ ও বিবমিষার প্রাবল্যে কবির যে চেতনা নির্মনন জৈবতার গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়েছিল, অনেকেই তা তাঁর সৃষ্টির অন্তরতম কথা বলে স্থূল বা সুনিপুণভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ফলত, সাধারণ্যে জীবনানন্দ আজও এক পলায়নপ্রবণ নির্জনতাভিক্ষু অবসন্ন মানসিকতার কবি বলে চিহ্নিত হয়ে আছেন, যিনি শুধু এক রমণীয় বেদনার স্রষ্ট-রূপকার ; এক অমাময়ী নিরাশার উদগাতা।

বর্তমান প্রতিবেদনের মূল সুর প্রথমাবধিই এ'রকম খণ্ডিত ও অভিপ্রায়ী বীক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাব্যসৃষ্টির জগতে কবির চেতনা পরিসরের উৎস ও উদবর্তনের ধারারেখাগুলি সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝে নিতে ও বোঝাতে চেয়েছে। তাঁর রচনার বিভিন্ন পর্যায়ের আগুন ও জলকণার আস্বাদ নিতে নিতে বুঝেছি আপন

সংবেদনার কাছে বিশ্বস্ত ও 'ইতিহাসের ধারা-ধারণা'র অনুগত এই কবি চেতনার জগতে কোনও স্থবিরতার ক্রীতদাস অন্তত ছিলেন না। খণ্ড সময়ের পরিধিতে দাঁড়িয়ে যুগপ্রতিবেশবদ্ধ মানুষিক অভিজ্ঞতায় ও ইতিবৃত্তশোধিত প্রজ্ঞায় তিনি মানবের নিরন্তর অগ্রস্মৃতি ও শুভ-অস্বিষ্টের সত্যগুলি যথার্থ অনুধাবনের উদ্যম ও যোগ্যতা দেখিয়েছিলেন, এবং শেষপর্যন্ত এক প্রবল প্রত্যয়সিদ্ধ আস্তিক্যে সুস্থিত হতে পেরেছিলেন। তাঁর সে অর্জন, মনে হয়েছে, সহজ ছিল না। কারণ, যে কোনও অভিনিবিষ্ট জীবনানন্দের পাঠকই দেখেছেন, তাঁকে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল দীর্ঘ পথ—নিরুদ্দেশ বিহ্বল গতিরাগের ঘোর, দৃশ্যরূপাবিষ্টতার দাসত্ব, জড়ের সাম্রাজ্য, নিরর্থকতার আবর্ত ও শূন্যের আস্ফালন। জীবনানন্দের সৃষ্টির অনেকাংশ জুড়েই যে নেতির পোষণ ঘটেছে, তা একদিকে ব্যাহত ব্যক্তিক অভীপ্সা ও বাস্তবের রণ-রক্ত কোলাহলের গ্লানিসঞ্জাত, অন্যদিকে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিতের সঠিক অনুধাবনের ব্যর্থতাসাপেক্ষ।

মানুষের আত্মসত্তার অনুচিন্তায় নিরর্থকতার অনুপ্রবেশ তাঁর সৃষ্টির দেশে একধরনের অস্তিত্ববাদী মানসিকতার পরিপোষক হয়েছিল। জৈব অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতার পেষণ ও তার নিরর্থকতার গ্লানি জীবনানন্দের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য রচনাতেই অভিব্যক্ত (যথা, 'বোধ' 'আদিম দেবতারা', 'ক্যাম্পে', 'আটবছর আগে একদিন,' এবং বিক্ষিপ্তভাবে অন্যত্র); এসব কিছুই আধুনিক শিল্পীর অস্তিত্ববাদী জীবনোপলব্ধির প্রতিবেশী করে তুলেছে, আনুপূর্বিকভাবে না হলেও, তাঁর চেতনার কিছু কিছু ফলবান খণ্ডকে। ব্যক্তি ও বস্তুর উপলব্ধির ক্ষেত্রে মেরু-ব্যবধান ও বিরুদ্ধতা; খণ্ড, ছিন্ন ব্যক্তিক সচেতনতার নিজস্ব জগতেও অন্তর্লীন বিভাজন ও বিরোধের আত্মগ্লানি; যা উপলব্ধ এবং যাকে হতে হবে অভিব্যক্ত সেই উভয়ক্ষেত্রেই প্রামাণিকতার জন্য এক যন্ত্রণাদগ্ধ সংগ্রাম এবং আত্মমুক্তির ঘোষণা—এইসব কুললক্ষণ আত্মঅন্বেষার এমন একটি দর্শন বিংশ শতাব্দীর চিন্তা

সংস্কৃতির জগতে প্রবলভাবে উপস্থিত করিয়েছে যাকে অস্তিত্ববাদ বলে চিহ্নিত করা হয়। জীবনানন্দের কাব্যরচনার নানা পর্বে মানুষের জৈব ও সামাজিক অবস্থানের উদ্ভটতা ও আকস্মিকতা, সত্তার নিরন্তর জায়মানতার বোধ, জীবনের নিরর্থকতার গ্লানি, মানবেতিহাসে শূন্যতার আধিপত্যের উপলব্ধি, ক্ষুধাতর জৈব অস্তিত্বের দায়হীনতার যন্ত্রণা ও এক সর্বায়ত নৈরাশ্য এমন অনন্যসম্ভব অভিব্যক্তি পেয়েছে যা অস্তিত্ববাদীর উপলব্ধ আধুনিক মানবের জীবন-সঙ্কটের বাঙ্ময় নির্দেশিকা বললে তেমন অত্যুক্তি হয় না।

প্রথমেই ধরা যাক আত্মসত্তার একাকীত্বের উপলব্ধির কথা, যা যূথবদ্ধ জীবনচর্যার সাধারণীকৃত বাসনা-বোধ-ভাবনার থেকে দূরস্থ ও বিচ্ছিন্ন এবং আত্মভুক সংবেদনার নানা উৎসারে জটিল। জীবনানন্দের কবিতার আদিপর্যায় থেকেই অনুভব ও বোধের কেন্দ্রে বসে আছে এই নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাহত আধুনিক। কিয়ের্কেগার্ড ভিড়ের মধ্যে দেখেছিলেন 'জান্তব সত্তা' ; নিটশে ভিড়কে মমতাস্পৃহ এবং বাচাল বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন। জীবনানন্দের নির্জন সঙ্গীহীন নায়কও দেখেছিলেন 'এই মানুষের—মানুষীর ভিড়' যা তাঁর দয়িতাকে ডেকে নিয়েছে 'দূরে—কত দূরে'। এই দূরত্ব নিশ্চয়ই ঐহিক, তবে যতটা বাস্তবিক তার অনেক বেশি চেতনাশ্রয়ী। এই জৈবতাবশ জীবনচর্যার থেকে আপন বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধিতেই 'বোধ' কবিতাটির ভাবকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় নায়ক বলে ওঠেন : 'সহজ লোকের মত কে চলিতে পারে।... / তাদের মতন ভাষা কথা / কে বলিতে পারে আর'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত কাব্যরচনার দীর্ঘ পরিসরে জীবনানন্দের চেতনালোকে একদিকে রয়েছে এক অন্ধ-অনড়-আগ্রাসী ভিড়, অন্যদিকে তার নির্জন নিঃসঙ্গ নায়ক—সে তার প্রেমে ও ঘৃণায়, জীবনের সংবেদে এবং যন্ত্রণার আক্ষেপে আত্মগত এবং আর্ত, বিকল্পহীন এক ব্যক্তিমানুষ। আত্মসত্তার নিঃসঙ্গতার বোধে দীর্ণ এবং চেতনার

কূটত্বে বিপন্ন এই মানুষটিকেই পাঠক দেখেছেন সব নিরর্থকতার অবসান ঘটাতে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় একগাছা দড়ি হাতে একা একা অশ্বত্থের কাছে যেতে। ঐহিক অ[illegible] উৎস হতে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে জায়মান মানবচেতনার ওপরে শূন্যের সাম্রাজ্য পরবর্তী পর্যায়ে কবির রচনায় নিয়ে এসেছে 'আমিষ-তিমিরে'র অনপনেয় ছায়া যার পরিণামে মহৎ সত্য বা রীতি মিথ্যা হয়ে যায়, 'শূন্য মনে হয়' সব চিন্তা, সকল উদ্যম। এসবই আবিশ্ব মূল্যবোধ বিনষ্টির এমন এক সর্বাত্মক অনিবার্য পরিণতি যা জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির প্রান্তিক পর্বে চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্পে প্রতীকায়িত : 'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে'; 'অরেঞ্জোপিকোর ঘ্রাণ নরকের সবায়ের চায়ে'; 'অথবা যে সব নাম ভাল লেগেছিল : আপিলা চাপিলা' ইত্যাদি। উদ্ধৃতিপ্রবণ না হয়েও এখন বলা যেতে পারে, অস্তিত্ব-বাদীর চোখে যেমন জীবনানন্দের কাব্যরচনার বিভিন্ন পর্বেও তেমনই মানুষের অস্তিত্বের জৈবতা এবং নির্মনন জীবনযাত্রার অভ্যস্ত গ্লানি ও নিরর্থকতা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা, কিয়ের্কেগার্ডের মত অস্তিত্ববাদীর কাছে সত্য অস্তিত্বে বাঁচার অর্থ ছিল ব্যক্তিসত্তাকে সেই সচেতনতায় প্রবিষ্ট করানো যাতে এই মুহূর্তে যা সাময়িক এবং যা সময়াতীত তার বোধে আশ্রিত থেকে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তান্তরে নিরন্তর হয়ে-ওঠার একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার বর্তমান অস্তিত্বের তীক্ষ্ণতর সচেতনতায় জেগে উঠবে। জীবনানন্দের কবিতার আদি পর্বের নায়কও বলেন :

> কাল যাহা থাকিবে না, আজ যাহা স্মৃতি হয়ে আছে,
> দিনরাত্রি—আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন
> সন্ধ্যার মেঘের মত মুহূর্তের রঙ লয়ে মুহূর্তে নূতন।[১]

মানব অস্তিত্বের আকস্মিকতা ও উদ্ভটতা, চৈতন্য ও নির্মননের অগোচর দ্বন্দ্বের আততি, মানুষের সমূহ জীবনের থেকে দূরত্ব ও

১। জীবন / ধূসর পাণ্ডুলিপি।

নিঃসঙ্গতা, এক নিরীশ্বর নির্দয় জৈব শূন্যতার উপলব্ধিজাত বিবিক্ত জীবনের বিপন্নতা—অস্তিত্ববাদী জীবনদৃষ্টির এইসব মনোকণিকাগুলি আপন সুতীক্ষ্ণ সংবেদী অভিজ্ঞতার প্রাবল্যে জীবনানন্দের চেতনার জগতে স্বাভাবিকভাবেই স্ফুরিত হয়েছিল। মনে ক রা ঠিক হবে না যে কবির চৈতন্য সচেতনভাবেই কোনও প্রাকনির্দিষ্ট মনোভঙ্গীর দাসত্ব করেছে। বরং একথা বলা যেতে পারে, 'মহাপৃথিবী' রচনার সময় থেকে তাঁর সৃষ্টিকর্মে সচেতন উপলব্ধি-অনুচিন্তার পথ বেয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছিল ব্যক্তি মানুষের দায়হীন জৈবঅস্তিত্বের নিরর্থ-কতার গ্লানি। 'ক্যাম্পে' কবিতায় যে কবিচেতনা শুনেছিল এক সর্বায়ত জৈব রলরোল ('মৃত পশুদের মত আমরাও আমাদের মাংস লয়ে পড়ে থাকি'), সেই চেতনাই 'আমিষ তিমিরে' হয়েছে 'লিঙ্গশরীরী' এবং সময়সাগরের ক্লান্তিবিহীন শব্দে শুনেছে 'নাড়ীর রক্ত স্রোতের মতন ধ্বনি'। এই জৈবতার প্রভুত্বই জীবনানন্দের চেতনাকে চালিত করেছিল মানুষের বিপন্নতার বোধে; অবশ্যই সে বোধ ছিল একান্ত ব্যক্তিক, তাই অপ্রত্যয়ী:

মানুষ আমি—মানুষ আমার পাশে
হৃদয়ে তার হৃদয় মেলালেও
ব্যক্তি আমি—ব্যক্তি পুরুষ সেও
দ্বীপের-মতন একা আমি তুমি;
অনন্ত সব পৃথক দ্বীপের একক মরুভূমি;
যে যার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসে রয়ে গেছে;[২]

এই ব্যক্তিক অবিশ্বাসের ব্যাপকতা জীবনানন্দের চেতনালোকে এনেছে এক অমাময়ী নিশি যা সৃজনের শেষকথা বলে মনে হয়েছে তাঁর। এই পৃথিবীতে তবু মানুষের সামূহিক জীবন চিরদিনই স্থিরতাসন্ধানী। কিন্তু কালের স্রোতে ভাসমান প্রাণের মৃত্যুহীনতা যে স্থিরতা মানবকে ফিরিয়ে দিয়েছে বারবার তা এক 'রাত্রির নিয়তি';

২। সূর্যকরোজ্জ্বলা / মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৫৬।

'অসীম শবের প্রাবরণী খুলে' জ্ঞানের অগম্য এক উৎসবের স্থর মানুষকে ফেলে গেছে 'চেতনার ভিতরে একাকী'। মানুষের চেতনার দেশে এই জৈবতার আগ্রাসে জন্ম নিয়েছে আর এক পরিপূরক বোধঃ 'চারিদিকে শূন্যের হাতে / নীল নিখিলের কেন্দ্রভার'; তাই 'ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস'। কিন্তু ক্রমশই ইতিহাসবেদ ও কালজ্ঞানের যথার্থ সমন্বয়ে জীবনানন্দ বুঝেছিলেন এই অন্ধ জৈবতা, চেতনার নৈশতা ও শূন্যের সাম্রাজ্য ভাঙতে পারে ব্যক্তি একাকী নয়, জাগ্রত মানবতা, তার শুভঅন্বিষ্ট ও কল্যাণকৃৎ চেতনা। বিচ্ছিন্নতার আত্মভুক 'বোধ' থেকে মানবের সামূহিক ভূমিকার 'বোধি'তে জীবনানন্দ স্পষ্টতই উত্তরপ্রবেশ করেন ইতিহাসের নিরন্তর অগ্রস্থতি ও দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় মানবের যথার্থ ভূমিকার প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে,

> ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস
> যদিনা মানব এসে তিনফুট জাগতিক কাহিনীতে
> হৃদয়ের নীলাভ আকাশ
> বিছিয়ে অসীম করে রেখে দিয়ে যায়ঃ[৩]

মানবতার এই জাগরণই যেমন দেবে নবপ্রস্থানের প্রাণনা ('নব সূর্যে সম্মেলন—যাত্রা যাত্রা যাত্রা যাত্রা আছে') তেমনই সেই জাগরণ যে এক গভীর অন্তঃশীল প্রেমেই সম্ভব, তাও বুঝেছিলেন তিনি। ফলে অন্তিম পর্বের গ্রন্থিত অগ্রন্থিত সব কবিতায় বারবার ফিরে আসে এক দিব্য, কল্যাণী নারীমূর্তি। প্রেমের এই প্রত্যাবর্তনের (যা অবশ্যই দেখা দিল অনেক বড়ো চেতনার আকারে, কেবল নারী পুরুষের লৌকিক বাসনার অভিব্যক্তি হিসেবেই নয়) পটভূমি হল হরিতের অক্ষয় গুঞ্জরণময় এক আলোকস্বচ্ছল প্রকৃতি-পৃথিবী। অন্তিম পর্বের সৃষ্টিকর্মে প্রকৃতির কাছে এই ফিরে যাওয়া কিন্তু আর কোনও নির্মনন জৈবতার বোধন নয় ; এই প্রত্যাবর্তন 'প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত পথ' ধরে এমন এক মহাপৃথিবীতে যা 'সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম চেতনার

৩। মহাজিজ্ঞাসা / আঃ বাঃ পত্রিকা, আশ্বিন,

ভূমি'। জীবনানন্দের চেতনার জগতে এই ফেরা 'নিরাশার খাত' থেকে 'মানবীয় নিখিল ও নীড়ে,' নিরর্থকতার তমিস্রা থেকে 'উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে'। সৃষ্টির গরল ও অমার গহ্বর থেকে মানুষের পরিত্রাণের পথ যে অন্তর্মুখ চেতনার আলোকে দীপ্ত এক প্রকৃতি-লালিত জীবন, এ কথাটি অনেক সময় খুবই স্পষ্ট উচ্চারণে এবং কখনও বা নদী-সূর্য-মাছরাঙা-সোনালীফসল-নারীর সমাবেশে আলোপৃথিবীর সংকল্পনায় বিধৃত।

প্রকৃতি থেকে ফসল জল নীলকণ্ঠ এল :
সময় পাপচক্র থেকে বাহির হ'ল ব্যথিত নিঃসহায়।[৪]

নীলকণ্ঠের মত প্রকৃতি-পৃথিবী ধারণ করবে আধুনিক মানুষের নাগরিক অস্তিত্বের কলুষ এবং গ্রহণ করবে ত্রাতার ভূমিকা—এই স্পষ্ট ও সরল প্রত্যয় নিসর্গজগতের অজস্র প্রতিবস্তুর উজ্জ্বল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বার বার অভিব্যক্ত হয়েছে।

একই সঙ্গে এ কথাটিও মনে রাখা ভাল, জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির অন্তিমতম পর্বে আস্তিক্য-বোধের এই উদবর্তন একদিকে যেমন চিরমানবের দুর্মর প্রাণশক্তিতে বলীয়ান অন্যদিকে তেমনই তা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতির শুভপ্রেরণায় আস্থাশীল ছিল। অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি একদা শুনিয়েছিলেন অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে-যাওয়া সৈকত-ছাড়ানো এক স্বচ্ছন্দ উৎসবের গান, 'আছে আছে আছে' এই নিবিড় বোধির সুনিবিড় উদ্বোধনের ঘোষণা, পরবর্তীকালে অসংখ্য অগ্রন্থিত রচনায় সেই আস্থাশীলতাই আরও বিবৃত, সর্বায়ত হয়েছে, এবং ইতিহাসের নিরন্তর অগ্রসৃতির জীবনানন্দীয় ভাষ্যে অর্থগূঢ়তা পেয়েছে। মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে 'শীত-অসারতা' নেমে আসার কথা তিনি আর শোনালেন না তাঁর পাঠককে; পরিবর্তে শোনালেন ইতিহাসের অন্তঃশীল শোধন-শক্তির বাণী : 'পটভূমির থেকে নদীর রক্ত মুছে মুছে / বিলীন হয়

৪। পৃথিবী আজ / সত্যযুগ শারদীয়, ১৩৫৭।

যেমন সে সব পটভূমির স্থান।' ইতিহাস-পটভূমির এই নিরন্তর রূপান্তর যে ব্যক্তিমানুষের একক চেতনার দানে ঘটেনা, মানুষের উত্তরব্যক্তিক সামূহিক ভূমিকার শক্তিতেই সম্ভব হয়, সে সম্পর্কে জীবনানন্দ নিজের কাছে স্পষ্ট ছিলেন।

> বেবিলন থেকে বিলম্বিত এসপ্লানেডে
> বিদীর্ণ চীনের থেকে এই শীর্ণ এককড়িপুরে
> মানুষের অরুন্তুদ চেষ্টার ভিতরে,[৫]

তিনি দেখেছেন,…'মানুষ অনর্গল অন্ধকারে মরে / মানবকে তার প্রতিনিধি রেখে গেছে,—হয়ত একদিন/সফলতা পেয়ে যাবে ইতিহাসের ভোরে'।[৬] যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের চেতনার এই উত্তরব্যক্তিক উন্মেষ ঘটলেই মানবেতিহাস স্খালিত হয়ে যায় ভুলের বিনুনি খুলে', 'মননের তীর থেকে আরো দূর তীরতটে গিয়ে'[৭]। এবং তখনই ইতিহাসের নিরন্তর গতি ('চলেছে নক্ষত্র রীতি মানুষের বিষয় হৃদয়') অর্থবান হয়ে ওঠে। মানুষের চেতনার দেশে এই বোধির উন্মেষ, যা মানুষের ইতিহাস 'অমেয় গোলকধাঁধা' থেকে, 'নৈষ্ফল্য' থেকে উদ্ধার করে নেয় 'যেই মহা-ইতিহাস এখনো আসেনি' তারই শুভ অন্বিষ্টে, জীবনানন্দের কবিতার জগতে প্রকৃতির মহাপ্রাণরঙ্গের মৃত্যুহীন স্থির প্রশান্তির আবহে তার বোধন ঘটেছে :

> প্রকৃতি মানুষ আর সময়ের নিজের স্বভাব
> জেনে নিতে হয় নদী প্রান্তরের ঘাসে ;
> এ ছাড়া আর কি সত্য ইতিহাস জানে ?[৮]

জীবনানন্দ একদা লিখেছিলেন, 'সময় ও পৃথিবী অভিজ্ঞতার আধার ; মানুষও সঞ্চয়ী'। মানুষের এই যে 'সঞ্চয়' তা' অবশ্যই ব্যবহারিক নয় ; সে তার চৈতন্যের সম্পদ, তার বিবেকী প্রত্যয়ের

৫। পটভূমি / ক্রান্তি, ফাল্গুন, ১৩৬০।
৬। সূর্যকরোজ্জ্বলা / বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৫৩।
৭। হেমন্ত / কবিতা, কার্তিক, ১৩৪৬।
৮। দুটি তুরঙ্গম / দেশ, কার্তিক

দান, যা ইতিহাস-মানবের অভিজ্ঞতার বিজারণে, উৎসায়নে অস্তিত্বের মৌল জৈবতা ও আত্মক্রীড়তা শোধন করে নিতে শেখে :

> সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
> তা তো নেই ;—স্থবিরতা আছে—জরা আছে।
> ....নিজেকে কেবলি আত্মক্রীড় করি ; নীড়
> গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌথ যৌন
> মন্ত্রণার মালিন্য এড়ায়ে উৎক্রান্ত হতে ভয়......
> তবুও প্রেমিক তাকে হতে হবে ; সময় কোথাও
> পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয় ;
> তবু, সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে[৯]
> বলে মনে হয় ; এরপর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, আস্তিক্যবোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জীবনানন্দ আরও জেনেছিলেন যে মানবের 'বহিরাশ্রয়ী' লৌকিক অভিজ্ঞতাকে 'অন্তর্দীপ্ত' হতে হবে চৈতন্যে ; এবং সেখানেই মানবতার প্রবল উজ্জ্বল ভূমিকা প্রেমে—'জনমানব প্রেমে', 'নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো সকল মানব প্রেমে' ; কারণ, 'প্রেম ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।' এই স্বোপার্জিত আস্তিক্যে অগণন মানুষের চেতনা-প্রতিভূ হিসেবে জীবনানন্দ বলে উঠতে পারেন :

> হে তুমি গভীর ইতিহাস
> আমরা মধ্যম পথে, তোমাকে সফল করে দিতে
> ব্যক্তি বিসর্জন দিয়ে মানবের প্রাণনের সাগরে চলেছি।[১০]

মানুষের উত্তরব্যক্তি সত্তার ধাত্রিক ভূমিকার ভাবচ্ছবি তাঁর চেতনার পটে কাব্যরচনার আদিপর্যায় থেকেই মুদ্রিত ছিল। প্রথম পর্বে যা ছিল নিরুদ্দেশ ধাবমানতা, মধ্যপর্বের রচনায় তা রূপান্তরিত হয়ে হয়েছে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় প্রসৃতি। সেই অগ্রগমনেরই মধ্যে কবি লক্ষ্য করেছিলেন এক বলয়িত গতির নিরর্থকতা: 'শাশ্বত

৯। ইতিহাসযান / বেলা-অবেলা। ১০। পটভূমিবিসার / মেঘনা, সংকলন, বৈশাখ, ১৩৬৪

রাত্রির বুকে কেবলি অনন্ত সূর্যোদয়'। অন্তিমতম পর্বের সৃষ্টিতে কিন্তু জীবনানন্দ বহমান সময়স্রোতে নাবিক মানবাত্মাকে আলো-পৃথিবীর অন্বিষ্টমুখী করে এঁকেছেন; ইতিবৃত্তের অগ্রস্মৃতির শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন শুভঅন্বিষ্টের পরিপূর্ণতার এক স্থির আদর্শে আস্থাশীলতা। তাই বলা যেতে পারে, অস্তিত্ববাদী নিরর্থকতায় অবসন্ন চৈতন্যের গ্লানি ও ক্লৈব্য মুছে ফেলে জীবনানন্দের চেতনার দেশে এই নবীন আস্তিক্যের উত্থান দাঁড়িয়ে আছে দুটি প্রধান স্তম্ভের ওপর; এক, ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতার ক্লৈব্যজয়ী মানবের সামূহিক ভূমিকায় আস্থা; দুই, ইতিহাসের প্রজ্ঞায় শীলিত মানবের চিরন্তন এষণার দুর্মরতার বোধ। চিরমানব প্রাণের এই দুর্মরতাকেই জীবনানন্দ 'মহাপ্রাণ' বলে বারবার উল্লেখ করেছেন শেষ পর্যায়ের কবিতাবলীতে। সময় যখন 'মরুভূমি'[১১] তখনও এই প্রাণনা, কবির কল্পনাদৃষ্টিতে, 'একটি বৃক্ষের মত যুক্তিহীন'।[১২] 'শাশ্বত গ্রাসাচ্ছাদনে' ব্যস্ত মানবের 'মূঢ় মন'কে তিনি ডেকে নিয়ে এসেছেন 'শ্যামল্যবৃক্ষের নীচে',[১৩] শিখিয়েছেন প্রকৃতির অবিনাশ ধর্ম; এই বৃক্ষের 'শান্ত স্নিগ্ধ সিদ্ধার্থ পল্লব'[১৩] জাগিয়েছে 'পুনরায় প্রাণসাগরের শত ভাষা'। বৃক্ষের অনুষঙ্গ এনে সংকল্পনা রিক্ত, রক্তাক্ত মানবপৃথিবীকে আবার সংযুক্ত করলো প্রকৃতি-জগতের সঙ্গে, যেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে 'বুদ্ধি আর লালসার সাধনাকে বড় ভেবে' মানুষ গড়েছিলো এক 'রক্তবণিক' সমাজ। অতএব, আবার ফিরে আসে তাঁর চেতনার দেশে সৌন্দর্য, পূর্ণতা ও প্রশান্তির সেই প্রাকৃতিকী সঙ্গতির স্বপ্ন:

> মহাপ্রাণের বৃক্ষ ও তার পাখি তো বারবার
> ভস্ম হয়ে জাগছে হরিৎ—নব হরিৎ গাছে।[১৪]

'মহাপ্রাণের বৃক্ষ'টি আমাদের পরিচিত, এই পাখিও বটে; কারণ 'আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মত যেন' একথা জীবনানন্দ

১১। সূর্য নিভে গেলে / একক, ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। ১২। মহাগ্রহণ / চতুরঙ্গ, বৈশাখ, ১৩৫৮।
১৩। বৃক্ষ / দেশ, কার্তিক, ১৪। নবহরিতের গান / একক, আশ্বিন

অনেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন। এভাবেই এক নবার্জিত আস্তিক্য জীবনানন্দের চেতনা-জগতের চূড়ান্ত বিকাশে তুলেছে প্রত্যয়ী প্রেমিক মানবের জয়গান। এবং তাঁর এই আস্থাশীলতাকে কৃত্রিম তথা নিছক স্বপ্নগতও বলা সমীচীন হবে না, কারণ নিখিল মানবঅভিজ্ঞতার আগুনে পরিশুদ্ধ 'মাটি-পৃথিবী'র কোলেই যে তাঁর আস্থার উত্থান ঘটেছে, সেই কথাটিও জীবনানন্দ জানাতে ভোলেন নি :

> কোথায় রয়েছে যেন অবিনশ্বর আলোড়ন :
> কোনো এক অন্য পথে, কোন পথে নেই পরিচয় ;
> এ মাটির কোলে ছাড়া অন্য স্থানে নয় ;[১৫]

আরও দেখি, কোনও দূর অতন্দ্র নীলিমার কল্পলোক নয়, 'মাটি পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে'[১৬] ফিরে আসা কবির চেতনায় আস্তিক্যবোধের উত্থানের শর্ত হিসেবেই যেন ঘোষিত হয়েছে হৃদয়ের উজ্জীবিত ভূমিকার কথা বারেবারে তাঁর শেষ পর্বের রচনায়। 'শতকের ম্লান চিহ্ন'[১৭] ছেড়ে দিয়ে মানুষ নেমেছে 'প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে' এবং 'হৃদয়কে সেখানে করেনা অবহেলা বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি'। অতএব, গভীর তির্যক ভাষ্যে কোবিদ জীবনানন্দ যেন দিগভ্রান্ত মানবকে জানিয়ে দিতে চান 'হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত' ইতিহাসের শিক্ষা হল, 'বুদ্ধির ফেনিল দৌড়'[১৮] আনে ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতার পরিণামে সর্বায়ত নৈরাশ্য। মানুষের পৃথিবীর অমা ও গরল স্খালিত হতে পারে হৃদয়মূল্যের সংযোগে আলোকস্বচ্ছল এক মাটি পৃথিবীরই কোলে।

> All creatures drink of joy
> At Nature's breast.[১৯]

১৫। মহাইতিহাস / ক্রান্তি, আশ্বিন।
১৬। সুচেতনা / বনলতা সেন।
১৭। আলোপৃথিবী / দেশ,
১৮। দুটি তুরঙ্গম / দেশ, কার্তিক,
১৯। বিটোফেন / নবম সিম্ফনী।

অস্পৃহা ও নৈরাশার বিরুদ্ধে জীবনানন্দের চেতনার জগৎ শেষ পর্যন্ত দীপ্ত হয়ে ওঠে 'দূর জন্ম-জন্মান্তের মুখোমুখি ফিরে এসে অনাদি আলোর ভালোবাসায়'। এই ভালোবাসাকে তাঁর সংকল্পনা বিমূর্ত রাখেনি, বরং উজ্জ্বল মানবিক বিগ্রহ দিয়েছে, একদিকে 'মাটি পৃথিবী'র মানুষের সামূহিক ভূমিকার সামর্থ্যে, অন্যদিকে নারীর কল্যাণী প্রেরণায়। 'দু'একটি নক্ষত্র নারীর দিকে চেয়ে বোঝা যায় জীবন ও মৃত্যুর মানে'। 'মহানিশীথের স্তন্যপায়ী মানবকে আবার ঋজু প্রত্যয়ের আলোকে জীবনানন্দ আবিষ্কার করেন 'শিশুসূর্যের সন্তান' হিসেবে।

এই প্রতিবেদনের উপসংহারে আর একটি প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। অনেকে মনে করেন, জীবনানন্দের সৃষ্টির পরিসরে তাঁর চেতনাবিকাশের অন্তিম পর্যায়ে উদগাত এই যে আস্থাবাণী তা' চেষ্টিত, ছকছলা, কবির স্বভাবী সংবেদনার প্রতি বিশ্বস্ত নয়। যে আলো-পৃথিবীর বোধনে তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলি এত মুখর তা' কিন্তু পাখি-নদী-নিলীমা-সূর্য-সোনার ফসল-নারীর উপস্থিতিকে নৈসর্গিক অনুপুঙ্খ হিসেবে বারবার ব্যবহার করে ক্লান্তিকর ও নিরালোক হয়ে গেছে। তাই, তাঁর এ পর্বের সৃষ্টির একটা বড় অংশেই নেই কবির সংকল্পনার অগ্নি ও আবেগের ধ্বনির অন্বয়ে সেই আবয়বিক সুরসাম্য যা পাঠকের জাগ্রত প্রতর্কের ওপর বিস্তার করে দেয় নান্দনিক তৃপ্তির সহজ আধিপত্য। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হিসেবে ভূমিকায় যে সংকল্প ঘোষিত হয়েছে কবির চেতনাজগতের সেই বীক্ষা-সমীক্ষার পরিধির বাইরে রয়েছে এ' জাতীয় মন্তব্যের সত্যতা-বিচারের বিষয়টি। তবু তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া যায়, জীবনানন্দ অস্তিত্ববাদীর সর্বায়ত বিপন্নতা ও নৈরাশার মনোদৃষ্টিকে মানবতার চির-অগ্রসরমানতা ও শুভ-অন্বিষ্টের প্রাণনার বিপরীতে স্থাপন করে মানবভবিষ্যে আস্থাশীলতার জয়গান শোনাতে চেষ্টিত হয়েছেন, প্রাণিত হননি, তবু তা' শিল্পীর মঙ্গলবোধ ও দায়বদ্ধতার 'সুচেতনা'ই প্রকাশ করে। মানবতার দুর্মর প্রাণনার;

শুভ ও সুন্দরের আলোকদেশিতার প্রতি আস্থাশীলতার জন্যই জীবনানন্দের অন্তিম সৃষ্টিকে কৃত্রিম, চেষ্টিত, স্বভাববিরুদ্ধ অভিহিত করে তাঁর চেতনার পরিণততর অভিব্যক্তির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া আর এক ধরনের কৃত্রিমতারই প্রশ্রয়পুষ্ট বলে মনে হয়। তবে, চেতনাবিসারের পূর্ণতর মূল্যায়নের অব্যবহিত দাবীর কথা মনে রেখেই একথা বলছি, তাঁর সৃষ্টির শিল্পগত সার্থকতা-অসার্থকতার বিচারে নয়। কারণ, জীবনানন্দের চেতনাজগতের বিকাশসূত্র ও পর্যায়গুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটানোই এই সমীক্ষার লক্ষ্য; তাঁর কবিতার শিল্পগত মূল্যায়ন স্বতন্ত্র অভিনিবেশের দাবী রাখে।